যোগীন্দ্রনাথ সরকার

শতবার্ষিকী স্মরণী

যোগীন্দ্রনাথ সরকার শতবার্ষিকী জয়ন্তী সমিতি

।। কলিকাতা ।।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার শতবার্ষিকী স্মরণী

সম্পাদক : শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ—ডিসেম্বর ১৯৫৪

মুদ্রণ—

প্রচ্ছদ ও বিজ্ঞাপন : ক্যালকাটা জব প্রেস প্রাঃ লিঃ
১২০, সি, আই, টি, রোড, কলিকাতা - ১৪

পুস্তকাংশ : চিত্ররূপা,
৪২এ, হাজরা রোড, কলিকাতা-১৯
পাবলিসিটি প্রিণ্টার্স,
৪৫, আমহার্ষ্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ব্লক—

প্রচ্ছদ : ক্যালকাটা জব প্রেস প্রাঃ লিঃ

অন্যান্য : হিন্দুস্থান অঙ্কন কোং, কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা ও অঙ্কন : শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক : যোগীন্দ্রনাথ সরকার শতবার্ষিকী জয়ন্তী সমিতির সম্পাদকের পক্ষে
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সরকার, ১৬২।১৯৭, লেক গার্ডেন, কলিকাতা-৪৫

প্রাপ্তিস্থান : সিটি বুক সোসাইটি,
৬৪, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সম্পাদকের নিবেদন

গত বছর অর্থাৎ ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হয়। তখন তাঁর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপিত হয় সারা বাংলাদেশে। পত্র-পত্রিকায় তাঁর অবদান সম্বন্ধে নানা আলোচনা এবং নানা লেখার মাধ্যমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হল এই শতবার্ষিকী স্মরণী প্রকাশের সঙ্গে।

এই স্মারকগ্রন্থে বাংলাদেশের জ্ঞানীগুণী, বিদ্বজ্জন, সাহিত্যিক, সমালোচক, অনুরাগী ভক্ত প্রভৃতি নানা বয়সের নানা ব্যক্তির রচনা সংকলিত হয়েছে। এতে একদিকে তাঁর সাহিত্য অবদানের কিছু মূল্যায়ণ হয়েছে, অপরদিকে সমগ্র ব্যক্তিটির পরিচয়ও প্রকাশিত হয়েছে। এতে যোগীন্দ্রনাথের অবদান, তাঁর ব্যক্তিত্ব, চরিত্রমাধুর্য প্রভৃতি তাঁর জীবনের বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়ের মোটামুটি সব রকম আলোচনাই আছে। গভীরভাবে ও বিস্তৃততরভাবে সে আলোচনা করার যথেষ্ট অবকাশ এখনও রইল—কারণ ছোট ছোট রচনায় তাঁর সমগ্র জীবনের অবদানের সব কথা আলোচনা সম্ভব নয়। পরবর্তীকালে যাঁরা তাঁর জীবন ও তাঁর রচনাদি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় আগ্রহী হবেন, তাঁদের কাছে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা বিশেষ সহায়ক হবে বলে মনে করি।

যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন ছোটদের সত্যিকার বন্ধু। তাঁকে কেউ বলেন,—'শিশুসুহৃদ', কেউ—'শিশু সাহিত্যের তীর্থংকর,' কেউ—'পথিকৃৎ' আবার কেউ—'ভগীরথ' ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে তিনি বাংলা শিশুসাহিত্যের পথিকৃৎ এবং তাঁর লেখা বইগুলিই একালের প্রকৃত বাংলা শিশুরঞ্জন সাহিত্যের অগ্রদূত। তাঁর লেখায় যেন তাঁর হৃদয়ের স্পন্দন শোনা যায়। আমাদের দেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকেরা শিশু-সাহিত্য স্রষ্টাদের বিশেষ শ্রদ্ধার আসন দেন। কারণ, তাঁরা জানেন, যাঁরা তাদের রচনার দ্বারা শিশুদের মনকে আনন্দরসে অভিষিক্ত করতে পারেন, তাদের মনের উপযুক্ত খোরাক জোগাতে পারেন এবং শিশু-মনের কল্পনাকে প্রসারিত করতে সাহায্য করতে পারেন, তাঁরাই শিশুদের এবং দেশের প্রকৃত কল্যাণকামী

পথপ্রদর্শক। যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন তেমনই একজন সার্থক শিশুসাহিত্য স্রষ্টা। জীবনের মহান্ ব্রত উদ্‌যাপনে তিনি এই পথটিই বেছে নিয়েছিলেন। শুধু শিশুমনের খোরাক যোগানোই নয়, ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও তাঁর দান অপরিসীম। শিশুদের বর্ণশিক্ষা দেবার জন্ম তিনি যে পদ্ধতির প্রবর্তন করলেন, এদেশে তা অভিনব। এর উপরেও তিনি ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক। জাতীয় ও দেশাত্মবোধক গানগুলি সংকলন করে তিনি 'বন্দেমাতরম' নাম দিয়ে পুস্তিকাকারে তা প্রকাশ করেন দেশবাসীকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্ম।

ব্যক্তিগত জীবনে মানুষটি ছিলেন রসের মণিখনি—কোমল, স্নেহশীল, বন্ধুবৎসল, পরদুঃখকাতর ও পরিহাসপ্রিয়। সৎ ও সত্যপ্রিয়, আনন্দময় ও বলিষ্ঠ ছেলেমেয়ে তৈরী করাই ছিল তাঁর আশা ও সাধনা। সারা জীবন তিনি ফুল ফুটিয়ে আর ফল ধরিয়ে গেছেন।

যোগীন্দ্রনাথ বাংলাদেশ ও বাঙালীর কাছ থেকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান, শ্রদ্ধা ও যোগ্য সমাদর লাভ করেননি—একথা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হয়।

তাঁর শতবার্ষিকী জয়ন্তী সমিতির পক্ষ থেকে এই 'স্মরণী গ্রন্থ' প্রকাশ তার স্মৃতির প্রতি একটি সশ্রদ্ধ পুষ্পার্ঘ।

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

সূচী

ENGLISH SECTION

॥ যোগীন্দ্রনাথ-শতবার্ষিকী জয়ন্তী সমিতি ॥

সভাপতি : হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

উপাচার্য্য—রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সহঃ সভাপতি : নরেন্দ্র দেব

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শ্রীমতী লীলা মজুমদার

বুদ্ধদেব বসু

প্রমথনাথ বিশি

সুশোভন সরকার

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অন্নদাশঙ্কর রায়

পরিমল গোস্বামী

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

" রঞ্জিতা কুণ্ডু

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

জীবনময় রায়

শ্রীমতী নলিনী বসু

নিখিলরঞ্জন রায়

অমল হোম

শ্রীমতী নির্ম্মলকুমারী মহলানবিশ

সম্পাদক : প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র

সভাপতি—পশ্চিমবংগ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি

সহঃ সম্পাদক : রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

কোষাধ্যক্ষ : সুধীন্দ্রনাথ সরকার

স্মরণী সম্পাদক : শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

পৃষ্ঠপোষক : শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী

" প্রতিমা মিত্র

ফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী

দেবেন্দ্রমোহন বসু

নির্ম্মলকুমার বসু

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

ভূপতিমোহন সেন

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

অতুল্য ঘোষ

প্রফুল্লচন্দ্র সেন

ত্রিগুণা সেন

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

রমেশচন্দ্র মজুমদার

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অশোককুমার সরকার

তুষারকান্তি ঘোষ

প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

স্বামী রঙ্গনাথম্

অশোক চট্টোপাধ্যায়

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

—ঃ সভ্যবৃন্দ ঃ—

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী
অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)
বিমল ঘোষ (মৌমাছি)
পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
খগেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীমতী বাণী রায়
গোপাল ভৌমিক
কুঞ্জবিহারী পাল
যোগানন্দ দাস
রেবতীমোহন ঘোষ
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
সাগরময় ঘোষ
ননীগোপাল মজুমদার
করুণাকুমার নন্দী

শ্রীমতী আশা দেবী
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
গজেন্দ্রনাথ মিত্র
সুমথনাথ ঘোষ
জয়ন্ত চৌধুরী
শ্রীমতী বেলা দে
বিশু মুখোপাধ্যায়
ভবানী মুখোপাধ্যায়
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
সুধীরকুমার সরকার
পুলিনবিহারী সেন
রথীন্দ্রনাথ রায়

———

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

অনেকদিন আগে গভর্ণমেণ্ট-অনুবাদক সমাজের সদস্যগণ বিদেশী শিশু-সাহিত্যের অনুকরণে শিশু-সাহিত্য গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। সে সময়ে তাঁহারা ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। তাহারই ফলে, সেকালের বাঙ্গলায়, "চকমকির বাক্স," "ছোট কৈলাস বড় কৈলাস," "কুৎসিত হংস শাবক" প্রভৃতি শিশু-পাঠ্য পুস্তকাবলী, "গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক-সংগ্রহ" নামে প্রচারিত হয়। তখন শিশুপাঠ্য সাহিত্যের অঙ্কুরও ছিল না। ইহার কিছুকাল পরে মনস্বী কেশবচন্দ্র সেন বিলাত হইতে দেশে ফিরিলেন। তিনি বিলাতের সুলভ সংবাদপত্রের অনুকরণে "সুলভ-সমাচার" ও শিশু-পাঠ্য সাহিত্যের অনুকরণে "বালকবন্ধু"র সৃষ্টি করিলেন। "বালকবন্ধু"ই শিশুপাঠ্য সচিত্র সুকুমার সাহিত্যের আদি।

তাহার পর স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন 'সখা'র প্রতিষ্ঠা করিয়া কেশববাবুর উপ্ত বীজে জলসেচ করিতে লাগিলেন। প্রমদাচরণ শিশুহিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন,—'হায়! অকালে সেই পরার্থপর কর্ম্মবীরের জীবন অবসিত হইল।' 'সখা'র সমাগমে সচিত্র শিশু সাহিত্যে নূতন যুগের অভ্যুদয়। তখন ফুল ফুটিয়াছিল, এখন ফল ধরিতেছে। শিশু পাঠ্য মাসিক পত্র হইতেই বাঙ্গলায় শিশুপাঠ্য সাহিত্যের সৃষ্টি।

বাঙ্গলা শিশুপাঠ্য সাহিত্যে সেই 'সখা'র সময় হইতে যাঁহারা সেবা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার জীবিত রহিয়াছেন। উপেন্দ্রকিশোর প্রভৃতি আর সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে। নবকৃষ্ণ এবং যোগীন্দ্রনাথ দুই জনেই বৃদ্ধ হইয়াছেন; দুই জনেই পীড়াগ্রস্ত। আমরা সেদিন নবকৃষ্ণ বাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি সেকালের ইতিহাস বলিতে বলিতে অনেক দুঃখের কথাই বলিলেন। অনেকে তিনি বাঁচিয়া আছেন কি মরিয়া গিয়াছেন, সেই সংবাদই জানেন না। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসি ও খেলা' প্রকাশিত হইবার বহু পূর্ব্বে নবকৃষ্ণ বাবু কিছুদিন 'সখা'র সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

নবকৃষ্ণ বাবু এবং যোগীন্দ্র বাবু অকৃত্রিম বন্ধু। নবকৃষ্ণ বাবুকে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে এবং তাঁহার রচিত শিশুদের পাঠ্য গ্রন্থাদির বিষয়ে আলোচনা করিবার কথা জানাইলে তিনি বিনীতভাবে বলিলেন—"আমার আগে যোগীনবাবুর কথা লিখিবেন। তিনি অধ্যবসায় বলে সাহিত্যের এই নূতন বিভাগে সেকালে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। এখনও তাঁহার বইয়ের যত আদর এমন আদর কাহারও হয় নাই।" নবকৃষ্ণবাবুর কথা যে কতদূর সত্য, বাঙ্গলা দেশের সকলেই তাহা জানেন।

আমাদের দেশে কত লোকের 'জয়ন্তী' উৎসব হয়, কত সমাদর হয়, সম্বর্দ্ধনা হয়,—একান্ত দুঃখের বিষয় যে, ছোটদের বন্ধু যোগীন্দ্রনাথের কথা কেহই ভাবেন না! হয়ত দেশের বড়লোকেরা মনে করেন, শিশু-সাহিত্য কি আবার সাহিত্য! কিন্তু পৃথিবীর সব দেশের লোকেরা মনে করেন —যাঁহারা শিশুদের মনকে আনন্দ রসে অভিষিক্ত করিতে পারেন, তাহাদের কল্পনাকে প্রসারিত করিতে পারেন, তাঁহারাই দেশের প্রকৃত কল্যাণকামী পথপ্রদর্শক।

আমাদের দেশে যোগীন্দ্রনাথের গ্রন্থ প্রকাশের পরেই শিশু পাঠ্য সাহিত্যের প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার—সুবিখ্যাত ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয়ের সহোদর ভ্রাতা। এ পরিচয় না দিলেও চলে, কেন না তিনি নিজ নামেই সকলের নিকট পরিচিত। তাঁহার সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক অন্যান্য অনেক কথাই আমরা বলিতে পারিলাম না। না পারিবার কারণ, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎলাভের সুযোগ আমার হয় নাই। আমি যখন যোগীন্দ্রবাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম, সে সময়ে তিনি পীড়িত ছিলেন, তাঁহার পুত্রেরা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি একটু সুস্থ হইলেই আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইবেন। এ বিষয়ে তাঁহারা মনোযোগী হন নাই বলিয়াই আমরা তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে পারিলাম না।

নবকৃষ্ণবাবু বলেন—'সখা' উঠিয়া গেলে যোগীন্দ্রবাবু 'সখার' ব্লকগুলি কিনিয়া লইবার পর—গ্রন্থের পর গ্রন্থ প্রকাশ করিতে থাকেন। তিনি নিজে যেমন গদ্য ও পদ্য লিখিতেন, তেমনি নবকৃষ্ণবাবুকেও ছাড়িতেন না। এজন্যই দেখা যায় যে, যোগীন্দ্রবাবুর প্রায় সব বইতেই নবকৃষ্ণবাবুর গদ্য, পদ্য ও অনেক প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে।

যোগীন্দ্রবাবু সুকবি। তাঁহার হাতের লেখার ছবি তোমাদিগকে দেখাইবার জন্য আমরা একখানা ছেঁড়া খাতা তাঁহার ছেলেদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম। তাহাতে অনেকগুলি কবিতা ও ছড়া আছে। যদিও তোমরা সেগুলি পড়িয়া থাকিবে, তবু এখানে তাহার দুই একটি উদ্ধৃত করিলাম। এইগুলি কখনও পুরাণো হয় না।

(১)

ধাঁধা নয়

প্রশ্ন

'নুটু' যদি 'টুনু' হয়,
'নব' হয় 'বন',
'বাবা' তবে কি হইবে
বল ত এখন?

উত্তর

'কাকা', 'মামা', 'দাদা' নিয়ে
কর আগে চেষ্টা;
'বাবা' পরে কি যে হয়,
বুঝা যাবে শেষটা।

(২)

ঘুমিয়ে যখন থাকি
মায়ের চুমা ফুটিয়ে তোলে
আমার দুটি আঁখি।

হাসলে আবার চুমা,
থাক্‌লে জেগে চুমা দিয়ে
বলেন 'খুকু ঘুমা!'

কাঁদলে আমি পরে,
অমনি যেন ধারার মত
হাজার চুমা ঝরে!

মায়ের মুখের ছড়া,
তাও যেন ঠিক চুমার মত
সুধা দিয়ে গড়া!

নাইকো চুমার শেষ
চুম চুমা চুম, চুম্ চুমা চুম
চল্‌ছে মজা বেশ!

যোগীন্দ্রনাথের 'হাসি ও খেলা', 'রাঙ্গা ছবি', 'ছবি ও গল্প', 'খুকুমণির ছড়া', 'বনে-জঙ্গলে' প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ আছে। আজকালকার দিনে এমন ছেলে-মেয়ে ও কিশোর ও যুবক কমই আছেন, যাঁহারা 'হাসিখুসি'তে যোগীন্দ্রনাথের "অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব কেড়ে" এই সব ছড়া মুখস্থ করেন নাই। তাঁহার সব বইয়ের কবিতাগুলিই কবিত্বপূর্ণ ও সুমধুর।

আমাদের দেশের প্রাচীন ছড়াগুলি দিন দিন লুপ্ত হইয়াছে। যোগীন্দ্রনাথই সকলের আগে সেই প্রাচীন

ছড়াগুলি সংগ্রহ করিয়া 'খুকুমণির ছড়া' প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যদি সেগুলি যত্ন করিয়া প্রকাশ না করিতেন—তাহা হইলে তোমরা কখনই জানিতে পারিতে না—

এক যে আছে একানড়ে
সে থাকে তাল গাছে চড়ে!

যোগীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের সাহিত্য-সমাজে যে সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারী, তাহা তিনি পান নাই—আমাদের দেশের সাহিত্য-পরিষদ ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠানগুলির কি কর্ত্তব্য নয় এই জ্ঞানবৃদ্ধ এবং বয়োবৃদ্ধকে সম্বর্দ্ধনা করা? আমরা প্রার্থনা করি, তিনি আরও দীর্ঘজীবী হউন এবং শিশুদের দাদামহাশয়ের পাকা আসনখানি গ্রহণ করিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করুন।

—:০:—

যোগীন্দ্র স্মরণে

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কলম কারো খুব জোরালো
ভাসায় ভাষার তোড়ে
ধার কলমে কারো এমন
সকল বর্ম ফোঁড়ে,
কারো কলম আগুন ছিটোয়
কারো রসের ধারা!
কলম তুমি না ধরালে
থাকত কোথায় তারা?
যে চাবিতে এই দুনিয়ার
সকল মহল খোলে,
তোমার কাছেই তা পেয়েছি
বসে মায়ের কোলে।
খোকাখুকুর আধ-আধ
গলায় তোমার ছড়া
বাংলা ভাষার চিরকালের
তাইতে ত' ভিৎ গড়া!

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

হেমেন্দ্রকুমার রায়

নিজের ছেলেবেলার কথা ভেবে এখনকার ছেলেমেয়েদের উপরে আমার হিংসা হয়।

যাঁরা আমার সমবয়সী তাঁরাই জানেন, ছেলেবয়সে দিন কেটেছে আমাদের অর্দ্ধ-অনশনে এবং বয়সে যাঁরা আমার চেয়েও বড়, তাঁদের শৈশব গিয়েছে সম্পূর্ণ উপোস ক'রেই। অবশ্য এখানে খোরাকহীন দেহের কথা নয়, হচ্ছে ততোধিক হতভাগ্য উপবাসী মনের কথা!

আজকের বাংলায় সুখী শিশুদের মনের খোরাক দু'হাতে জুগিয়ে যাচ্ছেন কত গুণী লেখক! আধুনিক শিশু-সাহিত্যের আকার ক্রমেই বিরাট হয়ে উঠছে! এমন ছোটদের কাগজও বেরুচ্ছে, যা সেকালের বড়দের বিখ্যাত পত্রিকা 'বঙ্গদর্শন' বা 'ভারতী'র চেয়েও রীতিমত হৃষ্টপুষ্ট। এমন কি বড়দের চেয়ে ছোটদের মন খুসি করবার জন্যেই বাঙালী লিখিয়েদের আগ্রহ দিন-কে-দিন বেড়ে উঠছে ব'লে মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয়! শিশুদের ও বালকদের জন্যে কত রকম গল্প, উপকথা, উপন্যাস ও প্রবন্ধ, কত রকম লোভনীয় রং-বেরঙের ছবির বই এবং কত রকম চিত্রবিচিত্র মাসিকপত্র! হায়রে আমাদের শিশুকাল, এ সব ছিল তখন স্বপ্নেরও অগোচর!

জ্ঞানোদয়ের পর আমার বুভুক্ষু মন ও চক্ষুর সামনে প্রথম বিস্ময়ের মত এসে পড়ে মাসিক "সখা" এবং "সখা ও সাথী"র বাঁধানো কয়েক খণ্ড। তাদের অন্তঃপুরে সেদিন যেন আমার সমস্ত কল্পনাজগতের আলোছায়ামায়া প্রজাপতির রঙিন পাখ্‌নার ছন্দে নেচে-গেয়ে উঠেছিল! কেশবচন্দ্র সেনের "বালক-বন্ধু" নাকি বাংলাভাষায় সর্ব্বপ্রথম শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র,—কিন্তু আমি তা পড়বার সুযোগ পাইনি। তার পরে প্রথম ঐ "সখা" ছাড়া ছেলেমেদের জন্যে ছেলেমানুষী ক'রে বাংলার আর কোন কাগজই সময় নষ্ট করতে চায়নি। কিন্তু ও রকম ছেলেমানুষী ক'রে বাংলাদেশে অমর হয়ে আছে স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন মহাশয়ের নাম। দুঃখের বিষয়, এখনকার অধিকাংশ বালকই বাংলা সাহিত্যের এই শিশু-বন্ধুর নামের সঙ্গে পরিচিত নয়। অবশ্য এর জন্যে প্রধানতঃ দায়ী হচ্ছেন এখনকার শিশুপাঠ্য মাসিকপত্রের সম্পাদকেরাই। তাঁদের উচিত, প্রমদাচরণের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা।

কিন্তু "সখা", "সাথী" এবং "সখা ও সাথী"র আকৃতি প্রকৃতি দেখলে আজকের কোন শিশুই বোধ হয় খুসি হবে না। ও-কাগজ দুখানি তখন স্বল্পে-তুষ্ট আমাদের বিস্মিত ও মুগ্ধ করলেও, এখনকার ছেলেমেয়েরা তাদের মধ্যে রচনা-বৈচিত্র্য বা ছবির বাহার খুঁজে পাবে না। সে-সময়ে বাংলাদেশে বয়স্কদের উপযোগী সাহিত্যের ভাষাই ভালো ক'রে তৈরি হয়ে ওঠেনি, কাজেই শিশুদের উপযোগী সরলতা ও সরসতা সেদিনকার ছোটদের সাহিত্যে আশা করাই যায় না। যদিও এখনো বহু শিশু-সাহিত্যসেবক কচিদের মনের মত ভাষা ও লেখবার ধরণ আবিষ্কার করতে পারেন নি, তবু সেদিনের শিশুসাহিত্যজগৎ ছিল একালের চেয়ে ঢের বেশী দরিদ্র। নানা বিষয় নিয়ে শিশুসাহিত্য রচনা করবার জন্যে দলে-ভারি লেখক-সম্প্রদায়ও তখন ছিলেন না। তখনকার বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ বড় বড় লেখকরা তো শিশুদের জন্যে একদিনও মাথা ঘামান নি। উপরন্তু, এদেশে তখন ভালো ছবি আঁকবার ও ভালো ব্লক তৈরি করবার জন্যেও বড় শিল্পীর অভাব ছিল যথেষ্ট। কাজেই তখন যে সব ছবি দেখে আমাদের উপোসী চোখ নেচে উঠত, আজকের দিনে হয়তো সেগুলিকে পাঁজির কাঠের

খোদাইয়ের চেয়েও নীচু দরের ব'লে সন্দেহ হবে। তারপর কাগজ ও ছাপা। একেলে মাসিকপত্রের বিজ্ঞাপনের কাগজ আর ছাপাও তখনকার চেয়ে অনেকগুণে সেরা। আগেই বলা হয়েছে, তখনকার শিশুপাঠ্য কাগজ এখনকার তুলনায় ছিল ঢের-বেশী রোগা ও পাৎলা, সারা বছরে তারা যত জিনিষ বিলি করত, একালের চার-পাঁচ মাসের পক্ষেও হয়তো ত. যথেষ্ট ব'লে মনে হবে না!

ঐ যুগেই "বালক" নামে আর একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়, তা তখনকার খুব কাঁচা ও কচি মনের পক্ষে ঠিক উপযোগী না হ'লেও তার বিষয়-নির্ব্বাচন, রচনারীতি ও ভাষা ছিল বিশেষ উন্নত। সাহিত্যের সব্যসাচী রবীন্দ্র-নাথের অনেক বাল্যরচনা সেই কাগজে বেরিয়েছিল। "বালক" এক বছর পরেই "ভারতী ও বালক" নামকরণ ক'রে পুরোপুরি বয়স্কদের উপযোগী হয়ে ওঠে।

যাঁরা শিশুসাহিত্য রচনার ভার নেন, তাঁদের অনেকে প্রধানতঃ দু-রকম ভুল করেন। প্রথমতঃ, কেউ কেউ বিষম গাম্ভীর্য্য সহকারে উপদেশকের মত শিশু-মহলে গিয়ে কথকতা করতে চান। দ্বিতীয়তঃ, কেউ কেউ মনে করেন, উচ্চতর রচনাপদ্ধতি বা কলা-কৌশল ছেড়ে আজেবাজে ছেলেমানুষী করলেই ছোটরা তাঁদের লেখা পছন্দ করবে! কিন্তু শিশুদের রাজ্যে এই দুই দলই যে, গীতকারী পাখীদের সভায় মুখর কাকের আবির্ভাবের মত, ব্যর্থ ও বিরক্তিদায়ক, গতযুগের প্রাথমিক শিশুসাহিত্যে সেটা প্রমাণিত হয়েছে বারংবার। বলতে আপত্তি নেই, বর্ত্তমান যুগেও ঐ দুই দলের শিশুসাহিত্য লেখককে দেখা যায়, তাঁরাও জানেন না যে, শিশুদের মধ্যে যথেষ্ট কাব্যরসগ্রাহিতা আছে এবং তারা উপদেশকে ভালবাসে না। তবে আজ এ-শ্রেণীর লেখক গুণতিতে বেশী নন, এইটেই হচ্ছে আশার কথা।

"সখা" প্রভৃতি আমাদের জ্ঞানোদয়ের আগেই প্রথমে প্রকাশিত হয়—কারণ আগেই বলেছি, আমরা তাদের হাতে পেয়েছিলুম, একেবারে বাঁধানো আকারে—বারো মাসের কাগজ একত্রে। কিন্তু আমাদের চোখের সামনে শিশুপাঠ্য যে মাসিকপত্র প্রথম আত্মপ্রকাশ করে, তার নাম হচ্ছে "মুকুল"। আকারে "মুকুল"ও এখনকার ছোটদের কাগজের মত মোটা-সোটা ছিল না বটে, কিন্তু রচনা-বৈচিত্র্যে, ভাষামাধুর্য্যে, চিত্রসৌন্দর্য্যে ও অঙ্গসৌষ্ঠবে শিশুপাঠ্য মাসিক-সাহিত্যে "মুকুল"ই সর্ব্বপ্রথমে এনেছিল যুগান্তর। এখনকার শিশুপাঠ্য মাসিকপত্রগুলি অধিকতর রূপসুন্দর হয়েছে কিন্তু তুলনায় "মুকুলে"র চেয়ে যে গুণসুন্দর হ'তে পেরেছে, জোর ক'রে এমন কথা বলতে পারি না। এখনকার ছোটদের কাগজে যে যে বিষয় নিয়ে লেখা বেরোয়, "মুকুলে"র ভিতরেও তার অধিকাংশকেই পাওয়া যেত। আর "মুকুল"ই ছোটদের মহলে প্রথম 'হাফটোন' ছবি আনে। আজ যাঁর স্মরণ-সভায় আমরা শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিতে এসেছি, সেই যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় ছিলেন ছোটদের উপযোগী আধুনিক মাসিকপত্রের অগ্রদূত ঐ "মুকুলে"রই অন্যতম সম্পাদক। (তার আগেও তিনি "সখা" প্রভৃতি শিশু-পত্রিকার জন্যে কলম ধ'রে ছোটদের মধ্যে প্রচুর আনন্দ বিতরণ করেছিলেন।)

যোগীন্দ্রনাথের নাম আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইস্কুলের পড়া মুখস্থ ও মাষ্টারমশাইয়ের ধমক হজম করবার পরেও যে খেলা ফেলে বই পড়বার সখ বা সাধ হ'তে পারে, তাঁর লেখা শিশুপাঠ্য পুস্তক পাঠ ক'রেই আমার প্রথম সেই শিক্ষা লাভ হয়। সেদিনকার অভিভাবকরাও জানতেন না, স্কুলপাঠ্য কেতাব ছাড়া ছেলেমেয়েদের পাঠযোগ্য কোন পুস্তক থাকতে পারে এবং শিশুদের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্যে সে-সব পুস্তক আবার কিনে দেওয়া কর্ত্তব্য!......মনে আছে, বাবার সঙ্গে কলেজ ষ্ট্রীট দিয়ে যেতে যেতে এক জায়গায় যোগীন্দ্রনাথের একখানি শিশুপাঠ্য বই দেখলুম। মনে যে কী লোভই হ'ল! তখনও আমার আবদার ধরবার বয়স ছিল, কিন্তু বাবার কছে ভয়ে মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারলুম না। কারণ সে-যুগে কেতাবের জন্যে আবদার ধরা ছিল অসম্ভব ও অভাবিত ব্যাপার! তারপরে

দিন কয়েক ধ'রে জলখাবারের পয়সা জমিয়ে সেই বইখানি নিজেই কিনে আনলুম এবং তিনতলার নির্জ্জন ছাদে ব'সে বিপুল আগ্রহে বইখানি শেষ না ক'রে আর উঠতে পারলুম না। আজও প্রতিদিন বিশ্বপ্রসিদ্ধ কোন-না কোন লেখক আমার চিত্তক্ষুধা নিবারণ করেন; কিন্তু যোগীন্দ্রনাথের প্রসাদে প্রথম পুস্তকপাঠের সেই যে অপূর্ব্ব আনন্দ ও উত্তেজনা, বিশ্বের অন্য কোন শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের মধ্যেও পরে আর তার তুলনা পাই নি!—যেমন তুলনা মেলে না ফুলশয্যায় নববধূর প্রথম স্পর্শের! সেইদিন থেকেই যে পড়ার নেশা আমাকে পেয়ে বসল, হয়তো আমি সাহিত্যধর্ম্ম অবলম্বন করেছি তারই প্রেরণায়। কারণ আমার বিশ্বাস, যার বই পড়ার নেশা নেই, কোনদিন সে ছোট সাহিত্যিকও হ'তে পারে না।

যোগীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত "সিটি বুক সোসাইটি"র বয়স কত জানি না। তবে এইটুকু মনে আছে, অল্প বয়সে আমার কাছে ঐ পুস্তকালয়টি ছিল পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময়ের মত! 'সিটি বুক সোসাইটি'র সামনের দিকে তখন ছোটদের উপযোগী যতরকম সুদৃশ্য বই সাজানো থাকত, আর কোথাও তা দেখা যেত না। দিনের পর দিন লুব্ধ দৃষ্টিতে তাদের পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে অর্থাভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে শেষটা চ'লে এসেছি এবং তারপর একদিন অতি-কষ্টে জলখাবারের পয়সা জমিয়ে বা কাকুতি-মিনতিতে মায়ের মন গলিয়ে মূল্য নিয়ে এক-একখানি বই কিনে 'ওয়াটার্লু' বিজয়ী বীরের মত বাড়ীতে এসে একেবারে তন্ময় হয়ে পড়তে বসেছি! ঠিক সেই সময়টিতে আমি আর আমার কেতাব ছাড়া বাকি দুনিয়াটাকে রসাতলে পাঠাতে চাইলেও আমার তরফ থেকে নিশ্চয়ই কোনও প্রতিবাদ উঠত না! আমার অবস্থা হ'ত তখন অনেকটা সেইরকম—

"যোগাসনে লীন যোগীবর,—
তার কাছে কোথা আছে বিশ্বের প্রলয়?'

এবং এটা মাত্র আমার কাহিনী নয়,—যে-কোন গ্রন্থভক্ত শিশুর কাহিনী! বলা বাহুল্য সে-সব বইয়ের মধ্যে যোগীন্দ্রনাথের রচনাই ছিল বেশী। এখনকার ছেলে-মেয়েরা না-চাইতেই বাপ-মায়ের কাছ থেকে নানান্ মজার বই উপহার পায়, সুতরাং সে-যুগের তরুণ পাঠকের সুখ-দুঃখের কথা তারা হয়তো ভালো ক'রে বুঝতেই পারবে না।

যোগীন্দ্রনাথের চেষ্টায় আমাদের শিশুসাহিত্যের আর একটি মস্ত উপকার হয়েছে। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, শিশুপাঠ্য পুস্তক যে ছোটদের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল, এবং সেই সঙ্গে তা যে ছেলেমহলে খেলার মত লোভনীয় আনন্দ বিতরণ করতে পারে, এবং স্কুলপাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে এই শ্রেণীর সুকুমার-সাহিত্য যে তাদের হাতে দেওয়া অত্যন্ত দরকার; কেতাবের পর কেতাব প্রকাশ ক'রে বাঙালী অভিভাবকদের মস্তিষ্কে এই সৎবুদ্ধি দান করেছিলেন সর্ব্বপ্রথমে যোগীন্দ্রনাথই। উপরন্তু আজকের বাংলায় ছোটদের সাহিত্য-জগতে যে বিচিত্র আনন্দমেলা বসেছে এবং জনাকীর্ণ তৈরি বাজার দেখে আজ যে অগুন্তি শিশুসাহিত্যকার লেখনী ধারণের জন্য উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন, এ-সমস্তেরই গোড়ায় দেখি যোগীন্দ্রনাথ প্রমুখ দুই-তিনজনের বহুবর্ষব্যাপী চেষ্টা যত্ন ও নিষ্ঠা। লিখছেন আজ অনেকেই, কিন্তু লেখার চাহিদা সৃষ্টি করেছেন প্রধানতঃ যোগীন্দ্রনাথই।

ছোটদের বই লিখে কেবল ছাপালেই হয় না, সে বইয়ের রূপও হওয়া উচিত ছোটদের মন-ভুলানো। বাংলা দেশে এই সত্য কথাটা প্রথম বুঝেছিলেম যোগীন্দ্রনাথই। তাঁর আগে আর কেউ এমন সুন্দর সব ছবি দিয়ে সাজিয়ে ও এমন চমৎকারভাবে ছাপিয়ে নূতন নূতন বই প্রকাশ করতে পারেন নি। ছবি ও ছাপার সাজে বুড়োদেরও মন ভোলে। প্রমাণ, বাংলা দেশে পরিণত মনের উপযোগী মাসিক সাহিত্যের জনপ্রিয়তা বেড়েছে তখন থেকেই, যখন থেকে তার ছবি ও ছাপার রূপ খুলেছে বিশেষভাবে। যে যুগে শিশুপাঠ্য মাসিকের-রাজ্যে "মুকুলের" আবির্ভাব, সেই যুগই বড়দের উপযোগী আধুনিক সচিত্র মাসিকপত্রগুলির অগ্রজ ও

আদর্শরূপে "প্রদীপ" আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু বর্ণ ও চিত্র বৈচিত্র্যের দিকে শিশুচিত্তের আকর্ষণ যে অধিকতর প্রবল, এবং গম্ভীর মানুষের মত গম্ভীরদর্শন পুস্তক দেখলেও যে ছোটদের মন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, এটা খুব ভাল ক'রে জানতেন ব'লেই শিশুদের বাস্তব স্বপ্নের জগতে যোগীন্দ্রনাথের পসার আরো বেশী জমে উঠেছে।

বাংলায় গদ্যসাহিত্যের জন্ম হয়েছে গত শতাব্দীর প্রায় প্রথমেই। বাংলা শিশুসাহিত্যের বয়স তার চেয়েও ঢের কম। ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতদের দৃষ্টি একবার বাঙালী শিশুদের উপর প'ড়েছিল বটে, কিন্তু তা স্থায়ী হয় নি। দু-চারখানি অনূদিত কেতাবও বেরিয়েছিল, শিশুদের দিক থেকে তার কোনখানিই উল্লেখযোগ্য নয়। আমাদের কাব্যসাহিত্য বয়সে প্রাচীন বটে, কিন্তু শিশুদের উপরে সে যে কোনদিন সদয় হয়েছে এমন প্রমাণ আছে ব'লে জানি না। শিশুদের পাঠশালার জন্যে আগেও পাঠ্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু লেখকদের সে-সব চেষ্টাকে শিশুরা নিশ্চয় মনে করত নির্দ্দয়তা। আমাদের দেশে ছেলেভুলানো ছড়ার অভাব নেই, কিন্তু তা উচ্চসাহিত্যে আসন লাভ করতে পারে নি। তবে গদ্যে ও পদ্যে আমাদের একালের নবীন শিশুসাহিত্যের কতক কতক অংশ যে উচ্চ-সাহিত্যের অন্তর্গত হবার যোগ্য, একাধিক লেখক সেটা প্রমাণিত করেছেন বিশেষভাবে। লুইস ক্যারল Alice in Wonderland প্রভৃতির জন্যে ইংরেজী সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতিরও শিশুপাঠ্য অনেক রচনা বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে। এক্ষেত্রে সমস্ত বাঙালী লেখকের শিশুপাঠ্য স্মরণীয় রচনা নিয়ে আলোচনা করবার সময় নেই, কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে অল্পদিনের মধ্যেই বাংলা শিশুসাহিত্যের উন্নতি হয়েছে বিস্ময়কর—যদিও এ উন্নতি এখনো সর্ব্বাঙ্গীন হ'তে পারে নি।

এই উন্নতির ভিত্তি-প্রতিষ্ঠার কার্যে অন্যতম প্রধান কর্ম্মীরূপে যোগীন্দ্রনাথ অনায়াসেই অভিনন্দন লাভ করতে পারেন। বাংলাদেশে যে-যুগে শ্রেষ্ঠ লেখকরা শিশুপাঠ্য রচনাকে গৌরবজনক ব'লে মনে করতেন না, সেই সময়েই প্রমদাচরণ ও যোগীন্দ্রনাথ শিশুচিত্তরঞ্জনকেই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অমরতালাভের যোগ্য। যে মালী চারাগাছে জল না দিয়ে জলপাত্র হাতে ক'রে ব'সে থাকে ধাড়ী গাছে জল ঢালবার জন্যে, সে যত বড় পাকা মালীই হোক তাকে বোকা ছাড়া অন্য নামে ডাকা যায় না। আগেকার বাঙ্গালী লেখকরা যে ঐ রকম বোকামিই ক'রে গেছেন এ কথা বলতে আমার বাধবে না। অধিকতর ঘনীভূত সাহিত্যরস উপভোগের উপযোগী ক'রে তোলবার জন্যে শিশুদের মন গোড়া থেকেই ধীরে ধীরে গঠন করবার চেষ্টা করা উচিত। বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ বাঙালী পাঠকই যে উচ্চ-সাহিত্যের সূক্ষ্মতম রস উপলব্ধি করতে পারে না, এই দুঃখজনক সত্যকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। সেক্সপিয়ারের "ম্যাকবেথে"র মত ও রবীন্দ্রনাথের "গৃহপ্রবেশ" আর "তপতীর" মত নাটক সু-অভিনীত হয়েও বাংলা দেশে চলে নি। রবীন্দ্রনাথের উচ্চতর শ্রেণীর কবিতারও ভক্ত এখানে সংখ্যায় কত কম! এখানকার অনেক সুশিক্ষিত পাঠকেরও কাছে যে "শেষের কবিতা"র মত লেখার আর্টে ও চরিত্রসৃষ্টিতে অসাধারণ উপন্যাস দুর্ব্বোধ্য এটাও আমি ভালো ক'রেই জানি। আমার মতে, এ-সব লক্ষণ বয়স্ক পাঠকেরও শিশু-মনের পরিচয় প্রকাশ করে। শিশুকাল থেকে তাঁদের মনকে ধীরে ধীরে সাহিত্য রসে ক্রমেই বেশী অভ্যস্ত ক'রে তুলতে পারলে সাহিত্যের উচ্চমার্গ তাঁদের কাছে আজ এতটা দুর্গম বলে মনে হ'ত না।

যোগীন্দ্রনাথ জলসিঞ্চন ক'রে গেছেন চারা-গাছেই। শিশুসাহিত্যসেবক এই তীক্ষ্ণধী সাধককে আমি প্রণাম করি। তাঁর স্মৃতিপবিত্র আদর্শ অন্ধদের দৃষ্টিদান করুক।

('নাচঘর' হইতে)

ভাষায় আর ভারতের অন্যান্য ভাষায়ও কত সুন্দর-সুন্দর শিশু-পাঠ্য বই বেরোচ্ছে, আর সরকারও এ বিষয়ে অবহিত হ'চ্ছেন। কিন্তু অর্ধশতাব্দী পূর্বে যিনি এ ক্ষেত্রে বাঙালী আর ভারতবাসীর চোখ খুলে দেন, তাঁর সহৃদয়তা আর দূরদৃষ্টির কথা মনে ক'রে আমরা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের প্রণাম নিবেদন করি।

এ ছাড়া, আর একটি বিষয়ের জন্যও তাঁর কাছে আমরা নত মস্তকে আমাদের জাতির তরফ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, যখন দেশময় অভাবনীয় উৎসাহের, দেশপ্রেমের আর আত্মবলিদানের হাওয়া মানুষকে যেন পাগল ক'রে তুলেছিল, সেই সময় বাংলা দেশে বিস্মৃতপ্রায় আত্মত্যাগী বীরদের পুণ্য অবদান আমরা নোতুন ক'রে জাগিয়ে' তুল্‌বার চেষ্টা আরম্ভ ক'রলুম—পৃথ্বীরাজ, রাণাপ্রতাপ, প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, শিবাজী, রাজসিংহ, গুরুগোবিন্দ সিংহ—এঁদের আমরা আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অশরীরী নেতা রূপে আবাহন ক'রে আন্‌বার জন্য আগ্রহান্বিত হ'লুম। বাংলা দেশের কবিরাও এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিভিন্ন দিক অবলম্বন ক'রে জনসাধারণকে জাগিয়ে' তুল্‌বার জন্য কত-না গান রচনা ক'র্‌লেন। স্বদেশী আন্দোলন যে ধ্বংসমূলক ছিল না, সৃজনধর্মী ছিল, এই-সব স্বদেশী গান ছিল তার অন্যতম প্রমাণ। ১৯০৪—১৯০৮ সালে যখন আমরা ইস্কুলে পড়ি বা ইস্কুল থেকে সদ্য বার হয়েছি, তখন এ রকম কত-না গান, গাইতে পারি আর না পারি, দলবদ্ধ হয়ে গেয়ে-গেয়ে রাস্তা মাত ক'রে বেড়াতুম। এর উপর আবার ছিল বরিশালের স্বনামধন্য মুকুন্দ দাসের যাত্রা আর তাঁর উন্মাদনাপূর্ণ গান, যে গান শুনে আমাদের কিশোর আর তরুণ মনে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা আর আত্মত্যাগের ইচ্ছা জেগে উঠ্‌তো। এই ধরনের অনেক গান নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে, আরও নষ্ট হ'য়ে যেত—তাদের পুনরুদ্ধার করা দুরূহ গবেষণার ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াতো। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সেই ক্রান্তিকারী ঘূর্ণিপাকের মধ্যে এক শুভক্ষণে যোগীন্দ্রনাথের মনে এই চিন্তার উদয় হ'লো—পথে ঘাটে লোকের মুখে মুখে যে সব স্বদেশী গান দেশময় ছড়িয়ে' প'ড়েছে, সেগুলি সংগ্রহ ক'রে একখানি বইয়ের মধ্যে গেঁথে রাখা। ছড়ানো ফুলের এই মালা তিনি স্বদেশবাসীর কাছে 'বন্দে মাতরম্' নাম দিয়ে একখানি নাতিবৃহৎ স্বদেশী গান আর কবিতার বইয়ের আকারে এনে দিলেন—আমরা তাঁর এই কাজকে প্রবুদ্ধ ভারতের চরণে এক মহনীয় অর্ঘ্য ব'লে দেশমাতার প্রসাদ রূপে মাথা পেতে নিলুম। এই বই তার নিজস্ব ক্ষেত্রে আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে সমস্ত বাঙালীর মনে দেশাত্মবোধ জাগাতে, আশা আর আগ্রহ এনে দিতে বিশেষ ভাবে সহায় হ'য়েছিল। এই কাজেও যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। এজন্যও আমরা আজ তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর বছরে তাঁকে স্মরণ করি, তাঁকে বরণ করি, তাঁকে প্রণাম করি।

—: ০ :—

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলায় শিশু সাহিত্যের কথা আলোচনা করতে গেলে স্বভাবতই যোগীন্দ্রনাথ সরকারের কথা মনে পড়ে। কারণ তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে শিশু সাহিত্যের পথিকৃৎ। বাংলা সাহিত্যে শিশু সাহিত্য রচনায় যাঁরা ছিলেন অগ্রণী, তাঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন রবীন্দ্রনাথ ও দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। পারিবারিক পত্রিকা 'বালকে' রবীন্দ্রনাথ প্রথম শিশু সাহিত্য রচনা করেন। তবে তা অব্যাহত থাকে না। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার আজীবন শিশু সাহিত্যের সেবা ক'রে এসেছেন, কিন্তু তাঁর রচনা প্রধানত লোক সাহিত্য হতে উদ্ধার ক'রে শিশুদের প্রিয় কাহিনীগুলির সাহিত্যিক রূপ দেওয়ায় সীমাবদ্ধ ছিল। এই ভাবেই তাঁর 'ঠাকুমার ঝুলি,' 'ঠাকুরদার ঝুলি' প্রভৃতি বই গল্পে ভরে উঠেছে। যোগীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর সমগ্র জীবনই নানা ভাবে শিশু সাহিত্যের সেবায় উৎসর্গ করে গিয়েছেন।

এই মন্তব্যটি ভাল রকম হৃদয়ঙ্গম হবে তিনি কত ভাবে শিশু সাহিত্যের সেবা করেছেন তার আলোচনা করলে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রথম শিশু বিষয়ক রচনা 'হাসি ও খেলা' প্রকাশিত হয়। পরের দুই বছরে আরও তিন খানি এই শ্রেণীর রচনা প্রকাশ হয়। তার পরেই দেখি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সিটি বুক সোসাইটি স্থাপন করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে অন্য সাহিত্যিকদেরও উৎসাহিত ক'রে ধারাবাহিক ভাবে শিশু সাহিত্য প্রকাশ ক'রে যাওয়া। তাঁর এই চেষ্টা রীতিমত সাফল্য মণ্ডিত হয়েছিল। উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী রচিত 'ছেলেদের রামায়ণ' ও 'ছেলেদের মহাভারত', নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রণীত 'টুকটুকে রামায়ণ' এবং কুলদারঞ্জন রায়ের 'ওডিসি', 'ইলিয়ড' প্রভৃতি গ্রন্থ এখান থেকেই প্রকাশিত হয়। দেশের যাঁরা কৃতি সন্তান, তাঁদের প্রভাব যাতে শিশুদের মনে ক্রিয়াশীল হয়, তার উদ্দেশ্যে তিনি 'ভারত গৌরব গ্রন্থাবলীর' প্রচার করেন, এই সিরিজের পুস্তকগুলির দাম ছিল মাত্র পাঁচ আনা। তাতে বঙ্কিমচন্দ্র, রাণাডে প্রভৃতির জীবনী স্থান পেয়েছে।

তিনি নিজে শিশুদের জন্য যে সব পুস্তক রচনা করেছিলেন তার মধ্যেও একটি উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে শিশুকে বিভিন্ন অক্ষরের সহিত সহজে পরিচয় ঘটাবার উদ্দেশ্যে পুস্তক রচিত হয়েছে। এই শ্রেণীতে পড়ে 'হিজিবিজি', 'হাসিখুসী' প্রভৃতি। তারপরে আর এক শ্রেণীর বই রচিত হয়েছে, যেখানে শিশুর বর্ণ-পরিচয় হবার পর তার কল্পনা শক্তির পরিস্ফুরণের জন্য নানা কাহিনী, ছড়ায় এবং গল্পে, নানা ভঙ্গিতে রচিত হয়েছে। 'ছড়া ও পড়া,' 'হাসি ও খেলা' প্রভৃতি এই শ্রেণীতে পড়ে। 'আষাঢ়ে স্বপ্ন' বইখানি এই শ্রেণীতে পড়লেও তার একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। নানা জানোয়ারের চরিত্রের মধ্য দিয়ে এখানে গল্প রচিত হয়েছে। আরও উচ্চস্তরের রচনাও আমরা তাঁর কাছে পাই। সেখানে তাঁর বই যেমন বালকদের আনন্দ দেবার ক্ষমতা রাখে, তেমন বয়স্কদের মনকেও সমান আকর্ষণ করে। তাঁর রচিত নানা শীকার কাহিনীর বই 'বনে জঙ্গলে' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

যোগীন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে। ১৮৯১ হতে আমৃত্যু ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি এই ভাবে

শিশুদের নানা ভাবে সেবা ক'রে গেছেন। এ কথা বোধ হয় অবিসম্বাদিভাবে সত্য যে, শিশু সাহিত্যে তাঁর দান সব থেকে ব্যাপক। বাংলার সাহিত্য রসিক সমাজ সে কথা ভোলেনি। তাই গত ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে নানা সাহিত্যিক গোষ্ঠী তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমার মনে হয় বর্তমান কালের কোনো বয়স্ক মানুষের পক্ষেই তাঁর কথা ভোলা শক্ত। ছেলেবেলায় তাঁর রচিত যে সব ছড়ার সহিত আমাদের পরিচয় হয়েছিল, তাদের অনেকে এখনও আমাদের মনের আনাচে কানাচে উঁকি মারে। 'বিয়ে পাগলা রাম সুন্দরের' কথা বা 'উল্টা বুঝলি রামের' খেদোক্তি আমরা ভুলব না। আর দাদখানি চাল, মুসুরির ডাল, চিনি পাতা দই, ডিম ভরা কই, ছুটো পাকা বেল এবং সরিষার তেল অন্য মনস্ক ছেলের মনে কি ক'রে অদল বদল হয়ে দাদখানি ডাল, মুসুরির চাল, চিনি পাতা কই, ডিম ভরা দই, ছুটো পাকা তেল আর সরিষার বেল-এ পরিণত হল, তার কৌশল তিনিই ভাল রকম জানতেন।

—: o :—

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

প্রভাতকিরণ বসু

তুমি এসেছিলে চিরসুকুমার, শিশুর মতন মনে
এসেছিলে কচি কিশোর পরাণে আনন্দ-বিতরণে,
সহসা অকালে পাকিয়ে যাওয়ার বুড়িয়ে যাওয়ার দেশে।
আসোনি কিন্তু মুরুব্বিদের মাতব্বরের বেশে।
সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ সেজে সবজান্তার রূপে
আসোনি বন্ধু ; ছোট খেলাঘরে এসেছিলে চুপে চুপে।

তাই ত' যেদিন কিশোর ছিলাম, তোমারে আপন ব'লে
চিনিয়াছিলাম, বচনে তোমার তাই গিয়াছিনু গ'লে।
যা দিয়েছ দান নিয়েছি মাথায় ; রেখেছি মরমপটে,
রেশটুকু তার যায়নি মিলায়ে, জাগিছে স্মৃতির তটে।
আজো ফিরে যেতে রয়েছে বাসনা রঙীন খেলার ঘরে,
যেথা তুমি আছ অমর হইয়া অনাদি কালের তরে।

কি করিয়া লোভ করিলে দমন পরিণতদের মাঝে
খ্যাতির আসন করিতে দখল ? নাম যাতে বেশী বাজে,
বেশী কোলাহল, বেশী জয়গান, বেশী মোহমাদকতা।
চিরদিন ধ'রে শুনালে কেবলি ছোট ছেলেদের কথা।
ছেলেরা হয়েছে প্রবীন যখন, তোমারে দেখেনি ফিরে,
তাদেরো ছেলের দল আসিয়াছে আবার তোমারে ঘিরে।

ওগো চিরশিশু, রেখেছিলে মন চিরনির্ম্মল ক'রে
চির উজ্জ্বল আদর্শখানি উর্দ্ধে তুলিয়া ধ'রে।
হাসিতে খুসিতে যে শিক্ষা তুমি দিয়ে গেলে শিশুমনে
তুলনা তাহার দুর্লভ হেরি বিপুল অন্বেষণে।
কোথায় সে প্রীতি, কোথা সে মমতা, কোথা বিগলিত হিয়া ?
শিশু-কল্যাণে কোথা তপস্যা জীবন বিসর্জিয়া ?

সস্তায় নাম কিনিতে মোদের দুশ্চেষ্টার তাড়া।
শিশুসাহিত্যে ওস্তাদি করি কম্পিত ক'রে পাড়া।
পড়িতে পড়িতে ভুলিবে যে লেখা, সেই লেখা চারিদিকে।
শিশুদের কাছে ডাকি নাই, যাই শিশুদের বই লিখে।
অনুসরণীয় তিনখানি নাম রহিবে চিরন্তন,—
রবীন্দ্রনাথ, যোগীন্দ্রনাথ, দক্ষিণারঞ্জন।

তিনখানি নাম জপমালা ক'রে যাব দুর্গমপথে,
অযোগ্যতার কুণ্ঠা ভুলিয়া, শিশুলোভনীয় হ'তে।
মনোহরণের মন্ত্র শিখিব তাঁহার চরণতলে,
প্রথম যে মোরে করিয়াছে কবি, অসীম কৌতূহলে।
বিনয়ে এবং সারল্যে ছিলে চিরপ্রণম্য তুমি।
ছেড়ে চ'লে গেলে জয়ন্তীহীন মলিন জন্মভূমি।

—: o :—

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

লীলা মজুমদার

সমরসেট ম'ম বলেছিলেন গল্প লেখকদের পাঠকরা মনে রাখে চল্লিশ বছর, কবিকে চিরকাল। তার কারণ চিরন্তন বিষয়বস্তু নিয়েই কাব্যের সৃষ্টি; সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ নানান ছলে কবিতার উপকরণ হয়ে ওঠে। তার পুরোনো হয়ে উঠবার উপায় থাকে না। ছোট গল্প ও উপন্যাস সাধারণতঃ মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে লেখা, চল্লিশ বছরে তাই সে সব সেকেলে হয়ে যায়; জ্ঞানের বিস্তারের সঙ্গে বহু প্রবন্ধের প্রয়োজনীয়তা ও আদর চলে যায়। কিন্তু এমন গল্পও আছে যে স্বভাবতঃ কাব্যধর্মী, তাই সে কখনো পুরোনো হয় না; রসরচনা ও ছোটদের জন্য লেখা অনেক বই-ই এই ধরণের জিনিস। তাদের আদর দেশকালোত্তর। ছোটদের জন্য রচিত কবিতার তো কথাই নেই।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'খুকুমণির ছড়া' থেকে একটি নমুনা দিই:—

> ঘোড়ায় নাকি পাড়ে না ডিম?
> ঐ ছাখ তার বাসা,
> ডিমের উপর বসে ঘোড়া
> তা দিচ্ছে খাসা।'

এ ছড়া আজ কেন আগামী পরশুও লেখা হতে পারত, তবু এর অপরূপত্ব ও জনপ্রিয়তা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হত না। নিতান্ত শিশু বয়সে প্রথম পড়েছিলাম; সঙ্গে একটি লাইন-ড্রইং-এর অবিস্মরণীয় ছবি ছিল। কবিতার কথায় যদি বা কারো প্রত্যয় না হয়, ছবি দেখলে মন থেকে সব অবিশ্বাস ঘুচে যেতে বাধ্য। গাছের মগ্‌-ডালে, কাকের বাসার মতো, কিন্তু তার চ.ইতে অনেক বড় বাসা বেঁধে, স্বীয়—গৃহস্বামিত্ব প্রমাণ করবার জন্য বাসার দেয়ালের উপর দিয়ে সামনের দুই খুর ঝুলিয়ে দিয়ে, ঘোড়া ডিমে তা দিচ্ছে। বাসাটি যে তারই নিজস্ব তাতে কোনো সন্দেহের কারণ নেই, যেহেতু আশেপাশে নানান্ মাপের ঘোড়ার পায়ের নাল ঝোলানো আছে এবং সারা ছবিময় একটা উগ্র ঘোড়া-ঘোড়া ভাব। এ ছবি কে এঁকেছিলেন জানি না, তবে কবির সঙ্গে তিনিও স্বচ্ছন্দে অমরত্ব দাবী করতে পারেন।

'খুকুমণির ছড়া' যোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত একটি সঙ্কলন; এর মধ্যে অনেক পুরোনো প্রচলিত ছড়ার সঙ্গে অন্যান্য লেখকদের রচনা, বিদেশী সাহিত্য থেকে অনুবাদ ও যোগীন্দ্রনাথ সরকারের নিজের কবিতাও আছে। এই বিশেষ ছড়াটি কোন শ্রেণীতে পড়ে বলতে পারি না, কিন্তু বাংলা শিশু সাহিত্যের বিস্ময়কর উন্মেষের সময়ের যে সব মনোহর রচনা দেশে সাড়া জাগিয়েছিল এবং আজ পর্য্যন্ত যাদের পরাভব হয়নি, এই কবিতা তারি একটি উদাহরণ।

দেশে এমন বহু প্রতিভাবান লেখক আছেন, যাঁদের ললাটে সাফল্যের তিলক জলজ্বল করলেও, তাঁরা না জন্মালে দেশের বিশেষ ক্ষতি হত না। কারণ, তাঁদের পাঁচ দশ কি এক কোটি উৎকৃষ্ট বই তাঁরা যদি বা না-ই লিখতেন, আরো পাঁচ দশ কি পঁচিশজন সমান গুণী লেখক এগিয়ে এসে যেটুকু ঘাটতি হয়, নিমেষের মধ্যে পূর্ণ করে দিতেন। দেশীয় সাহিত্যের বিবর্তন অব্যাহত থাকত।

তেমনি আবার মুষ্টিমেয় কয়েকজন আছেন যাঁরা সাহিত্যসেবায় নিজেদের উৎসর্গ না করলে, কোনো না কোনো দিক্ দিয়ে সাহিত্য অভাবগ্রস্ত হয়ে থাকত।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার এই মুষ্টিমেয়র অন্যতম। শোনা যায় প্রথম প্রকাশিত আধুনিক বাংলায় ছোটদের জন্য মৌলিক গ্রন্থ হল ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ও যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত 'হাসি ও খেলা'। এই একখানি বই দিয়ে যোগীন্দ্রনাথ বাংলার শিশুসাহিত্যের ধারার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন; আর তাকে ফিরে দেখতে হয়নি।

এই সময়ে যদি তিনি অনুপ্রেরণার দোসর না পেতেন, তা হলে স্থায়ী প্রভাব কতখানি হত বলা যায় না; সৌভাগ্যের বিষয় ওঁদের এমন একটি গুণীর দল গড়ে উঠেছিল যাঁদের উদ্দেশ্যই ছিল খ্যাতি বা ব্যক্তিগত লাভের দিকে দৃষ্টি না রেখে, বাংলায় এক বৈশিষ্ট্যময় বাল-সাহিত্য গড়ে তোলা, যাতে বাংলার ছেলেমেয়েদের আর কখনো মানসিক দৈন্য অনুভব করতে না হয়।

সহজেই বলা চলে এঁদের আগমনের আগে বাংলা শিশু সাহিত্যের স্বকীয়তা বলে কোনো বস্তু ছিল না। তার মানে নয় যে, ছোটদের পড়বার মতো বই-ই ছিল না, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত ইত্যাদি এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, কিন্তু তাঁদের গ্রন্থগুলি—যেমন আখ্যান মঞ্জরী, কিম্বা চারুপাঠ—পাঠ্য তালিকায় উচ্চস্থান পাবার উপযুক্ত হলেও, প্রকৃত শিশুসাহিত্য ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাদান, রস পরিবেশন নয়। এ ছাড়া খৃষ্টান মিশনারিদের খৃষ্টিয় নীতি শিক্ষার বই তো ছিলই। তাকেও সাহিত্য বলা চলে না।

শিশুদের জন্য পত্রিকাও প্রকাশিত হত; ক্রমে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেনের 'বালকবন্ধু', ১৮৮৩ সালে প্রমদাচরণের 'সখা', ১৮৮৪ সালে জোড়াসাঁকো থেকে প্রকাশিত 'বালক' দেখা দিল। ১৮৯৫ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত স্বনামধন্য 'মুকুল' প্রকাশিত হল। এইভাবে ক্রমে ক্রমে নতুন শিশুসাহিত্যের জমি তৈরি হয়েছিল। জমি তৈরি না থাকলে এই নব সাহিত্যের চারাটি অঙ্কুরিত হত কি না কে জানে।

'মুকুল' প্রকাশিত হবার আগেই ১৮৯২ সালে যোগীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বই 'ছবি ও গল্প' বেরিয়েছিল; সজনীকান্ত দাশের আত্মস্মৃতিতে এই বইখানির চমৎকারিত্বের কথা বিমুগ্ধভাবে উল্লেখ করা আছে। ১৮৯৩ সালে যখন 'রাঙা ছবি' প্রকাশিত হল, সবাই বললে ছোটদের জন্য এমন চোখ-জুড়ুনি বইয়ের কথা এর আগে কে ভাবতে পেরেছিল? মনে হয় এই ছিল যোগীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি; ছবি দিয়ে, রস দিয়ে, আনন্দ দিয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর করে ছেলেমেয়েদের জন্য বই প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করা। সেইদিন থেকেই বাংলা শিশু সাহিত্যের একটা সুউচ্চ মান প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। ছোটদের জন্য বই লিখলেই আর ছবি আঁকালেই কাজ শেষ হয়ে যায় না; সামনে থাকে সব চাইতে বড় সমস্যা। কম দামে ছোটদের জন্য ছবি দিয়ে সাজানো বই কে-ই বা প্রকাশ করতে সাহস করবে? পাকা ব্যবসায়ীরা তো নয়ই। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সিটি স্কুলে মাষ্টারি করতে-করতেই যোগীন্দ্রনাথ 'সিটি বুক সোসাইটি' স্থাপন করলেন। মুনাফার আশা না রেখে, ছোটদের জন্য বই ছাপাবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। দেশের একটা বড় অভাব কিছুটা মিটল। যোগীন্দ্রনাথের নিজের বই ছাড়াও, বহু নাম করা ছোটদের বই এখান থেকে প্রকাশিত হয়েছিল; যেমন, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সেকালের কথা, ছোটদের রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারত, মহাভারতের গল্প; দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর জীবজন্তু, চিড়িয়াখানা; পরে, কুলদারঞ্জন রায়ের রবিন হুড, ওডিসিয়ুস, ইলিয়াড ইত্যাদি।

উপেন্দ্রকিশোরের বিখ্যাত ইউ রায় এণ্ড সন্স তখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নি; সিটি বুক সোসাইটি একাই একশো। ছোটদের জন্য ভালো বই দেখে দেশের সকলেই আনন্দিত। সে সব বই এতই ভালো যে, আজ পর্যন্ত তাদের জুড়ি মেলা দায়। যোগীন্দ্রনাথের বইগুলি শিশুসাহিত্যের ক্লাসিক হয়ে আছে। হাসিখুশি ১ম ও ২য় ভাগ তিন পুরুষ ধরে বাঙ্গালী সন্তানদের মুগ্ধ করে রেখেছে। 'অ-য়ে অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে,' মায়ের

দুধের মতো বাংলার সব শিশুদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অমূল্য সম্পদ।

লোকে যখন লেখকের নামধাম ভুলে গিয়ে তাঁর লেখাগুলিকে প্রবাদ বাক্যের মতো অসংশয়ে গ্রহণ করে, তখনি তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। বর্তমান পর্যায়ে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের নাম তালিকাভুক্ত করা ভুল। কারণ, তিনি বিস্মৃতপ্রায় বাঙ্গালী লেখক নন্। যাঁর কলম থেকে হারাধনের দশটি ছেলের কাহিনী, 'এক যে আছে মজার দেশ', 'চ্যাপটা নাকে চশমা আঁটা গুরু মহাশয়' 'এখন আসে যদি বাঘ, আমার বড্ড হবে রাগ' 'দাদ্‌খানি চাল মুসুরির ডাল' ইত্যাদি অমৃত ধারার মতো নিঃসৃত হয়েছিল এবং আজো বাংলা শিশু জগতের মাটিকে সিঞ্চিত করছে, তাঁকে কি কখনো 'বিস্মৃত প্রায়' বলা উচিত? আরেকটি চিরন্তন ছড়ার কথা পাঠকদের মনে করিয়ে দিই :—

হাতি নিয়ে লোফালুফি
ছিল আমার কাজ ;
'সবাই আমায় ডাকত তখন
মল্ল মহারাজ।
সেদিন আর নাইকো রে ভাই,
সেদিন আর নাই ;
তিনটি হাতির ভারেই এখন
হাঁপিয়ে মারা যাই!'

ছোটদের জন্য এমন ছড়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বা ক'টি লিখেছেন?

যোগীন্দ্রনাথ ও তাঁর সতীর্থরা অন্য এক আবহাওয়াতে বাস করতেন, সেখানে তোমার-আমার ভেদ ছিল না। তাঁরা শুধু নিজেদের রচনা প্রকাশেই আগ্রহী ছিলেন না ; দেশবিদেশ থেকে যেখানে যা দেখে মনে হত ছোটদের ভালো লাগবে অমনি সেটি সংগ্রহ করে আনতেন। রস-পরিবেশনই ছিল তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য, সঙ্কলনগুলিতে সব সময়ে রচয়িতাদের নাম পর্যন্ত থাকত না ; অনেক ছবি বিলিতী বই থেকে নেওয়া হত, একই ছবি হয় তো একাধিক গ্রন্থে স্থান পেত। কত সময়ে ছবি দেখে তবে কবিতা রচনা করা হত। এমন অপূর্ব সমবায় সমিতি আর কখনো দেখা গেল না। যোগীন্দ্রনাথের 'হাসি ও খেলা' এই ধরণের বই ; এতে তাঁর নিজের লেখা ছাড়াও প্রমদাচরণ সেন, উপেন্দ্রকিশোর, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির রচনা সঙ্কলিত আছে।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার রচিত বা সম্পাদিত অনেকগুলি গ্রন্থের তালিকার দৈর্ঘ্য দিয়ে কিন্তু বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের অবদান মাপা যায় না। চোখের সামনে যে আদর্শ রেখে আধুনিক বাংলা শিশুসাহিত্য গড়ে উঠেছে, সেই আদর্শ স্থাপন করায় তাঁর কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধেয়। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীও সেই আদর্শ গ্রহণ করেই বাংলা শিশু সাহিত্যকে অমন অপরূপ বলিষ্ঠতা ও সম্পূর্ণতা দিতে পেরেছিলেন। বয়সে তিন বছরের বড় হলেও, উপেন্দ্র-কিশোরের কর্মজীবনের প্রথম দিকটা নানান্ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে কেটেছিল ; যোগীন্দ্রনাথ তরুণ বয়স থেকেই শিশুসাহিত্য রচনা ও প্রকাশনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

এঁরা ছিলেন সমগোত্র ও অভিন্ন-আদর্শ। শোনা যায় যোগীন্দ্রনাথ সরকারদের দেব-সরকার বংশের ও উপেন্দ্রকিশোরের (দেব) রায় বংশের একই পূর্বপুরুষ। শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেব ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও নাকি এঁদের সেই বংশ থেকেই উদ্ভূত।

যোগীন্দ্রনাথের জন্ম জয়নগরে, তাঁর মামার বাড়িতে। তাঁর পিতার নাম নন্দলাল দেব। লেখাপড়া শিখেছিলেন জয়নগর ও দেওঘর স্কুলে এবং কলকাতার সিটি কলেজে। পরে আনন্দমোহন বসু প্রতিষ্ঠিত সিটি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। এই সময় থেকেই তাঁর শিশুসাহিত্য সেবার

সূচনা হয় এবং সত্তর বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সেই সাধনায় ছেদ পড়ে নি।

মানুষটি ছিলেন কোমল, স্নেহশীল, পর-দুঃখকাতর, পরিহাসপ্রিয়। বাইরে থেকে তাঁর বিখ্যাত মেজদাদা, স্বনামধন্য চিকিৎসক স্যার নীলরতন সরকারের সঙ্গে বিশেষ কোনো সাদৃশ্য না থাকলেও, তাঁদের ভ্রাতৃপ্রেমের কথা সকলে জানত। লোকজন বড় ভালোবাসতেন, খেতে ও খাওয়াতে ভালোবাসতেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ভারী উৎসাহী ছিলেন।

কলকাতার ভিড়ে বাস করা যখন অসহ্য মনে হত, গিরিডিতে তাঁর বাগান দিয়ে ঘেরা বাড়ি, 'গোলকুঠি'তে চলে যেতেন। ক্রমে সেই বাড়ি বন্ধুবান্ধবের মিলনস্থল হয়ে উঠেছিল। তখনকার দিনের বাঙ্গালীরা ভারি একটা মজ্‌লিশি আবহাওয়ায় বাস করতেন, পরস্পরের মধ্যে হৃদয়ের যোগও ছিল অকৃত্রিম, সরস আদান-প্রদানের কত‌ই না গল্প শোনা যেত। উপেন্দ্রকিশোরের বড় দাদা অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায় তাঁর খেলার সরঞ্জামের দোকানে খাসা এক রকম মাছ ধরার চার বিক্রী করতেন। তার নাম ছিল, 'ইধর আও!' যোগীন্দ্রনাথ তাঁর দেখাদেখি আরেকটি চার প্রস্তুত করে তার নাম রাখলেন 'উধর মৎ যাও!'

শুধুই যে হাস্যরস পরিবেশন করে যোগীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত ছিলেন, সেটা মনে করা ভুল। সৎ ও সত্যপ্রিয়, আনন্দময় ও বলিষ্ঠ ছেলেমেয়ে তৈরী করাই ছিল তাঁর আশা ও সাধনা। তাঁর লেখা একটি ছোটদের গান থেকে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করে এই রচনা শেষ করি।

"জগতের পিতা তুমি করুণা নিধান,
হীনমতি শিশু মোরা দুর্বল অজ্ঞান।
ছোট প্রাণে আমাদের দাও ভালোবাসা,
ছোট ছোট মুখে দাও স্বরগের ভাষা;
শিখাও এ ছোট কণ্ঠে তব নাম গান!

[illegible]

যোগীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর

তোমাদের বন্ধু যোগীন্দ্রনাথ

শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি)

বন্ধু অনেক রকমের হয়, সবাইকারই দুচারজন বন্ধু থাকে; কিন্তু ভাই, তোমাদের বন্ধু হওয়া, ছোটদের বন্ধু হওয়া, যার তার কর্ম নয়?

তবে ভাই, যদি তেমন কাউকে পেয়ে যাও, যিনি তোমাদের মতো সহজ করে, মিষ্টি করে মজার মজার কথা আর গল্প শোনাতে পারেন, যিনি তোমাদের মনের রকমারী প্রশ্নের জবাব দিয়ে তোমাদের কৌতূহল-ভরা মনগুলিকে আনন্দের দোলায় দোলাতে পারেন, যিনি তোমাদের দুঃখকষ্টের কথা তোমাদের মতোই দিনরাত্তির ভাবেন—তিনি নিশ্চয় তোমাদের বন্ধু হতে পারেন? বেশ তাহলে ঠিক তেমনই সত্যিকারের ছোটদের বন্ধু একটি মিষ্টি মানুষের কথাই শোনাই তোমাদের আজ। কে তিনি? তিনি হলেন ছোটদের বন্ধু যোগীন্দ্রনাথ সরকার।

আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর, বাংলা ১২ই কার্তিক ১২৭৩ সালে জয়নগরে মামাদের ঘরে তাঁর জন্ম হয়। সাত ভাইবোনের কোলে ছোট্ট ছেলে, আদুরে ছেলে হয়ে তিনি জন্মালেন, মা বাবা দাদা দিদি মাসী-পিসিদের বুকভরা ভালবাসা আদর প্রাণভরে পেলেন। তোমরা ভাবছো—একশো বছর আগে অমন একটি ছেলেই তো শুধু নয়, অমন লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েই তো জন্মেছিল মায়ের কোলে—আদর ভালোবাসা সবাই পেয়েছিল। কিন্তু ঐ একটি ছেলে যোগীন্দ্রনাথকে বেছে নিয়ে, তাঁর কথাই শোনাতে বসলাম কেন আজ একশো বছর পরে!

এ-কথার জবাবে আমি বলবো—লক্ষ লক্ষ কেন গত একশো বছরে যে কোটি কোটি ছেলেমেয়ে জন্মেছিলেন বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে, তাঁদের মধ্যে কজন বেঁচে আছেন আজও লক্ষ কোটি মায়ের মুখের ছড়ায় কিংবা লক্ষ লক্ষ শিশুর হাতে-খড়ি হওয়ার পর, পড়া শেখার পড়ায়? আর সর্বজনের গর্ব-আদরের ভালবাসায়?

তোমাদের নিজের নিজের মা-মাসী, খুড়ি, পিসি, দিদিমা, ঠাকুমারই তো কতবার তোমাদের কোলে বুকে নিয়ে, গালে কপালে চুমু দিয়ে শুনিয়েছেন—

'ধন ধন ধন বাড়িতে ফুলের বন
এ ধন যার ঘরে নাই তার বৃথাই জীবন।'

সে ছড়া শুনে শুনে শিখেছেন একজনের পর অন্যজন, ঠাকুমা দিদিমার মুখ থেকে শিখেছেন মা-মাসীমা আর তাঁদের মুখ থেকে শিখেছে তাঁদের মেয়েরা-বৌমারা, তাঁদের কাছ থেকে শিখেছো তোমরা, আমার ছোট বন্ধুরা। তোমরা যারা পুতুল নিয়ে খেলা করো, খেলাঘরের গিন্নি-বান্নী হয়ে পুতুল খোকা, পুতুল খুকুকে আদর করো,—তারাও তো অনেকেই সুর করে ঐ ছড়াটাই বলো, তাই না?

পুতুল খোকা, পুতুল খুকুদের আদর করেই কি তোমাদের আশ মেটে? না পাঁচজনকে সেটা দেখাতে সাধ জাগে, ইচ্ছে হয়? তখন তোমরা অনেকেই হয়তো মনে মনে বলো—

"আ মরি কি পুতুল আমার,
দেখবি যদি আয়
টুকটুকে ঠোঁট, ফুটফুটে চোখ
মিটির-মিটির চায়।"

এ যুগের ছোটরা খোকাখুকুরা—তোমরাই যে শুধু ঐ সব ছড়া বলো আর শোনো, তা নয়, সত্তর বাহাত্তর বছর

ধরে বাঙলা দেশের গ্রামে-শহরে, বাঙালীর ঘরে ঘরে—ঐ সব ছড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে মায়েদের মুখে মুখে, আর ছোটরাও তাই শুনে মেতে উঠছে আনন্দে সুখে।

এমন অমর সৃষ্টি তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, তার কারণ ছোটদের ভাল বাসবার, আদর করে তাদের দুঃখ ঘোচাবার চোখের জল মোছাবার আগ্রহ আর উৎসাহে ভরা ছিল যোগীন্দ্রনাথের সমস্ত মন সারাটি জীবন। তাই একশো বছর পরে যোগীন্দ্রনাথকে স্মরণ ও প্রণাম করার জন্যে সারা দেশ জুড়ে হওয়া চাই যোগীন্দ্রনাথ জন্ম-শতবার্ষিকীর বিরাট আয়োজন।

সে আয়োজন, সে উৎসবে ছোটবড় সবাইকেই সাড়া দিতে হবে, সবাইকেই এগিয়ে আসতে হবে। বিশেষ করে যাদের বয়স আজ ছয় থেকে ষাটের কোঠায় যোগীন্দ্রনাথই যে ছিলেন তাদের অ-আ-ক-খ অক্ষর পরিচয়ের প্রথম গুরুমশাই। আরও খুলেই বলি কথাটা। আমাদের মত বুড়ো যারা, ছ-সাতের কোথায় যখন পা দিয়েছিলেন, তাঁরা সেই ছোটবেলাতেই তাঁদের হাতে খড়ির পর অক্ষর চিনতে বর্ণপরিচয় করতে হাতে নিতে হয়েছিল 'হাসিখুশি' বই। আওড়াতে হয়েছিল—

অ—অজগর আসছে তেড়ে
আ—আমটি আমি খাবো কেড়ে
ই—ই দুরছানা ভয়ে মরে
ঈ—ঈগল পাখি পাছে ধরে।

তোমাদেরও অনেকেই হয়তো পড়তে শিখেছো—যোগীন সরকার মশায়ের 'হাসিখুশি' বইটার ছড়াতে-লেখা মজাদার পড়া পড়ে। অথচ এমনই মজা যে ঐ ছড়া দিয়ে পড়া শেখার সময় কেউ তোমরা গোমরামুখো হয়ে বসে থাকোনি—'হাসিখুশি' হয়ে হাসিখুশি পড়েছ। অমন বই পড়াটা যেন মজা, যেন খেলা, যেন হাসি আর খুশির মেলা। তাই নয় কি? অনেকেই সায় দিচ্ছো দেখছি। তাহলে 'যোগীন্দ্রনাথ' যে চিরকালের ছোটদের বন্ধু, তোমাদের বন্ধু সেটা মানতে এখন সবাই রাজি? বেশ তাহলে তাঁর সম্বন্ধে আরও কিছু কথা এবং তাঁরই লেখা বইগুলি থেকে কিছু গল্পছড়া শোনাই আজই। শোনো—

এক যে টুনী, তার ছিল এক বেগুন গাছ। সেই গাছে আঁকশি দিয়ে সে রোজ বেগুন পাড়ত। বেগুনের বোঁটায় কাঁটা থাকে; তা তো জানো। একদিন হয়েছে কি টুপ করে একটা বেগুন পড়ে টুনীর পিঠে কাঁটা ফুটে গেল। অমনি ব্যথায় ছটফট করতে করতে সে নাপিতের বাড়ি ছুটলো।

নাপিত থাকতো অনেক দূরে। যেতে যেতে রাত হয়ে পড়লো। নাপিত তখন খেয়ে দেয়ে শুয়েছে, এমন সময় টুনী গিয়ে দরজায় ঘা দিয়ে ডাকলে—

'নাপিত ভায়া, নাপিত ভায়া
বাড়ি আছ হে';

নাপিত॥ রাত্তিরেতে ডাকাডাকি করছো তুমি কে?

টুনী॥ আমি টুনী পাখী। একটা কাঁটা বের করে দেবে?

নাপিত॥ দূর বোকা! রাত্তিরে কি কাঁটা বের করা যায়? কাল সকালে আসিস।

নাপিতের ওপর চটে গিয়ে টুনী রাজার কাছে নালিশ করতে গেল—

'রাজা মশাই! রাজা মশাই,
আছ তুমি ঘরে।'

রাজা॥ রাত দুপুরে কে ডাকাডাকি করে।

টুনী॥ আমি টুনী পাখী! নাপিতকে তুমি মারবে?

দেয় না নাপিত কাঁটা তুলে
পিঠটা আমার গেছে ফুলে।

কী সবাই মুচকে মুচকে হাসছো, ওঃ বুঝেছি—গল্পটা অনেকেরই জানা।

তা তো জানো? কিন্তু জানো কি এমন সহজ করে গল্প বলার ভাষায়—ছোটদের জন্যই শুধু নয়, বড়দের জন্যেও বই লেখার ব্যবস্থা যোগীন্দ্রনাথই সব প্রথম করেন। অমন করে মিষ্টি ভাষায় সে যুগেই শুধু নয়, এ যুগেই বা কজন ছোটদের জন্যে, অমন বই লিখতে পেরেছেন বলতো? অধিকাংশ ছোটদের বইই এখনও খটোমটো ভাষা আর ভাবে ভরা। যোগীন্দ্রনাথই প্রথম দেখান প্রথম শেখান—ছোট ছোট খোকাখুকুদের বইগুলো হওয়া চাই—ভালোবাসা, মিষ্টিকথা আর স্পষ্ট ছবিতে ঠাসা, অক্ষরগুলো হবে বড় বড় আর খুব সহজ হবে তার ভাষা। তাঁর প্রতিটি বই-ই তাই বড় বড় ছবিতে সাজানো, বড় বড় অক্ষরে ছাপানো। তাই আমরা যখন তোমাদের মত ছোট ছিলুম—তখন তাঁর বইগুলি হাতে পেলে আকাশের চাঁদ হাতে পেতুম। ছোটবেলার তাঁর 'হিজি-বিজি' বইটা আমার মনের শেলেটে যে সব হিজিবিজি দাগ কেটেছিল—সেগুলো বড় হওয়ার পরে—বুড়ো হওয়ার পরেও আমার মনের শেলেট থেকে মুছে যায়নি বলেই এখনও যোগীন্দ্রনাথ যেন আমার কানে কানে গল্পছড়া বলে যান, আর আমিও সেগুলো হিজিবিজি লেখায় যেমনটি পারি লেখবার চেষ্টা করি। কিন্তু পারি কই।

না পারার কারণ আজকাল, ছোট বড় সবাই গোমরা মুখ—চায় না কেউ সহজ মেলামেশা, প্রাণখোলা হাসি হাসতে। জানা-অজানা সবাইকে ভালবাসতে। তোমরাই কি সহজে হাস, না হাসতে ভালোবাসো? থাক বাপু। তোমাদের নিন্দে, সমালোচনা আর বেশী করবো না। তার চেয়ে যোগীন্দ্রনাথের হিজিবিজি কবিতা শুনিয়ে একটু হাসিয়ে দিই।

"বাঘের মুখে থাকতো যদি
রাম ছাগলের দাড়ি
শুয়োর যদি পাখীর মতো
উড়তো ডানা নাড়ি
গাছের ডালে বসে বাঁদর
গোঁফে দিত চাড়া,
ভুতুম পেঁচা আসতো ছুটে
বাগিয়ে বিষম দাড়া
উৎসাহেতে ধোপার গাধা
গাইতো যদি গান,
দেখে শুনে চমকে তবে
উঠতো না কার প্রাণ!"

কবিতাটির সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথের বইটির ছাপা ছবিটিতে সিংহের লম্বা দাড়ি, বাঁদরটার মুখের দুপাশে ঢেউ খেলানো খ্যাংরা ঝাঁটা—গোঁফ জোড়া আর প্যাচাটার দুপাশে ডানার বদলে ইয়া ইয়া মোটা ধারালো দাঁত সাজানো দু-দুটো দাড়া দেখতে যদি গায়ের লোম খাড়া! হাসির সঙ্গে চমক—ভয়ের সঙ্গে মজা—তাই তো যোগীন্দ্রনাথ ছোটদের বন্ধু—শিশুমনের রাজা।

তোমাদের জন্যে পড়াটাই যে ছড়া, আর ছড়াই যে পড়া হওয়া উচিত—এই ব্যবস্থা এখন চালু হয়েছে তোমাদের অনেকেরই ইস্কুলে—কিন্তু জেনে রাখ, ছোটদের বন্ধু যোগীন্দ্রনাথ সরকারই সে ব্যবস্থার মূলে—অর্থাৎ তিনিই পথটা প্রথম দেখান—ছোটদের জন্যে 'ছড়া ও পড়া' নাম দিয়ে একখানি বই বার করে। সে বইটার পাতায় নিপুণ হাতে লেখা আদর, রসিকতার রসে ভরা যেমন পড়া আর ছড়া, তেমনি টিটকিরি ঠাট্টার গিটকিরিও আছে মিঠে কড়া। নমুনা শোনো—কবিতাটার নাম—'পালোয়ান'।

"ফটিকচাঁদ বাবু
শীতে খান সাবু
গরমেতে ঘোল
বছর ভরে রোজ দু'বেলা
গাঁদালের ঝোল।
এই বড় জোয়ান।
বেজায় পালোয়ান
কাঠির মত শক্ত
ঘুসির চোটে ঠিকরে ওঠে
ছারপোকার রক্ত।

হেসে আনন্দ বাড়াতে—আর ভয় না পেয়ে সাহস বাড়াতে সাধ জাগে ছোট বেলাতেই। বনের বাঘ ভালুকের গল্প শুনতে যে তোমাদের ভালো লাগে, তাও যোগীন্দ্রনাথ জানতেন ভালো করে। সে সব গল্পও তিনি লিখে গেছেন 'নতুন ছবি,' 'ছোটদের চিড়িয়াখানা' 'জানোয়ারের কাণ্ড,' 'বনেজঙ্গলে'—এইরকম ক'খানা বইতে। তোমাদের বন্ধু—যোগীন্দ্রনাথের গল্প বলে শেষ করা যাবে না। তাছাড়া সামনের ঐ গোল ঘড়িটা আমার কানে যেন শোনাচ্ছে—ছোটবেলায় পড়া—যোগীন্দ্রনাথের ঘড়ির ছড়াটা। বলছে—

"বলিছে সোনার ঘড়ি, টিক টিক টিক
যা কিছু করিতে আছে করে ফেল ঠিক
সময় চলিয়া যায়
নদীর স্রোতের প্রায়
যে জন না বুঝে তার ধিক্ শত ধিক্।

অতএব সময় থাকতে থাকতেই তোমরা ছোটদের বন্ধু যোগীন্দ্রনাথ সরকারের যে কখানা বই পার জোগাড় করে পড়। তাঁর লেখা বই গুনতিতে হবে প্রায় পঁচিশখানা। যারা পারবে সবগুলোই খুঁজে পেতে নিও। আর একশো বছর আগে যিনি জন্মেছিলেন—ছোটদের বন্ধু হয়ে—হাসিমুখে আনন্দে তাঁকে সবাই স্মরণ কোরো, প্রণাম জানিয়ো। যোগীন্দ্রনাথ সরকার শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে গ্রামে শহরে—ছোটরাই গল্প-ছড়ার মেলা বসিয়ে তাঁর গল্প-ছড়াগুলো সকলকে শুনিয়ে দিও।

আনন্দমেলা, আনন্দবাজার পত্রিকা

—: o :—

যোগীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

একটু ছোঁয়ায় খুললে তুমি
শিশুর মনের বন্ধ দুয়ার
ঝরিয়ে কথার সে-মৌসুমী
ভিজিয়ে দিলে হৃদয়টি তার।
ছড়িয়ে দিলে কতই ছড়া
চিরকালের শিশুর তরে
সকল তোমার গল্প গড়া
স্বপ্নলোকের আলোয় ভরে।
স্রষ্টা তুমি নতুন ভাষার
পথিক তুমি নতুন পথের
একশ বছর আজ হল পার
পুণ্য তোমার জন্ম দিনের।
সকল শিশুর লেখক প্রিয়
কচি প্রাণের প্রণাম নিও॥

জ্যান্ত-মন যোগীন সরকার

স্বপনবুড়ো

খুব ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। সবে অক্ষর পরিচয় হয়েছে। কেঁদে-কঁকিয়ে তবু পড়তে ছাড়ি না। ছাপা কিছু পেলেই হাতের কাছে টেনে নিই। গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি হয়েছি। মামা বই আনতে দিলেন হাটে। তখনকার দিনে হাটে বই বিক্রী হত। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকলাম—কখন বই আসবে—কখন উল্টে পাল্টে দেখবো, ছবিগুলোতে চোখ বুলিয়ে যাবো। কিন্তু রাত বেশি হওয়ায় ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকাল বেলা শিয়রের দিকে তাকিয়ে দেখি—একেবারে অবাক কাণ্ড! পাঠশালার পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে এটা আবার রঙচঙে কি বই? আকুল আগ্রহে হাতে টেনে নিলাম—'হাসিখুশী'। পাতায় পাতায় ছবি আর ছড়া। "অজগর আসছে তেড়ে—আমটি আমি খাব পেড়ে।"

সেই যে যোগীন সরকারের মিষ্টি মধুর হাতটি চেপে ধরলাম, আজ এই বুড়ো বয়সেও ছাড়ি নি! ধীরে ধীরে যোগীন্দ্রনাথের সব বই পড়েছি। মনে কেমন যেন দোলা দিয়েছে। এমন করে ছোটদের জন্যে কেউ তো ছড়া, গল্প, কাহিনী, রূপকথা, জন্তু জানোয়ারের বিবরণ লিখতে পারে না। যোগীন্দ্রনাথ শিশু মনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন। এ যেন একটা আলাদা শিশু জগৎ—পর্দা ঢাকা ছিল। যোগীন্দ্রনাথ এসে যবনিকা সরিয়ে দিলেন যাদুকরের মতো: আর এক মুহূর্তে রামধনু রঙে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বাংলা দেশের ঘরে ঘরে যেন মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠল, ছোটর দল দুলে দুলে পড়তে লাগলো—

ঘুমিয়ে যখন থাকি—
মায়ের চুমা ফুটিয়ে তোলে আমার দুটি আঁখি
হাসলে আবার চুমা
থাকলে জেগে চুমা দিয়ে বলেন 'খুকু ঘুমা'।

ছেলেমেয়েরা নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেল। ঠাকুমা—পিসিমার দল বাটি ভরা পরমান্ন নিয়ে সেধে গেল। কিন্তু তাদের হাতে তখন নতুন স্বাদের মিষ্টি! তারা সুন্দর সুর করে বলতে লাগলো—

আমরা তিনটি বোন
আমি মেজো, দিদি বড় ছোটটি নোটন!
আমার একটি ভেড়া আছে
হরিণ থাকে দিদির কাছে
বাছুর নিয়ে খেলে সুখে আমাদের নোটন
আমরা তিনটি বোন।

ছোটদের দল বনের পাখিকে ডেকে বলে—

বনের পাখি, ডাকাডাকি করছ কেন বনে?
সোনার খাঁচায় এসো তুমি রাখব সযতনে।
পাকা পাকা মিষ্টি ফল তোমায় দেবো খেতে
সন্ধ্যাবেলা ঘরে তুলে বিছানা দেবো পেতে!
কচি কচি কোমল গায়ে বুলিয়ে দেবো হাত,
আদর করে সাথে সাথে রাখব দিন রাত॥

আবার বড়র দলেও হাসির হুল্লোড় ওঠে—যখন ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে সুন্দর আবৃত্তি করে 'পাঠশালা'—

চ্যাপ্টা নাকে চশমা আঁটা গুরুমহাশয়;
কানে কলম হাতে ছড়ি দেখেই লাগে ভয়!
কানটি মলা খেয়ে ম'ল গোয়ালাদের গুপী
টেবির পড়া হয় নি বলে মাথায় গাধার টুপি!
আর সকলে ভয়ে ভয়ে মিটির মিটির চায়
কার কপালে কি যে আছে বলা নাহি যায়।

এই সদা আনন্দময় মানুষটির কাছ থেকে নিজেদের মনের কথা জোগাড় করে ছোটরা একে অন্যকে জিজ্ঞেস করে—

কোথা থেকে আসছ তুমি, ছোট্ট মানুষটি ?
গল্প যদি বলতে পার, বল ত একটি।

পথিক বালকটি উত্তর দিচ্ছে—

'আসছি আমি সুদূর হতে তীব্র রবির করে
মনের সুখে কাফ্রি যেথা ঘরকন্না করে
কষ্টে অতি খনির সোনা তুলছে নরনারী
মরুর পরে থপ্ থপ্ থপ্ যাচ্ছে উটের সারি।'

আবার ছেলের দল কেউ সাজছে বেড়াল, কেউ সাজছে ইঁদুর। বিড়াল গুড়ি মেরে এসে জিজ্ঞেস করছে।—

'ইঁদুর ভায়া ইঁদুর ভায়া ঘরে আছ হে ?

তার উত্তরে ইঁদুর মুচকি হেসে উত্তর দিচ্ছে—
'রাত্তিরেতে ডাকাডাকি করছ তুমি কে ?'

বিড়াল বলছে—
'ভালোবাসার বন্ধু আমি, তোমার আপন জন
প্রাণ টানে শুধু আমার হেথায় আগমন।'

ইঁদুর জবাব দিচ্ছে—
'ও হো হো বন্ধু বটে, সামনে আছিস কে ?
ঘাড় ভাঙতে যম এসেছে দরজা এঁটে দে !'

সেই যে বিপিন—তার যে দুষ্টুমি—সেটাই বা মন্দ কি ?, ছড়াটা আমাদের ছেলেবেলায় সব সময় মুখে মুখে ফিরত—

সোমবারে মাথা ধরা, মঙ্গলে পেট ব্যথা করা
বুধবারে চোখ জ্বালা, বেস্পতিতে জ্বরে পালা—
শুক্কুর বারে গা কেমন, শনিবারে পলায়ন !
সেই দিনটি রবিবার পড়তে যেতে হয় না তার।"

এই জাতীয় ছেলে প্রত্যেক পাঠশালা আর ইস্কুলে থাকে। তাদের নিয়ে মজাটা কি কম জমত ? অবশ্য তার সঙ্গে সঙ্গে ভালো ছেলে, আর মন্দ ছেলে ছড়াও কম উপভোগ্য ছিল না—

'ভালো ছেলে পাঠশালে সোজা চলে যায়
দাঁড়ায়ে না কথা কয় পথে না খেলায়।
মন্দ ছেলে পথে দেরি করে খেলা নিয়ে
পুকুরে ভাসায় জুতো পাল তুলে দিয়ে।'

তারপর সেই ছোট পাখিকে জিজ্ঞেস করা—

ছোট পাখি ছোট পাখি বল গো আমায়
এত মিষ্টি গান তুমি শিখিলে কোথায় ?

তার জবাবে ছোট পাখি বলছে—

যাহার কৃপাতে ভাই লভিয়াছি প্রাণ
ক্ষুদ্র এই কণ্ঠে তিনি দিয়াছেন গান ॥

সেই পালোয়ানের মজাদার ব্যাপারটাও কিন্তু কোনো মনে ভোলবার নয়—

'ফটিক চাঁদ বাবু শীতে খান সাবু গরমেতে ঘোল
বছর ভরে রোজ দু'বেলা গাঁদালের ঝোল
এই বড় জোয়ান বেজায় পালোয়ান কাঠের মত শক্ত
ঘুসির চোটে ঠিক্‌রে ওঠে ছারপোকার রক্ত।'

তারপর সেই কাকাতুয়ার কথাটা—সারা জীবন ধরে মনে রাখতে হবে—

কাকাতুয়া, কাকাতুয়া, আমার যাদুমনি
সোনার ঘড়ি কি বলিছে, বল দেখি শুনি ?
বলিছে সোনার ঘড়ি টিক্-টিক্-টিক্
যা কিছু করিতে আছে, করে ফেল ঠিক।

আর রয়েছে সেই মজার মুল্লুক। সেখানে একবার ঢুকতে পারলে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবে—

এক যে ছিল মজার দেশ সব রকমে ভালো
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ দিনে চাঁদের আলো।
আকাশ সেথা সবুজ বরণ গাছের পাতা নীল
ডাঙায় চরে রুই-কাত্‌লা জলের মাঝে চিল্ !

তারপর সেই সখের সেনার দল ব্যাণ্ড বাজিয়ে এগিয়ে আসছে আর বলছে—

আমরা সখের সেনা, চল সবে ভাই
স্বদেশের তরে আজ রণস্থলে যাই
মোরা রণস্থলে যাই॥

এই আনন্দের মণি-খনি যিনি দু'হাতে ছোটদের বিলিয়ে দিয়ে নিজে দেউলে হয়ে গিয়েছিলেন,—সেই যোগীন সরকার মশাই মানুষটি কেমন ছিলেন—জানতে ইচ্ছে হয় নাকি?

ছোটদের সত্যিকারের বন্ধু ছিলেন তিনি। তাঁকে মাঝখানে বসিয়ে শিশুদের নিত্য-মহোৎসব। এই বুড়ো মানুষটি ছিলেন—ছোটবড়ো সবাইকার বন্ধু। কথায় কথায় ছড়া, মুখে মুখে—বাঁধা আর মজাদার গল্প। কক্ষনো কাউকে বকতে জানতেন না তিনি। ভালোবাসা দিয়ে সকলকে আপন করে নিয়েছিলেন।

গল্পই কি তিনি আমাদের কম শুনিয়েছেন? সেই 'ছোট চোর আর বড় চোরের গল্প' পড়তে বসলে হাস্‌তে হাস্‌তে পেটে খিল ধরে যায়।

তারপর তাঁর 'আষাঢ়ে স্বপ্নে'র তুলনা নেই। যেমন গল্প, তেমনি ছড়া। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায়। 'পান্তা বুড়ী' গল্পটাই বা কী মজার! একটা চোর রোজ বুড়ীর পান্তা চুরি করে খেয়ে যেত। তারপর শিং মাছ, বেল, ছুঁচ, ছুরি, কুমীর সবাইকার সাহায্য নিয়ে কি ভাবে চোর ধরা হল—সেটা ভারি রগড়ের ব্যাপার। আর রামধনের গল্প?

বুদ্ধিমান রামধন, সাবধানে থেকো—
নাকে মুখে ছিপি এঁটে বুদ্ধি ধরে রেখো।

এছাড়া তিনি 'বনে জঙ্গলে' আর 'পশু-পক্ষী'র গল্প শুনিয়েছেন অজস্র। তারপর 'ছোটদের রামায়ণ' আর 'ছোটদের মহাভারত' মধুর মতো মিষ্টি ভাষায় লেখা। একটি খুব ভালো কিশোর উপন্যাস লিখেছেন তিনি। তার নাম 'জয় পরাজয়'। সেই আমলে লেখা, কিন্তু কত জোরালো কাহিনী।

সব চাইতে উল্লেখ করবার মতো কথা হচ্ছে এই যে, যোগীন সরকার সারাজীবন ধরে যা ছোটদের জন্যে পরিবেশন করে গিয়েছেন—সেগুলি এত বছর পরেও পুরোনো হয় নি। তাঁর লেখা বইগুলির নামও শুনতে মিঠে। ছড়া ও ছবি, ছবির বই, নতুন ছবি, হাসিখুশী, আষাঢ়ে গল্প, খেলার সাথী, হিজিবিজি, ছড়া ও পড়া, মোহনলাল, মজার গল্প, রাঙা ছবি, হাসি ও খেলা, হাসির গল্প, হাসিরাশি, খুকুমণির ছড়া, খেলার গান, ছবি ও গল্প, ছোটদের চিড়িয়াখানা, জানোয়ারের কাণ্ড, বনে জঙ্গলে, বন্দেমাতরম, ছোটদের রামায়ণ, ছোটদের মহাভারত, পশুপক্ষী আরো অজস্র সংকলন। আমরা বুড়োর দল যেন যোগীন সরকারের এই সোনালি ফসল ছোটদের মধ্যে হরির লুটের মতো বিলিয়ে দিতে পারি।

এই যে রসের মণিখনি মানুষটি যিনি সারা জীবন ফুল ফুটিয়ে আর ফল ধরিয়ে গেছেন, আসলে বাস্তব জীবনে তিনি কেমন ছিলেন, একথা জানতে মানুষের কৌতুহলের অন্ত নেই।

২৪ পরগনার অন্তর্গত জয়নগর গ্রামে তাঁর দাদামশায়ের ঘরে বিগত ১২৭৩ সালের ১২ই কার্তিক রবিবার রাত্রি সাড়ে বারোটার সময় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কোষ্টিতে তাঁর সিংহ লগ্নে রাজযোগে জন্ম বলে লেখা আছে। যোগীন্দ্রনাথের পিতা স্বর্গীয় নন্দলাল দেব সরকার ধনী না হলেও গ্রামের মধ্যে সর্বজনমান্য মানুষ ছিলেন। যোগীন্দ্রনাথ মাতা থাকমণির অষ্টম গর্ভের সন্তান ছিলেন। সেই জন্যে প্রাচীন সংস্কার অনুসারে তিনি ভাবীকালের একজন মহৎ মানুষ হবেন—এই বিশ্বাসে ও আশায় বহু দিন পর্যন্ত তাঁকে নিরামিষ আহার্য দেওয়া হত।

ছেলেবেলায় তিনি নিজ গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে

তিনি কলকাতার সিটি কলেজে যোগদান করেন। তিনি ল্যাটিন ভাষা গ্রহণ করেন। সেই সময় এই ভাষা খুব কম লোকেই পড়ত। মনে হয় সেই জন্যে তিনি এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। এই জন্যে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে তাঁকে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ক্রমাগত দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাঁকে লেখাপড়া শিখতে হয়েছিল। অবশেষে জীবনধারণের জন্যেও একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রয়োজনে সেই সিটি কলেজিয়েট স্কুলেই তাঁকে শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করতে হয়েছিল। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সারা বিদ্যালয়ে ছোট-বড় সবাইকার প্রীতির পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। সেই সময়ের প্রধান-শিক্ষক কৃষ্ণকুমার মিত্র যোগীন্দ্রনাথকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখতেন।

এই সময় থেকেই তিনি মনের আনন্দে ছোটদের জন্য লিখতে শুরু করেন এবং 'সিটি বুক সোসাইটির' প্রবর্তন করে সেই শিশু-পাঠ্য পুস্তকগুলি প্রকাশে আত্মনিয়োগ করেন। সেই সময়ে বাংলা দেশে ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্যে ভালো ভালো শিক্ষামূলক ও আনন্দদায়ক বই এক রকম ছিল না বললেই চলে। যোগীন্দ্রনাথ ছোটদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলবার মহান ব্রত গ্রহণ করলেন।

আমাদের ভাগ্য ভালো যে, একই সময় রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ ক'রে যোগীন্দ্রনাথ, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিশু-সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। তারা সারা জীবন ধরে যে সোনার ফসল ফলিয়ে ছিলেন—শুধু বাংলা দেশ নয়, সারা ভারতবর্ষ তাতে উপকৃত হয়েছিল। অবশ্য বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচনার বিষয় শুধু যোগীন্দ্রনাথ।

যোগীন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবন বড় মধুময় ছিল। সবাইকে কাছে ডেকে তিনি আনন্দের আসর বসাতেন। মুখে ছড়া আর ধাঁধাঁ রচনা করতেন। গল্পে গানে সকলকে মাতিয়ে তুলতেন। সারা জীবনে তিনি কাউকে কোনো শক্ত কথা বলতে পারতেন না। চিরকালের এক সদানন্দ পুরুষ ছিলেন—যোগীন্দ্রনাথ।

তাঁর বাড়ির ছেলেমেয়েরা তাঁকে অন্তরঙ্গ বন্ধু ও খেলার সাথীরূপে পেয়েছিল। তিনি যখন কঠিন অসুখে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন—তখন বাড়ির কেউ গোলমাল করার জন্যে ছোটদের বকলে তিনি মনে মনে ভারি ব্যথা পেতেন। বলতেন, ওদের তোমরা কেউ বোকো না। ওদের ছাড়া আমি থাকতে পারি না। ওদের গোলমাল আমার ভালো লাগে। আবার বাড়ির ছেলে-মেয়েরা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ত তিনি নীরবে দীর্ঘকাল ধরে জেগে তাদের সেবা করতেন। 'সিটি বুক সোসাইটি'র কর্মচারীগণ ও বাড়ির ভৃত্যদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল একেবারে বড় ভাইয়ের মতো। তিনি নিজে ছেলেবেলায় গরীব ছিলেন বলে—গরীবের ব্যথা বুঝতে পারতেন এবং কাউকে কিছু না জানিয়ে কত দুঃস্থকে সাহায্য করতেন।

কলকাতা তাঁর কর্মস্থল ও ব্যবসা স্থল হলেও তিনি নিরিবিলি পছন্দ করতেন। এই জন্যে গিরিডি অঞ্চলে বহু জমি নিয়ে বাড়ি তৈরি করেছিলেন, পুকুর কাটিয়ে ছিলেন, বিরাট বাগান করে এক আনন্দ পুরীর সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি নিজে সেই বাগানে কাজ করতে ভালোবাসতেন। তারপর যখন ফুল ফুটত কিম্বা ফল ধরত—সবাইকে বিলিয়ে দিয়ে আনন্দলাভ করতেন। পাঁচ থেকে পঁচাত্তর বয়েসের মানুষের সঙ্গে তাঁর ভাব ছিল। স্ত্রী-শিক্ষার দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। গিরিডির উচ্চ-ইংরাজি বালিকা বিদ্যালয় প্রধানতঃ তাঁর যত্ন আর চেষ্টাতেই সেকালে গড়ে উঠেছিল। ১৯২৩ সালে তাঁর শরীরে পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন তিনি মুখে মুখে ছড়া কবিতা বলে যেতেন আর বাড়ির লোকেরা তাই লিখে নিত। ১৩৪৪ সনের ১২ই আষাঢ় নরদেহ ত্যাগ করে তিনি আনন্দ লোকে চলে যান।

যোগীন্দ্রনাথের জীবনের কৌতুকজনক ঘটনা এবং কি প্রণালীতে তিনি শিশু-সাহিত্য রচনা করতেন সেই সব কথা

শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। আমরা জানি, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার তাঁর ঠাকুরমার ঝুলি ও ঠাকুরদাদার ঝুলির ছবিগুলি নিজে হাতে এঁকেছেন। একথা তিনি এক সময় গল্পচ্ছলে আমায় বলেছিলেন। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীও তাঁর নিজের রচনার সঙ্গে নিজেই ছবি আঁকতে ভালোবাসতেন প্রথম যুগের 'সন্দেশে' উপেন্দ্রকিশোরের হাতে আঁকা ছবি প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে সুকুমার রায় বাবার এই গুণটি নিজে আয়ত্ত করেছিলেন। 'আবোল-তাবোল' প্রভৃতি মজাদার বইগুলির ছবি প্রথমে 'সন্দেশে' তারপর পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হয়। অবনীন্দ্রনাথ নিজে একজন দিকপাল শিল্পী হলেও নিজের রচনার ছবি তিনি খুব কমই এঁকেছেন। পরবর্তীকালে বহু শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের রচনাকে সচিত্র করে তোলেন। যোগীন্দ্রনাথ যদিও নিজের হাতে ছবি আঁকতেন না, তবু এই কথা জানা গেছে যে, তাঁরই নির্দেশে বিভিন্ন শিল্পীরা তাঁর মন ভোলানো ছড়া ও গল্পগুলি চিত্রিত করেন। কাজেই চিত্র পরিকল্পনার কৃতিত্ব তাঁর নিজের।

যোগীন্দ্রনাথের জীবনের ছোট ছোট ঘটনা থেকে তাঁর সহজ সরল উদার হৃদয়টির সন্ধান পাওয়া যায়।

তিনি যেমন ছোটদের ভালোবাসতেন, তেমনি প্রকৃতির মাঝখানে বাস করতে চাইতেন। তাই কলকাতার কোলাহল থেকে দূরে গিরিডিতে 'গোলকুঠি' নির্মাণ করে সেইখানেই শেষ জীবনের অধিকাংশ সময় থাকতে চাইতেন। প্রচুর ছড়া গান গল্প জীবজন্তুর কাহিনী রচনা করে তিনি যেমন দেশের ছেলেমেয়েদের হাতে দুহাতে বিলিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি নিজের বাড়ির বাগানে ফুল ফুটিয়ে আর ফল ধরিয়ে শুধু পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যেই বিতরণ করতেন না, নিজের বাগানের রসালো আম আর অন্যান্য ফল দূর দূর অঞ্চলে প্যাক করে পাঠিয়ে প্রিয়জনদের মধ্যে আনন্দ বিতরণ করতেন।

ছেলেবেলায় তিনি খুব দুরন্ত ছিলেন। বন্ধুবান্ধবদের জুটিয়ে নিয়ে এর বাড়ির আম, ওর বাড়ির কাঁঠাল না বলে গ্রহণ করে দিব্যি বাল্য ভোজ লাগাতেন। এটা যে একটা অপরাধের কাজ দিল্‌দরিয়া যোগীন্দ্রনাথের তা আদৌ মনে হত না। তিনি নিজে যেমন খেতে পারতেন, তেমনি অপরকে খাইয়ে আনন্দ পেতেন।

দুঃখকে সাথী করে জীবনে বড় হয়েছিলেন বলে দুঃখীর দুঃখ দূর করবার জন্য সব সময় উৎসুক থাকতেন যোগীন্দ্রনাথ। কারো কিছু উপকার করতে পারলে মনে প্রকৃত আনন্দ লাভ করতেন। যোগীন্দ্রনাথের অনেক গোপন দান ছিল। ছেলেরা পরীক্ষার ফীর জন্যে তাঁর দ্বারস্থ হলে আর ফিরে যেতে হত না।

মানুষের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখাকে তিনি খুব মূল্যবান বলে মনে করতেন। এজন্য নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও তিনি লোকের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করতেন। গিরিডিতে যে পূর্ণিমা সম্মেলন হত—তাঁর প্রবর্তন করেছিলেন যোগীন্দ্রনাথ। পরবর্তীকালে বহু সাহিত্যিক এই পূর্ণিমা সম্মেলনে যোগদান করেছেন। দৈনন্দিন জীবনে তিনি অতি রসিক মানুষ ছিলেন। নাতি নাতনিদের নিয়ে বসে মুখে মুখে ছড়া ধাঁধা রচনা করা গল্প বলা জীবজন্তুর কাহিনী শোনানো তাঁর ছিল প্রকৃত আনন্দ।

যোগীন্দ্রনাথ একবার তাঁর মেয়ের জন্য এক গানের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। সেই মেয়ে যখন পরে আর এক সংসারের গিন্নী হয়, মেয়ের মা হয়—তখন যোগীন্দ্রনাথ তাঁর নাতনিদের কাছে একটি মজাদার গল্প বলেছিলেন। সেই যে গানের শিক্ষক তিনি বহুকাল ধরে রবীন্দ্রনাথের একটি গান 'বাদল ধারা হল সারা—বাজে বিদায় সুর' অনেক দিন ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শেখাতেন নতুন গান শেখাবার নামও করতেন না, এই ঘটনাটিকে নিয়ে যোগীন্দ্রনাথ কৌতুক করতেন। নিজের দুই হাত পিছনে রেখে সুর করে 'বাদল ধারা হল সারা' পর্যন্ত গেয়েই হঠাৎ

বাম হাতটি পেছন থেকে থেকে সামনে এনে কুচকাওয়াজের ভঙ্গিতে 'অ্যাটেন্সন' হয়ে দাঁড়াতেন—তারপর বলতেন—'গানের জন্য দাও পাঁচ টাকা।'

যোগীন্দ্রনাথের বলবার ধরণ দেখে তার নাতি নাতনির দল হেসে গড়িয়ে পড়ত।

সকল সময় নানাভাবে মানুষের মনে নির্মল আনন্দ বিতরণ করাই তাঁর ব্রত ছিল।

একদা রবীন্দ্রনাথ যোগীন্দ্রনাথের লেখা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন সেই কয়েকটি মূল্যবান কথার উল্লেখ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি—"ছেলেদের যেমন চাই দুধভাত, তেমনি চাই গল্প। যে মা তাদের খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছে, এতকাল তারাই তাদের মিষ্টি গলায় গল্প জুগিয়ে এসেছে।

ছেলেদের সেই সত্যযুগ আজ এসে ঠেকেছে কলিযুগে। আজকের দিনের মা মাসিরা গেছেন গল্প ভুলে কিন্তু ছেলেরা তাদের ফরমাস ভোলে নি। ছেলেরা আজকে বলছে, গল্প বলো—। কিন্তু তাদের ঘরের মধ্যে গল্প নেই। এই গল্পের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যাঁরা কোমর বেঁধেছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য যোগীন্দ্রনাথ। তিনি নিজের সম্বল থেকেও কিছু দিচ্ছেন, ভিক্ষে করেও কিছু সংগ্রহ করচেন। ছেলেরা ত' আশীর্বাদ করতে জানে না, সেই আশীর্বাদ করবার ভার নিলেন তাদের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ।"

(সাহিত্যতীর্থ, বার্ষিকী, ১৩৭৩)

—:০:—

বিষ্ণুশর্মার চিঠি

(শিশু-সাহিত্যের অনন্য-পুরুষ যোগীন্দ্রনাথ সরকারের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন)

হে যোগীন্দ্র!
তোমারে প্রণাম
আজি করিলাম
জনমের শত বর্ষে।
ছোটদের প্রাণ
করে গেছ দান
তোমার লেখনী-স্পর্শে।

ভরে দেছ' সবে
খুশির বিভবে
দূর করি অপকর্ষে।
তব দান লভি,
পূজি তব ছবি
আজি উৎসবে হর্ষে॥

প্রণতঃ বিষ্ণুশর্মা

শিশুসাহিত্যের যাদুকর

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

'হাসিখুসি' বইয়ের লেখক যোগীন্দ্রনাথ সরকারের জন্মের শত বর্ষ পূর্ণ হল। এই উপলক্ষে তাঁকে স্মরণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হচ্ছে।

যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন শিশু সাহিত্যের একজন যাদুকর। এ দেশের শিশুদের জন্যে তিনি অনেক ছড়াছবি ও কবিতার বই লিখে গেছেন। এর মধ্যে একখানি বইই অমর করে রাখবে তাঁকে। সেটা হল 'হাসিখুসি'। যেমন নাম তেমন কাম। এই বই কখনো পুরনো হবে না।

ওঁর এই শতবার্ষিকীর সঙ্গে তা, রেখে 'হাসিখুসি' বইখানারও নিরান্নব্বইটি সংস্করণ হয়েছে।

আজকাল এই ধরণের কত বইই তো বাজারে দেখা যায়। কিন্তু 'হাসিখুসি'র শিল্পরূপ আলাদা, মামুলি নয়। একটা বিশেষত্ব আছে। ছড়াগুলো এলোমেলো জোড়া-তালি দিয়ে রচিত নয়। বাস্তব জীবনের মালমসলার সাহায্যে এবং শিশু মনের কল্পনা মিশিয়ে অপূর্ব এক সৃষ্টি। বন্যার জলের মত সারা বাংলা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এই হাসিখুসি বই। হাসি ফুটিয়েছে ছোট ছেলে-মেয়েদের মুখে।

অগেকার দিনে অ আ ক খ প্রভৃতি অক্ষরগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে গেলেই দাবী মিটত। তাতে না ছিল রস, না আনন্দ। সর্বপ্রথম যোগীন্দ্রনাথই এবিষয়ে রসের যোগান দিলেন, আনন্দের হাট বসালেন ঘরে ঘরে। শিশুকালেই যাতে করে লেখাপড়ার দিকে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের একটা আকর্ষণ জন্মে, আনন্দের মধ্যে দিয়ে ছোটদের মন গড়ে ওঠে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি রচনা করলেন সুন্দর ও সার্থক শিশু সাহিত্য। এবং এই 'হাসিখুসি' বই দিয়েই শুরু হল ঘরে ঘরে শিশুদের হাতে খড়ি।

'অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে' কিংবা টিয়াপাখির ঠোঁটটি লাল, ঠাকুরদাদার শুকনো গাল' ইত্যাদি সকলেরই মুখস্থ। কেবল অ আ ক খর ছড়াই নয়। 'হারাধনের দশটি ছেলে ঘোরে পাড়াময়' ইত্যাদির মারফতে অঙ্কের গোড়াকার ব্যাপারটা ছোটদের শেখানোয় পদ্ধতিও চমৎকার।

ছোটদের জন্যে সাহিত্য রচনা করে এ-দেশে আরো কয়েকজন খুব বিখ্যাত হয়েছেন; যেমন দক্ষিনারঞ্জন মিত্রমজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায় প্রভৃতি। আর রবীন্দ্রনাথ শিশুদের জন্যে যে অমূল্য সম্পদ রেখে গেছেন তা তারা চিরকাল মাথায় করে রাখবে। কিন্তু ওঁদের রচিত শিশু সাহিত্যটা এক ধাপ উপরের। যোগীন্দ্রনাথ শুরু করেছেন একেবারে নীচের ধাপ থেকে, বর্ণপরিচয় থেকে।

'ছোটদের পাতা, দৈনিক বসুমতী
২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩'

—:০:—

বাংলা শিশু-সাহিত্যে যোগীন্দ্রনাথ সরকার

বুদ্ধদেব বসু

আমরা ছোটো ছিলুম বাংলা শিশু-সাহিত্যের সোনালি যুগে। দুই অর্থেই সোনালি যুগ। প্রথমত, সে-ই আরম্ভ, সূত্রপাত—বলতে গেলে শিশুসাহিত্যই শিশু তখনো; আমরা এখন যারা সসম্মানে কিংবা যে-কোনো প্রকারে মধ্য বয়সে অবস্থান করছি, বাংলা ভাষার লক্ষণযুক্ত শিশুসাহিত্য আমাদেরই ঠিক সমসাময়িক। দ্বিতীয়তঃ, গুণের বিচারেও সোনালি; শুদ্ধ, সরল, সুন্দর, স্বচ্ছন্দ—এই অর্থেও সোনালি। এই সমাবেশ সুলভ নয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথমে যেটা করা হয়, সেটাই সব সময়ে ভালো হয় না। অনেক সময়েই দেখা যায় যে, পথিকৃৎগণের ক্রিয়াকলাপ উত্তরকালের কাজে লাগে, আনন্দের আয়োজনে নয়, ইতিহাসের সূত্রসন্ধানে। বাংলা ভাষার শিশুসাহিত্য এ-বিষয়ে উল্লেখ্য ব্যতিক্রম। সেই প্রথম অধ্যায়ে প্রাচুর্য্য ছিলো না, মন-ভোলানো, অন্ততপক্ষে চোখ-ভোলানো রকমারি ছিলো না এত, কিন্তু যেটুকু ছিলো সেটুকু একেবারেই খাঁটি। বই ছিলো কম; কিন্তু যে-ক'টি ছিলো, তাদের অধিকাংশেরই আজ পর্যন্ত জুড়ি মেলেনি, অধিকাংশই আজকের দিনে ক্লাসিক ব'লে গণ্য হয়েছে। তখনকার শিশু-চিত্তের যাঁরা প্রতিপালক, তাঁরাই যে বাল্যবঙ্গের নিরন্তরভোগ্য মধুচক্র বানিয়েছেন, এই কথাটা আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি। সংখ্যায় তাঁরা মাত্রই কয়েকজন। (প্রাতঃকালীন, প্রাতঃস্মরণীয় যোগীন্দ্রনাথ সরকার, নানা-রঙিন রূপকথার দক্ষিণারঞ্জন, আর সেই বিস্ময়কর রায়চৌধুরী পরিবার)।

* * * * *

এমন মত পোষণ করা সম্ভব যে শিশুসাহিত্য স্বতন্ত্র কোনো পদার্থ নয়, কেননা তা সত্যিকার সাহিত্য হ'লে বড়োরাও তাতে আনন্দ পান, আর সাবালক—এমন কি আবহমান সাহিত্যের একটি অনতিক্ষুদ্র বিচিত্র অংশের ছোটোরাও উত্তরাধিকারী। যে-সব গ্রন্থ চিরকালের আনন্দভাণ্ডার, ছোটদের প্রথম দাবি সেখানেই—সেই মহাভারত, রামায়ণ, বাইবেল, আরোব্যাপন্যাস, বিশ্বের পুরাণ, বিশ্বের রূপকথা আর সেইসঙ্গে আধুনিক কালের ভাস্বর চিত্রাবলি—ডন কুইক্সট্, রবিনসন ক্রুসো, গালিভার। শিশু-সাহিত্যের বড়ো একটি অংশ জুড়ে এরাই আছে; এই অমর সাহিত্যের প্রবেশিকাপাঠ শিশুদের আশুকৃত্য। পক্ষান্তরে, মৌলিক শিশুগ্রন্থ তখনই উৎকৃষ্ট হয়, যখন তাতে সর্বজনীনতার স্বাদ থাকে। অতএব, অন্ততঃ তর্কস্থলে, সাহিত্যে এই 'ছোটোবড়ো'র ভেদজ্ঞানকে অস্বীকার করা সম্ভব।

কিন্তু এই মত একটা জায়গায় টেঁকে না। যারা আক্ষরিক অর্থে শিশু, নেহাৎ বাচ্চা, এইমাত্র পড়তে শিখলো কিংবা এবারে পড়তে শিখবে, তাদের জন্যও বই চাই; আর সে-সব বইয়ে সাহিত্যকলার সাধারণ লক্ষণ আমরা খুঁজবো না, আলাদা ক'রেই তাদের দেখতে হবে। কত ভালো ক'রে কাজ চলবে, কত সহজে ক-খ শিখবে ছেলেরা, তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাস্য শুধু এইটুকু; তার বেশি চাহিদাই নেই। কিন্তু এখানেও, আশ্চর্য্যের বিষয়, বাঙালির মন সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়েছে; বাংলার মাটিতে এমন মানুষ একজন অন্তত জন্মেছেন, যিনি কেঁদে-কেঁদে পড়তে শিখে হেসে-হেসে বই পড়ে। অবশ্য অশ্রুহীন বর্ণপরিচয় সম্ভব নয়; ঠিক অক্ষর চিনতে হ'লে

—আজ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরই আমাদের অবলম্বন; কিন্তু তার পরে—এবং তার আগেও—মাতৃভাষার আনন্দরূপের পরিচয় নিয়ে প্রস্তুত আছেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার। মুখে বোল ফোটার সঙ্গে-সঙ্গে বাঙালি ছেলে তাঁরই ছড়া আওড়ায়—সেই ধাবমান অজগর আর লোভনীয় আম্রফলের চিরনূতন নান্দীপাঠ—মায়ের পরেই তাঁর মুখে-মুখে কথা শেখে শিশুরা। যোগীন্দ্রনাথ, তাঁর হাসিখুসির দানসত্র নিয়ে, তাঁর উৎসর্গিত শুভ্র জীবনের রাশি-রাশি উপচার নিয়ে, আজকের দিনে একজন লেখকমাত্র নেই আর, হ'য়ে উঠেছেন বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান, শিশুদের বিদ্যালয়। ঠিক তাঁর পাশে নাম করতে পারি, এমন কোনো বিদেশী লেখকের সন্ধান আমি আজও পাইনি; 'হাসিখুশি'র সঙ্গে তুলনীয় কোনো ইংরেজি পুস্তক এখনো আমাকে আবিষ্কার করতে হবে। অনুরূপ গ্রন্থে ইংরেজি ভাষা কত সমৃদ্ধ সে-কথা আমি ভুলে যাচ্ছি না; সেই সাহিত্যের বৈচিত্র্য, উদ্ভাবন কৌশল আর দক্ষতাকে শ্রদ্ধাও করি;—কিন্তু শেষ পর্যন্ত দক্ষতাটাই অত্যাধিক ব'লে মনে হয়, মনে হয় সে-সব বই মাপজোক নিয়ে নিখুঁতভাবে কলে-তৈরি জিনিস কিংবা লেখক-চিত্রক মুদ্রকের সমবায়শ্রমের যোগফল। এইখানে যোগীন্দ্রনাথের জিৎ। তিনি প্ল্যান ক'রে বই লেখেননি, প্রাণ থেকে লিখেছেন, তাঁর লেখা ঘনিষ্ঠভাবে তাঁরই, তাঁর হৃদয়ের স্পন্দনটি সেখানে শুনতে পাই—শিশুর জন্য অনবরত খিল-খুলে-রাখা দরাজ তাঁর হৃদয়। পুস্তক প'ড়ে শিশু-মনস্তত্ত্ব জানতে হয়নি তাঁকে, শিক্ষাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হ'তে হয়নি, বিভিন্ন বয়সের শিশুর মনের তারতম্য ঠিক কতটা, কিংবা সে-মনের উপর কোন রঙের কত মাত্রার প্রভাব কী-রকম, এ-সব বিষয়ের বৈজ্ঞানিক তথ্যে কিছুই তাঁর প্রয়োজন ছিলো না। শিশুর মন সহজেই তিনি বুঝেছেন—তাঁর নাড়ির টান ছিলো ওদিকে, আর সেই সঙ্গে রুচি ছিলো নির্ভুল, রচনাশক্তি যথাযথ—যেটুকু হ'লে সংগত হয়, সেইটুকুই, তার কমও না, বেশিও না। তাই তাঁর প্রতিটি বই ঠিক তা-ই অতিতরুণ পাঠমালার যা হওয়া উচিত—আগাগোড়া শৈশবের রসে সবুজ, একেবারে কিশলয়ের মতো কাঁচা—লেখায় যেটুকু কাঁচা ভাব আছে, অপটুতাও আছে, তাও তার স্বাদের একটি উপকরণ, ওর চেয়ে 'পাকা হাত' হ'লে সে-হাতে অমন তার উঠতো না। অপটুতা মানে অক্ষমতা নয়—এমন নয় যে কিছু-একটা ইচ্ছে ক'রে তিনি পেরে ওঠেননি—তাকে বলতে পারি ঘরোয়া ভাব, সভাযোগ্য সৌষ্ঠবের বদলে গৃহকোণের অন্তরঙ্গতা যেন, আটপৌরে হবার সুখ, দুপুরবেলা মাদুর পেতে শুয়ে মা যখন ছেলেকে ডাকেন, সেই অবসরের সতর্কতাহীন আরাম। যোগীন্দ্রনাথের রচনা একান্তভাবে অন্তঃপুরের;—স্কুলের নয়, পাঁচজনকে ডেকে শোনাবার মতোও না, যেন মা-ছেলের বিশ্রান্তালাপের ভাষা—ঠিক তেমনি স্নিগ্ধকোমল সহাস্য তাঁর গলার আওয়াজ। ঐ আওয়াজটি ফরমাশ দিয়ে পাওয়া যায় না ব'লেই যোগীন্দ্রনাথের জুড়ি হ'লো না; তাই এই বিভাগে, পথিকৃৎ হ'য়েও এখনো তিনি সর্বোত্তম। 'হাসিখুশি'র প্রতিদ্বন্দ্বিতার উচ্চাশা নিয়ে অনেক বই উঠলো পড়লো; তার সর্বাধুনিক প্রকরণটি বর্ণবিলাসে জাজ্বল্যমান। এই নব্য প্রকরণ বিলেতি কিংবা মার্কিনি; প্রসাধনসিদ্ধ, নয়নরঞ্জন, কিন্তু এ-সব বই ছবিরই বই, অন্তত ছবিটাই এখানে মুখ্য, আর লেখা নামক গৌণ অংশটি নির্দোষ হ'লেও, দক্ষ হ'লেও, তাতে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না, লেখকের সঙ্গে শিশুর মনের অব্যবহিত সম্বন্ধটা নেই তাতে। আর বইয়ের পাতায় ইন্দ্রধনুকে উজোড় ক'রে দিলেও এই অভাবের পূরণ হয় না।

অন্য দিক থেকেও তফাৎ আছে। পড়া-শেখা পুঁথির সবচেয়ে জরুরি গুণ এই যে তা বস্তু-ঘেঁষা হবে, যাকে বলে কংক্রীট। এইটেই সব বইয়ে পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে ছবিটা শুধু ছবিতেই থাকে, আর সেইজন্য পাঠ-যোগ্যতা ক্ষুণ্ন হয়। যেটা পাঠ্য বই, তাতে ছবিটা থাকা চাই লেখাতেই, রংটা লাগান চাই ক্ষুদ্র এবং খুব সম্ভব অনিচ্ছুক পাঠকের মনটিতেই। সেই সঙ্গে দ্রষ্টব্য ছবি—থাকা ভালো নিশ্চয়ই, কিন্তু সেটা অতিরঞ্জিত হ'লে তাতে উদ্দেশ্যের পরাভব ঘটে। যদি বলি 'লাল ফুল, কালো মেঘ,' সেটা তো নিজেই একটা ছবি হ'লো, মেঘলা

দিনে মাঠের মধ্যে কোথাও একটা লাল ফুল ফুটে আছে এ-রকম একটা দৃশ্যেরও তাতে আভাস থাকে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে টকটকে লাল হুবহু একটি গোলাপফুল বসিয়ে দিলে তাতে চোখের সুখ কল্পনাকে বাধা দেয়। এখানে উদ্দেশ্য হ'লো—চোখ ভোলানো নয়, চোখ ফোটানো, আর দেহের চোখ অত্যাধিক আদর পেলে মনের চোখ কুঁড়ে হ'য়ে পড়ে, কল্পনা সবল হ'তে পারে না। মনে করা যাক 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'—রবীন্দ্রনাথের সেই আদিশ্লোক, তাঁর জীবনের কবিতা পড়ার প্রথম রোমাঞ্চ যাতে পেয়েছিলেন তিনি—সেটি বটতলার ছাপাতে ছিলো ব'লে আনন্দে কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি বরং সেইজন্যই নিবিড় হয়েছে, অন্য কোনো উপকরণ ছিলো না ব'লেই বাণীচিত্র মূল্য পেয়েছে পুরোমাত্রায়। আমি অবশ্য নিশ্ছবিতার অনুমোদন করছি না; আমার বক্তব্য শুধু এই যে লেখার মধ্যেই ছবির যেন ইঙ্গিত থাকে, আর আঁকা ছবি সেই ইঙ্গিতকে ছাপিয়ে উঠে নষ্ট ক'রে যেন না দেয়, কল্পনাকে উসকে দিয়েই থেমে থাকে। (নানা রঙের সমাবেশে চিত্তবিক্ষেপ ঘটে, পাঠক্রিয়া ক্ষুণ্ণ হয়।) এখন যোগীন্দ্রনাথের লক্ষণ এই যে তাঁর লেখার মধ্যেই দৃশ্যতাগুণ ছড়িয়ে আছে তাঁর বর্ণমালার উদাহরণে বিশেষ্য ছাড়া কিছু নেই, আর সেই বস্তুগুলিও অধিকাংশই সজীব, যথাসম্ভব পশুশালা থেকে গৃহীত—যেখানে শিশুর মন তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়—আর নয়তো শিশুজীবনের অন্তরঙ্গ পরিবেশ থেকে বাছাই-করা।

'কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি,
খেঁকশিয়ালী পালায় ছুটি।
গরু-বাছুর দাঁড়িয়ে আছে,
ঘুঘুপাখি ডাকছে গাছে।'

জীবজন্তুর মেলা ব'সে গেছে একেবারে, আবার মাঝে-মাঝে সুন্দর এক-একটি পারম্পর্য ধরা পড়ছে, যেমন ধোপার পরেই নাপিত, কণ্ঠকণ্ডূয়নী ওলের পরই ঔষধ, বা টিয়াপাখির লাল ঠোঁটের সঙ্গে ঠাকুরদাদার শীর্ণ গণ্ডের প্রতিতুলনা। বস্তুত, বর্ণমালার উদাহরণ-সংগ্রহে 'হাসি-খুশি' এমনই অব্যর্থ যে ঐ একটি বিষয়ে বাংলা ভাষার উপাদান সেখানে নিঃশেষিত ব'লে মনে হয়; পরবর্তীরা —আজকের দিন পর্যন্ত—লিখেছেন ওরই ছাঁচে, নতুনত্ব যা-কিছু শুধু চেহারায়। কিন্তু ঐ ছাঁচটা এমন যে ওর মধ্যে একাধিকারের সম্ভাবনা নেই—নেই ব'লেই প্রমাণ হয়েছে; যোগীন্দ্রনাথের একটি লাইনও 'আরো ভালো' করা যায় না; আর দীর্ঘ ঈ-তে ঈগলের বদলে ঈশান, বা ঋ-তে ঋষির বদলে ঋষভ লিখলে রকমারি হয় বটে, কিন্তু ব্যঞ্জনা হয় না, ছবিটা মারা যায়। তাই পরবর্তী কারো লেখাতেই স্বাদ পাওয়া গেল না; 'হাসিখুশি' তার প্রসাদগুণে' প্রত্যক্ষতার গুণে, এমন জরাহীন জীবন্ত হ'য়ে থাকলো যে তার পরে অন্য ছাঁচের দ্বিতীয় একটি মৌলিক গ্রন্থ রচনার জন্য প্রয়োজন হ'লো আস্ত একজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভা (সহজ পাঠ)।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার বিষয়ে আমি আগে একবার লিখেছিলাম, কিন্তু তিনি এমন এক পুরুষ যাঁর বিষয়ে বার-বার বলতে ইচ্ছে করে। আমি বাংলা ভাষা বলতে শিখেছিলাম মায়ের মুখে-মুখে, কিন্তু বাংলা পড়তে আমাকে যোগীন্দ্রনাথই শিখিয়েছিলেন। 'হাসিখুশি,' 'হাসিরাশি,' 'রাঙা ছবি'—এ-সব বই পড়ে, আউড়িয়ে, মুখস্থ রেখে আমি সুদূর শৈশবে যে-আনন্দ পেয়েছি, তার স্মৃতি আজও আমাকে মাঝে-মাঝে আবিষ্ট করে। যাদের জন্য তিনি লিখতেন, সেই শিশুদের মতোই সবুজ ও নির্মল তাঁর রচনা—যেন ঘাসের ডগায় শিশিরের মতো স্নিগ্ধ, অথচ কোন রোদ্দুরের তাপে তা শুকিয়ে যায় না। 'হাসিখুশি' প্রথম প্রকাশের পরে কতো কাল কেটে গেলো—আরো কত অসংখ্য ছেলেমেয়ে জন্মালো ও বড়ো হয়ে উঠলো বাংলা দেশে—কিন্তু আজ পর্যন্ত ঘরে-ঘরে অমর হ'য়ে রইলো সেই 'অজগর' আর 'ইঁদুর' আর 'ঈগল পাখি'। যোগীন্দ্রনাথের তুল্য একজন ছোটোদের লেখক অন্য কোনো ভাষায় আমার জানা নেই; আমাদের অনেক ভাগ্যে তাঁকে আমরা পেয়েছিলাম। আজ তাঁর জন্ম-বার্ষিকীতে আরো অনেকের সঙ্গে আমি তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে প্রণাম জানাই।

যোগীন্দ্র উদ্যান বা হাসি খুশি পার্ক

শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মা

আমাদের সকলের বাল্যকালের বিস্মৃতপ্রায় আনন্দের স্মৃতির মধুচক্র যোগীন্দ্রনাথ সরকারের রচনা। গত পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে বাঙালী বালকবালিকা যোগীন্দ্রনাথের বইগুলি পড়ে আনন্দলাভ করেছে; একেবারে অ আ থেকে জয় পরাজয় গল্পটির মতো থ্রিলার, সব রকম ভোজ্য জুগিয়েছেন তিনি বয়সের দাবি মেনে নিয়ে। জয়পরাজয় গল্পটির উল্লেখ করবার বিশেষ কারণ আছে। গল্পটির রহস্যভেদ করতে দীর্ঘকাল সময় লেগেছিল আমার। সেই যে মোহনলাল বগুলা, বগুলা হাঁক শুনে স্বপ্নের আতঙ্ক থেকে জেগে উঠেছিল, তারপরে তার কি হল জানতে পারিনি, ছবি ও গল্পের শেষ ক'খানা পাতা ছেঁড়া ছিল। এই সেদিন বুড়ো বয়সে যোগীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিক উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ছবি ও গল্পের নূতন বই পেলাম। পাওয়ামাত্র পঞ্চাশ বছর আগেকার সেই মুলতুবি রহস্য-ভেদ করে নিশ্চিন্ত হলাম। এ রকম অভিজ্ঞতা নিশ্চয় হাজার হাজার বালক বালিকার ঘটেছে, কারণ তাদের হাতে বইয়ের শেষ ক'টা পাতা বড় অক্ষত থাকে না। আর যে সব শিশুপাঠ্য বই সম্পূর্ণ অক্ষতদেহ থাকে বুঝতে হবে তাদের গ্রন্থজন্ম ব্যর্থ হয়েছে। ছড়ার বই মানেই ছেঁড়ার বই। আমাদের বাড়িতে কোন শিশুপাঠ্য বই অক্ষত দেহ ছিল না। দুই তিন প্রজন্ম কাল ধরে যোগীন্দ্রনাথ সরকার বাঙালী বালকবালিকাদের আনন্দ জুগিয়ে আসছেন। এ সব বই প্রথম প্রকাশ কালে যে সব পাঠক ছিল বালক আজ তারা ঠাকুর্দা। কিন্তু হলে কি হয় সেই বুড়োদের মনের মধ্যেও লুকিয়ে আছে শিশু ভোলানাথ। সেই শিশু ভোলানাথে আর তার নাতিতে একই বই নিয়ে টানাটানি চলছে। গ্রন্থকারের পক্ষে এর চেয়ে সৌভাগ্যের আর কী হতে পারে? নাতি পড়ছে নূতন আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে, ঠাকুর্দা পড়ছে পুরানো আনন্দ ফিরে পাওয়ার আশায়। সেইজন্যই যোগীন্দ্রনাথের বইগুলোকে বিস্মৃত আনন্দের স্মৃতির মধুচক্র বলেছি। সেই সব ছড়া, গল্প ছবি! আনন্দ নিকেতনের জানালা, দরজা, কুলুঙ্গি! সব তেমনি আছে, আর পড়তে পড়তে মনে হয় আমিও তেমনি আছি। এই পাকা চুল আর নড়া দাঁত, এইগুলোই মায়া। প্রকাশককে ধন্যবাদ যে, ছবিগুলোর বদল করেন নি। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ব্লক ছাপবার অনেক উন্নতি হয়েছে; সেই লোভে পড়ে ব্লকগুলোর বদল করলে আনন্দের বারো আনাই নষ্ট হয়ে যেত। সেই ব্লকগুলো এইসব চিরকেলে ছড়া ও ছবির অচ্ছেদ্য অঙ্গ। চিরকেলে অত্যুক্তি নয়, কেননা, দুটি পাকা বেল, হারাধনের দশটি ছেলে, বুদ্ধিমান, কেনারাম, মজন্তালি সরকার প্রভৃতি বাঙালীর মনোময় দেহের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে, কোন দিন মুছে যাবে এমন আর আশঙ্কা নাই। যোগীন্দ্রনাথের মস্ত সুবিধা এই যে, বাঙালীর ছেলে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্রের এলাকায় পৌঁছবার আগেই তাঁর রাজ্য অতিক্রম করতে বাধ্য হয়। তখন আনন্দের যে ছাপ তিনি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও তা অবিকৃত থাকে। শিশুসাহিত্যিক হওয়ার এই মস্ত একটা সুবিধা। যদি সত্যই হওয়া যায়! যোগীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায় প্রভৃতি প্রায় আঁতুড়ঘরের দরজা থেকে শিশুদের ভার নেন। যে দেশে এমন সব লেখক আছেন সে দেশের শিশুরা সত্যই সৌভাগ্যবান। যোগীন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষিত বাঙালী-মাত্রেই ঋণী। তাদের অনেকেই এখন ক্ষমতাসীন ব্যক্তি। যোগীন্দ্রনাথের ঋণ স্বীকারার্থে তাঁদের কিছু কর্তব্য আছে মনে করি। বেশি কিছু আশা করব না, ঠকতে হবে। কলকাতার একটা পার্ককে যোগীন্দ্র সরকারের নামের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে অনায়াসে। সেখানে ছোট ছেলে মেয়েদের খেলবার ও বেড়াবার আয়োজন করা যেতে পারে, নাম দেওয়া যেতে পারে হাসিখুশি পার্ক বা যোগীন্দ্র উদ্যান। এ দেশে আনন্দ হাসির ব্যবস্থা অবিরল, পঞ্চাশ বছর ধরে যিনি হাসি জুগিয়ে ছেলেমেয়েদের খুশি করে রেখেছেন তাঁর সম্মানার্থে এটুকু আশা করা কি খুব বেশি?

বাংলার শিশু-সাহিত্যে যোগীন্দ্রনাথ সরকার

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

বাংলার প্রাচীন রূপকথা, ছড়া ও হেঁয়ালী প্রভৃতি লোক-সাহিত্যের সম্পদগুলির কিয়দংশ শিশুসাহিত্যের অন্তর্গত করা হয়। কিন্তু এগুলিকে বাংলার বর্তমান শিশুরঞ্জন সাহিত্যের ভিত্তি বলা যায় না। কারণ উক্ত সাহিত্যের সঙ্গে এ কালের সাহিত্যের গুণগত কোন যোগ নেই। বাংলার আধুনিক শিশুরঞ্জন সাহিত্যের সূত্রপাত ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। শিশুপাঠ্য হলেও সে রচনাকে সাহিত্য শ্রেণীভুক্ত করা চলে না। কারণ তা সৃজনমূলক ত ছিলই না, এমন কি, ভাষায়, বিষয়ে ও রচনায় ছিল নীরস ও চিত্তাকর্ষক গুণ-বিবর্জিত। এর সূত্রপাত বা ভিত্তি স্থাপিত হয়, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে একখানি পাঠ্যপুস্তক-সাহায্যে যার রচয়িতা ছিলেন তিনজন রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন ও তারিণীচরণ মিত্র। গ্রন্থখানির নাম 'নীতিকথা', প্রকাশকাল ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ, প্রকাশক স্কুল বুক সোসাইটি। গ্রন্থখানি পাঠশালার পাঠ্যরূপে নির্ধারিত হয়। সেকালে বাংলার শিশুগণের, কিশোরগণের, গৃহপাঠ্য সাহিত্য পুস্তকের অভাব ছিল। বাংলার লোক-সাহিত্য জলধি থেকে মণিরত্নতুল্য গল্প, কাব্য কাহিনী, ছড়া, হেঁয়ালী প্রভৃতি আহরণ করে সুকুমারমতি শ্রোতৃমহলে কথিত হ'ত! স্বভাবতই মুখে মুখে এগুলির বহিরঙ্গের কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটছিল। ঠিক এই সময়েই, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে, জন ক্লার্ক মারশম্যানের সম্পাদনায়, শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়, "দিগদর্শন" নামক মাসিক পত্রিকাখানি। পত্রিকাখানির নাম-পৃষ্ঠায় লিখিত থাকে, "যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ।" তখন বাঙ্গলা গদ্যেরও শৈশব। সুতরাং উক্ত পুস্তক ও পত্রিকাখানির ভাষা যে এখনকার মত সুসমৃদ্ধ, সুগঠিত ও সুন্দর ছিল না, তা উদ্ধৃতি না দিলেও সহজেই আন্দাজ করা যায়। কিন্তু পত্রিকাখানিকে শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্রিকা বলা যায় না, সে কথা তার নাম-পৃষ্ঠায় লিখিত উক্তিটি প্রমাণ করে। মাত্র তাই নয়, এখনকার শিশুপাঠ্য পাঠ্যগ্রন্থের মতো উক্ত গ্রন্থখানিও সহজ ও সরল ছিল না। তেমন হবার উপায়ও ছিল না। আরও কথা, সেকালে গ্রন্থ বা পত্রিকা কোনটিই চিত্র সজ্জিত করা যেত না। কারণ, শিল্পীর অভাব, ব্লক নির্মাণের ও মুদ্রণের উপায়েরও অভাব। অথচ শিশুপাঠ্য গ্রন্থে চিত্র একটি প্রধান সম্পদ। এই দৈন্য বহু বৎসর চলে।

প্রথমেই বাংলার আধুনিক শিশু-সাহিত্যের গোড়ার কথা কিছু লেখা প্রয়োজন এই কারণে যে, তা না হলে বাংলার শিশুরঞ্জন সাহিত্যে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের স্থান কোথায় ও দান কি তা সঠিক অনুমান করা যাবে না। যা হোক, মুদ্রণযন্ত্র ও মুদ্রণশিল্পে উন্নতি এবং শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই দীনতাও ধীরে অপসৃত হ'তে থাকে। গদ্য ক্রমে সহজ, সরল, সুগঠিত ও সুশ্রী হয়, দু-একখানি করে চিত্র দেখা দেয়, দু-একটি কবিতা-কুসুম প্রস্ফুটিত হ'তে সুরু করে যার একটি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের "পাখী সব করে রব" আজও অমলিন ও উজ্জ্বল এবং শিশুমহলে সুপঠিত। বস্তুতঃ এইটিই বাংলার আধুনিক শিশু-সাহিত্যে আদি মৌলিক কবিতা। পরবর্তীকালে শিশুপাঠ্য বহু কবিতায় এটির অল্পবিস্তর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ক্রমে বিদ্যালয়-পাঠ্য গদ্য ও পদ্যের বহু বাঙ্গলা গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হতে থাকে। আর, ব্যক্তিগত বা ধর্ম-সম্প্রদায়ের অথবা বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের প্রচেষ্টায় মাঝে মাঝে প্রকাশিত হতে থাকে,

মাসিক, সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্রিকা। সুরু থেকে প্রায় ষাট-সত্তর বৎসরের অধিককাল এই সাহিত্য ছিল অনুবাদ-প্রধান। ইংরেজী, সংস্কৃত, হিন্দী, আরবী, ফারসী ও ফরাসী ভাষা থেকে বহু গল্প-কাহিনী, এমন কি, কবিতাও অনুবাদ করা হ'ত। এই সময়ের মধ্যে বঙ্গ সাহিত্যে মাত্র একটি মৌলিক ছোট গল্পের প্রকাশ হয়। "কদাচ চুরি করা উচিত নহে" নামক উক্ত গল্পটি রচনা করেন বিদ্যাসাগর মহাশয় যাঁর তাবৎ সাহিত্যই অনুবাদ-প্রধান, অথচ বাংলা গদ্য যাঁর লেখনী-স্পর্শে সুগঠিত, সুন্দর ও নির্মল হয়। গল্পটি শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই শৈশবে 'বর্ণপরিচয় ২য় ভাগে' পাঠ করেছেন।

বাঙ্গলা শিশু-সাহিত্যের এই যে অগ্রগতি ও পরিপুষ্টি, এর মূলে ছিল ইংরেজী শিক্ষা, ইংরেজী শিশুরঞ্জন সাহিত্যের আদর্শ এবং স্বদেশীয় সাহিত্যের উন্নতি কামনা বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির প্রচেষ্টা। তখন বাঙ্গলার লোকসাহিত্যের সঙ্গে এই-সাহিত্যের সংযোগ রাখা বা তার উপজীব্যাদি গ্রহণ আর সম্ভব হয় না। ইউরোপের যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাব ও সংস্পর্শ দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন করে। কল-কারখানা ও রেলপথ স্থাপন, টেলিগ্রাফ-টেলিফোন প্রতিষ্ঠা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, বাষ্পীয়পোত চলাচল, নগরাদি পত্তন, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদি বিবিধ ঘটনায় যে নব যুগের সূচনা হয় তার ফলে সমাজেও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। লোক-সাহিত্য সৃষ্টির উপযোগী মানসিক পরিবেশও আর থাকে না। সুতরাং রূপকথা, উপকথা, ছড়াদি আর রচিত হতে পারে না। আবার, সেগুলি শিশুরঞ্জন লিখিত সাহিত্যেও ঠাঁই পায় না, কথকের মুখে মুখে পরিবেশিত হয়।

সেকালে শিশুপাঠ্য গ্রন্থগুলি বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে বন্দী থাকলেও সাময়িক পত্রিকাগুলির মুক্ত বাতায়ন-পথে স্নিগ্ধ সুরভিত বায়ু-স্রোতের মত কেবল শিক্ষা নয় কিছু কিছু মৌলিক রচনা মারফত আনন্দ-হিল্লোলও বয়ে আসত। ঐ সকল শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্রিকাগুলিই প্রকৃত শিশুরঞ্জন সাহিত্যের ইঙ্গিত বহন করত। সেগুলির মধ্যে আচার্য কেশব চন্দ্র সেন সম্পাদিত 'বালক বন্ধু' (১৮৭৮ খ্রী), প্রমদাচরণ সেন সম্পাদিত "সখা" (১৮৮৩ খ্রী), ভুবনমোহন রায় সম্পাদিত "সখা ও সাথী" (১৮৯৪ খ্রীঃ), পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত "মুকুল" (১৮৯৫ খ্রীঃ) ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত "বালকের" (১৮৮৫ খ্রীঃ) নাম আজও শিক্ষিত বাঙ্গালীর স্মৃতিতে জাগরূক। যোগীন্দ্রনাথ সরকার এই ইঙ্গিত গ্রহণ করেন এবং কয়েকজন সাহিত্যিকের রচনা সংকলন করে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে যে গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন তার নাম "হাসি ও খেলা"। বলা বাহুল্য, গ্রন্থের প্রত্যেকটি রচনা ছিল শিশু পাঠোপযোগী ও সৃজনমূলক। এই সচিত্র গ্রন্থখানি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেকালে বাঙ্গলার শিশু ও তাদের অভিভাবকমহলে আনন্দ-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। গ্রন্থ-প্রারম্ভে যোগীন্দ্রনাথ নিবেদন করছেন, "আমাদের দেশে বালক-বালিকাদের উপযোগী স্কুলপাঠ্য পুস্তকের নিতান্ত অভাব না থাকিলেও গৃহপাঠ্য ও পুরস্কারপ্রদানযোগ্য সচিত্র পুস্তক একখানিও দেখা যায় না। এই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিবার জন্য 'হাসি ও খেলা' প্রকাশিত হইল। সাধারণের উৎসাহ পাইলে শীঘ্রই 'ছবি ও গল্প' নামে আরও একখানি সচিত্র গৃহপাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।"

তাঁর এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে 'হাসি ও খেলার' দুই সহস্র পুস্তক নিঃশেষিত হয়। যোগীন্দ্রনাথ তখন পঞ্চবিংশতি বয়স্ক যুবক ও 'সিটি স্কুলে'র শিক্ষক। গ্রন্থখানি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনায়' (১৩০১, ফাল্গুন, ১৮৯৪ খ্রীঃ) মন্তব্য করেন, 'বইখানি ছোট ছেলেদের পড়বার জন্য। বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। ছেলেদের জন্য যে সকল বই আছে তাহা স্কুলে পড়িবার বই। তাহাতে স্নেহের বা সৌন্দর্যের লেশমাত্র নাই। তাহাতে যে পরিমাণে উৎপীড়ন হয়, সে পরিমাণে উপকার হয় না।

'আপাতত: ছেলেদের ইচ্ছাপূর্ব্বক ঘরে পড়িবার বই রচনা করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে; নতুবা বাঙ্গালীর ছেলের মানসিক আনন্দ ও স্বাস্থ্যানুশীলনের এবং বুদ্ধিবৃত্তির সহজ পুষ্টি সাধনের অন্য উপায় দেখা যায় না।

"হাসি ও খেলা" বইখানি সংকলন করিয়া যোগান্দ্রবাবু শিশুদিগের পিতামাতার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

সুতরাং দেখা যায়, যোগীন্দ্রনাথ সরকারের গ্রন্থই একালের প্রকৃত বাংলা শিশুরঞ্জন সাহিত্যে অগ্রদূত। এর সাহায্যে যোগীনবাবু পথিকৃতের কর্তব্য সাধন করেন। এই গ্রন্থে রাজকৃষ্ণ রায়, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, প্রমদাচরণ সেন ও মাইকেল চরিতকার যোগীন্দ্র-নাথ বসু প্রভৃতির শিশুরঞ্জন রচনা সংকলিত হয়।

রাজকৃষ্ণ রায় সেকালে সাহিত্যিক ও নাট্যকার হিসাবে সুপরিচিত হলেও একালে বিস্মৃত। রঙ্গমঞ্চে তৎ-রচিত নাটক, গ্রামে-গ্রামান্তরে তৎ-রচিত যাত্রাগানে বাঙ্গালীকে আনন্দ ও শিক্ষা দান করত। বস্তুত: রঙ্গমঞ্চই তাঁর দুর্দশা ও অকাল বিয়োগের প্রধান কারণ। সেকালে শিশু সাহিত্যেও সেকালের কেতাবী বাঙ্গালার চলন ছিল। কিন্তু সরকার মহাশয় 'হাসি ও খেলায়' সাহসপূর্বক একেবারে মুখের ভাষা, ঘরোয়া ভাষা, সহজ, সরল, সুমিষ্ট ভাষার ধারা বইয়ে দেন। গ্রন্থখানি সংকলিত হলেও তাতে তাঁর নিজস্ব কয়েকটি রচনা থাকে, যেগুলির মধ্যে 'সাতভাই চম্পা' একটি। সেকালে যে দেশী রূপকথার কথক ছিল লেখক ছিল না, একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু 'হাসি ও খেলা'য় আমরা সর্বপ্রথম দু'টি রূপকথার দেখা পাই—একটি উপেন্দ্রকিশোর রচিত "মজন্তালী", অপরটি যোগীন্দ্রনাথ রচিত 'সাতভাই চম্পা'। এরূপ অবস্থায় যোগীন্দ্রনাথ সরকারই বাংলা শিশুসাহিত্যে সহজ, সরল ভাষায় দেশী রূপকথা প্রথম আমদানী করেন, একথা বলা যায় না কি? আমাদের এরূপ বলার উদ্দেশ্য এই গ্রন্থের প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে রামকমল সেন-কৃত 'হিতোপদেশ' ও পাদ্রী উইলিয়াম কেরী-কৃত 'ইতিহাস-মালা' নামক গ্রন্থ দু'খানি প্রকাশিত হয়। কেরী তাঁর গ্রন্থখানি মুখ্যত: শিশুদের জন্য রচনা করেন নি, যদিও তাতে লোকরঞ্জন সাহিত্যান্তর্গত কতকগুলি রচনা ছিল। আর 'হিতোপদেশ' লোকরঞ্জন সাহিত্যান্তর্গত হলেও রূপকথা নয়। সরকার মহাশয়ের আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রসঙ্গে কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যকৃত ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'জীবন-আদর্শ' নামক গ্রন্থখানির কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন।

ভট্টাচার্য মহাশয় সৃজনমূলক সাহিত্য-রচয়িতা ছিলেন না কিন্তু অসত্য, অন্ধ ও কুসংস্কার দূরীকরণার্থে নির্ভয়ে লেখনী চালনা করেছেন, সেকালে যেজন্য যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন হ'ত। একালেও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার পাশে পাশে চলেছে সাহিত্য-মাধ্যমে অলৌকিক ঘটনাদির প্রবাহ, যেন উভয়ই সত্যের কষ্টিপাথরে কষে নেওয়া। ভূত-প্রেত ও দৈত-দানায় বিশ্বাস, হাঁচির শব্দে, টিকটিকির ও বিশেষ অবস্থায় কাক, চিল, বিড়ালাদির ডাকে, সর্প ও শৃগালের অবস্থানে, যাত্রাকালে ও প্রভাতে শয্যাত্যাগ করে বর্ণ বিশেষের মুখ দর্শনের কুফল সম্বন্ধে নানাবিধ হানিকর সংস্কার শৈশবকালেই মনে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে জীবনের পরবর্তীকালকেও প্রভাবিত করা হয়। ভট্টাচার্য মহাশয় গ্রন্থখানি রচনা করেন, ভ্রান্ত ও কুসংস্কারগুলি দূর করার উদ্দেশ্যে। তাঁরই মতো উনিশ শতকের প্রায় শেষ দিকে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ও এই মহৎ শিক্ষায় সচেষ্ট হন এবং বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকেও কবি সুকুমার রায় তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে এই কর্মে তৎপর ছিলেন। তাঁদের সৎ চেষ্টা কতখানি ফলোৎপাদিকা হয়েছে তা সুধী-সমাজ অবগত।

ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর গ্রন্থে বলছেন, "মনুষ্য যে পরিমাণ অজ্ঞ অবস্থায় থাকে সে পরিমাণে তাহার কুসংস্কার প্রবল থাকে। কারণ, যেস্থলে অজ্ঞতা, সেই স্থলেই বিশ্বাসের আধিক্য। এবং বিশ্বাসের আধিক্যই কুসংস্কারের উত্তেজক।......"

এই গ্রন্থে ভূমিকায় একস্থলে তিনি লিখছেন, "...বিষয় বিবিধ করিয়াছি। কতকগুলি গৃহে পাঠার্থ ও কতকগুলি শিক্ষক মহাশয়দিগের নিকট পাঠার্থ"। গ্রন্থখানির হিতকারিতা সত্বেও জনপ্রিয়তা অর্জন করে না। তথাপি কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মহাশয়কে যোগীন্দ্রবাবুর পূর্বসূরী বলা যায়। কারণ, যোগীন্দ্রবাবুর পূর্বেই তিনি গৃহ-পাঠার্থ গ্রন্থ রচনায় কিছুটা অগ্রসর হন। তবে সে গ্রন্থ সচিত্র ও পুরোপুরি গৃহপাঠ্য হয় না।

পর বৎসর যোগীন্দ্রবাবুর কথা মত 'ছবি ও গল্প' প্রকাশিত হয় (১৮৯২ খ্রীঃ)। এখানিও সংকলিত। তবে এতে তৎরচিত অনেকগুলি গল্প ও ছড়া থাকে। সব কয়টিই সহজ, সরল ও সরস, যা যোগীন্দ্রবাবুর রচনা-বৈশিষ্ট। এই গুণ শিশুসাহিত্যে আর তেমন ভাবে দেখা গেল না। গ্রন্থ দু'খানির প্রথম দিককার সংস্করণ দুষ্প্রাপ্য। পরবর্তী সংস্করণগুলিতে নতুন নতুন সংযোজনগুলি আলোচনার অপেক্ষা রাখলেও সেদিকে আর অগ্রসর হওয়া সমীচীন বোধ হয় না।

বাংলা শিশুসাহিত্যে 'ননসেন্স-রাইম' (উদ্ভট ছড়া) একটি বিশিষ্ট স্থান জুড়ে থেকে সুকুমারমতি পাঠক সমাজে প্রচুর আনন্দরস বিতরণ করছে। এরও সুরু যোগীন্দ্রনাথ সরকার থেকে। তিনিই 'মুকুলের' ১৩০৩ বঙ্গাব্দ, ফাল্গুন সংখ্যায় লেখেন, 'কালা হারে কি ধলা হারে' নামক হাস্য-রসাত্মক ছড়াটি। সেই বৎসরেই প্রকাশিত হয় তাঁর 'পেটুক দামু'। অবশেষে তৎরচিত 'ননসেন্স-রাইম' সম্বলিত 'হাসি-রাশি' নামক হাস্যরসে ভরপুর গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং এদিকেও যোগীন্দ্রবাবু পথিকৃৎ। এই গ্রন্থের 'মজার দেশ' অধুনা সঙ্গীতে রূপায়িত হয়েছে। 'টমাস সাহেবের মাছ ধরা', 'কাজের ছেলের,' 'ডিম ভরা দই, চিনিপাতা কৈ, ইত্যাদি পড়ে কে না হেসেছে এবং এখনও না হাসে? তৎরচিত 'মজার দেশ' ছড়াটি সংবাদপত্র সাহিত্যে মজা কখন কখন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

বঙ্গ সাহিত্যে নানা ধরনের ছড়া যে কত বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে তা সাহিত্যরসিক মাত্রেই অবগত। বাংলার সমাজ, বাঙ্গালীর সংসার, বাঙ্গালীর গ্রাম্যজীবন, কৃষিসম্পদ, জীবন দর্শন, এক কথায় গোটা প্রাচীন বাংলাকে এর মধ্যে পাওয়া যায়। যোগীন্দ্রবাবু শিশুদের জন্য ছড়া সংগ্রহেও ব্যাপৃত হন এবং ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে 'খুকুমণির ছড়া' নামক সংকলন গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। গ্রন্থখানির সুদীর্ঘ ভূমিকা রচনা করেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়—যেটি বাংলার ছড়া সম্বন্ধে অতুলনীয় প্রবন্ধ সাহিত্য হয়ে আছে। এর একস্থলে ত্রিবেদী মহাশয় মন্তব্য করছেন, 'বাঙ্গালাতে এরূপ গ্রন্থের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় কয়েক বৎসর হইতে সেই অভাব দূর করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন; তিনিই বাঙ্গালীর মধ্যে এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পথ-প্রদর্শক...তাঁহার প্রকাশিত শিশু-পাঠ্য পুস্তকগুলি সুরঞ্জিত ছবি ও কৌতুকময় উপাখ্যানাদি সমাবেশে শিশুজনের চিত্তহরণে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান কার্য্যে তিনি একটু অভিনব সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। সেই কারণে তিনি বিশেষতঃ প্রশংসার্হ।' সুতরাং এদিকেও তিনি পথ-প্রদর্শক।

বাঙ্গলা শিশুসাহিত্যে ও শিশুশিক্ষা ক্ষেত্রে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের অদ্বিতীয় কীর্তি 'হাসি-খুসি' প্রথম ভাগ। 'খুকুমণির ছড়ার' দু' বৎসর পূর্বে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় বলে জানা যায়। ছড়ারসে সিক্ত অক্ষরের সঙ্গে শিশুর পরিচয় ঘটানো সেকালে ছিল সম্পূর্ণ নূতন। পদ্ধতিটি শিক্ষাবিজ্ঞান-সম্মত না হতে পারে। কারণ, এরূপ অবস্থায় শিক্ষার্থীর মন ছড়ারসেই মুখ্যতঃ আকৃষ্ট হয়, অক্ষরগুলি হয় গৌণ। সেকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রভাব বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবল। তাঁর বর্ণপরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ বাংলার সর্বত্র শিশুশিক্ষাক্ষেত্রে প্রচলিত। তৎপূর্বে রাধাকান্ত দেব থেকে সুরু করে কয়েকজন বর্ণশিক্ষার উদ্দেশ্যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁদের অন্যতম ছিলেন, পাদ্রী বোম-এচ যিনি নদীয়ার নীল চাষীবিদ্রোহের সঙ্গে কিছুটা সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু

বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-পদ্ধতি সহজ হওয়ায় পূর্বের গ্রন্থগুলি দুরূহ বিধায় অপ্রচলিত ও লুপ্ত হয়ে যায়। বাংলার শিশুশিক্ষাক্ষেত্রে কিন্তু 'হাসি-খুসি' দিব্য আসর জাঁকিয়ে বসে। কারণ, ছড়া ও ছবিতে শিশু-চিত্ত সহজেই পুষ্প বনে ভ্রমরের মতো লুব্ধ হয়। কিন্তু সরকার মহাশয় বিদ্যাসাগরী প্রভাব এড়াতে পারেন না, তাঁরই বর্ণানুক্রমে ছড়া রচনা করে শিক্ষার সেই পদ্ধতি বজায় রাখেন, অধুনা যা আর থাকতে পারছে না। বিদ্যাসাগরী পদ্ধতি অনাবশ্যক বোধে বাতিল করে তৎস্থলে বর্ণপরিচয়ের নতুন পদ্ধতি প্রচলনের চেষ্টা হচ্ছে। তথাপি যেমন সেকালে, তেমনি একালেও গ্রন্থখানি সর্বত্র সমাদৃত, শিশু-শিক্ষায়, ছড়া কণ্ঠস্থ করানোয় যেন অপরিহার্য। সরল ছড়াগুলির শব্দ ঝঙ্কারের এমনই মোহিনী শক্তি। সংখ্যা গণনা শিক্ষাক্ষেত্রেও 'হারাধনের দশটি ছেলের' দুঃখময় কাহিনীর ও আকর্ষণী শক্তি সামান্য নয়। কিন্তু এখানেও শিক্ষার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি বজায় থাকে নি, ছড়া ও কাহিনীটি হয়েছে মুখ্য। এটিও অতি সম্প্রতি কৌতুক-সঙ্গীতে রূপায়িত হয়েছে।

যোগীন্দ্রবাবু সর্বসাকুল্যে তেইশ-চব্বিশখানি গ্রন্থকর্তা মনে হয়, কিন্তু তাঁর হাস্য রসভরা ছড়াগুলি, হাসিখুসি কালজয়ী হয়ে বাংলার শিশু-সাহিত্য ভাণ্ডার উজ্জ্বল করে আছে। তাঁর লেখনী কিশোর সাহিত্যে পরিচালিত হতে বিশেষ দেখা যায় না। তাতে ক্ষোভ বা ক্ষতির কিছু নেই, বরং তাঁর মতো করে প্রকৃত শিশুরঞ্জন সাহিত্য আর রচিত হয় না, এটাই দুর্ভাগ্যজনক। অবশ্য একই ধরনের প্রতিভা বা শক্তি একের মধ্যেই স্ফুরিত হয়; একই ধরনের সাহিত্য বহুজন কর্তৃক বা পরবর্তীকালে সৃষ্ট হয় না, হতে পারে না। কারণ, পরিবেশের নিয়ত পরিবর্তন, জীবন দর্শনের পরিবর্তন, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। এ কালটি শিল্পায়নের, বিজ্ঞানের এবং রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক পরিবর্তনের কাল। সুতরাং সাহিত্যও সেইমত না হয়ে পারে না।

যেমন বাংলা শিশুসাহিত্যে সরকার মহাশয়ের প্রচেষ্টা অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছিল তেমনি পুস্তক ব্যাবসায় ক্ষেত্রেও তিনি অসামান্যরূপে সফল হয়েছিলেন। বিদ্যালয়-পাঠ্যগ্রন্থ বাদ দিয়ে স্ব-রচিত শিশু-সাহিত্যের ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থোপার্জনের উদাহরণ বাংলা দেশে আর আছে কি?

—:০:—

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

রঞ্জিতা কুণ্ডু

ইংরেজী Nursery Rhymes-এর মতই বাংলা ছেলে-ভুলানো ছড়ার মধ্যে Nonsense Rhymes বা আজগুবী ছড়ার প্রাধান্য দেখি। যা কিছু প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে এবং সচরাচর ঘটতে দেখা যায় না, অথবা কখনই ঘটা সম্ভব নয়, তারই উপর শিশুর স্বাভাবিক আকর্ষণ। বয়স্করা যা অবাস্তব বলে, অসম্ভব বলে, পরিহার করেন, তারই মধ্যে শিশু পায় কৌতুকের খোরাক। তাই ইংরেজীতে রচিত বহু পুরনো কালের আজগুবী গীত এবং ছড়ার সন্ধান পাওয়া যায়—তাদের অনেকগুলির বয়স তিনশ, সাড়ে তিনশ বৎসর বলে আন্দাজ করা হয়। অবশ্য তার পরবর্তীকালেও নতুন নতুন আজগুবী ছড়া রচিত হয়েই চলেছে এবং তাতেই এগুলির জনপ্রিয়তা (শিশুপ্রিয়তা) প্রমাণিত হয়েছে। এমনই একটি Nursery Rhyme 'Crazy Arithmetic' ছড়াটি এইরূপ :—

"4 in 2 goes twice as fast,
If 2 and 4 change places ;
But how can 2 and 3 make four
If 3 and 2 make faces ?"

এই ছড়াগুলির মতই বাংলার ছেলেভুলানো ছড়ার রচয়িত্রী যে কে বা কারা ছিলেন, তা কেউ জানে না। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল চঞ্চল শিশুকে ভুলিয়ে শান্ত করা বা ফাঁকি দিয়ে ঘুম পাড়ানো। সেই ভুলিয়ে রাখার ব্যাপারটি সুসম্পন্ন করবার জন্য কত যে আজগুবী ব্যাপারের কল্পনা তাঁরা করেছেন, তার অন্ত নেই। কখনও বলেছেন,

"গড়গড়ের মা লো, গড়গড়ের মা,
তোর গড়গড়াটা কৈ ?
হালের গরু বাঘে খেয়েছে,
পিঁপড়ে টানে মৈ !"

কখনও বলেছেন,

'ও জামাই খেয়ে যারে
সাধের নূতন তরকারি'
শিলভাতে, নোড়াভাজা
কোদাল চড়চড়ি !"

যোগীন্দ্রনাথের সঙ্কলিত "খুকুমণির ছড়া'য় এমন বহু ছড়াই আছে, যার মধ্যে অর্থ আবিষ্কার করা দুরূহ কিন্তু সেজন্য এগুলির রস উপভোগে শিশুর কোন অসুবিধাই হয় না। কারণ শিশু যা কিছু শোনে, তার মধ্যে সে আভিধানিক অর্থের সন্ধান করে না বা তর্কশাস্ত্রসম্মত যুক্তি চায় না। শিশু কথার মাধ্যমে ছবি দেখতে ভালবাসে, তাই ছড়া আজগুবী হলেও তার আপত্তি নেই। নাম-না-জানা পল্লীগ্রামের ছড়া-রচয়িত্রীদের রচিত ছড়ার বিষয় রবীন্দ্রনাথ একদা "মেয়েলি ছড়া" নামে এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তারপর তিনি আরও কিছু ছড়া সংগ্রহ করেন। এইরকম অনেক ছড়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রৈমাসিক পত্রিকায় কিছুদিন প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে কাজটা অধিকদূর অগ্রসর না হয়েই থেমে যায়। তারপর ছড়াসংগ্রহের কাজে ব্রতী হলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার এবং তাঁর সংগৃহীত সেই ছড়াগুলিকে "খুকুমণির ছড়া" নাম দিয়ে ১৩০৬ সনে প্রকাশ করলেন। বইটির ৪১০টি ছড়ার মধ্যে অনেক আজগুবী ছড়া আছে। কিন্তু শুধু সঙ্কলনই নয়, যোগীন্দ্রনাথ নিজেও বহু আজগুবী ছড়া লিখেছেন এবং তাঁর বিভিন্ন শিশুপাঠ্য গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছেন। লেখবার সময় তাঁর সম্মুখে ঊনবিংশ শতকের

মধ্যভাগে রচিত কিছু ইংরেজী আজগুবী ছড়াও ছিল। তার মধ্যে ১৮৬৩ সনে প্রকাশিত এডওয়ার্ড লিয়রের Nonsense verses এবং ১৮৬৫ সনে প্রকাশিত লুইস ক্যারলের 'এ্যালিস ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডে'র অন্তর্গত আজগুবী ছড়াগুলিরও নাম করা যেতে পারে।

যোগীন্দ্রনাথ এ জাতীয় ছড়া কবে প্রথম লিখেছিলেন, তা জানা যায়নি। তবে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত "সন্দেশ" নামক শিশু মাসিকে (প্রথম প্রকাশ, ইংরেজী ১৯১৩, বঙ্গাব্দ ১৩২০) তিনি আজগুবী ছড়া লিখেছিলেন। পরে এইগুলি তাঁর "হিজিবিজি" গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে উপেন্দ্র-কিশোরের পুত্র সুকুমার রায়ের "আবোল-তাবোলে"র বিখ্যাত আজগুবী কবিতাগুলিরও জন্ম এই 'সন্দেশে'র পাতাতেই। সুকুমার রায় রচিত কয়েকটি আজগুবী রচনা যোগীন্দ্রনাথের 'হিজিবিজি'রও অন্তভু্ক্ত করা হয়েছে।

কিন্তু "হিজিবিজি" প্রকাশের অনেক পূর্বেই যোগীন্দ্রনাথ "হাসিরাশি"তে লিখলেন এই আজগুবী কবিতা—"মজার মুল্লুক"। ইংরেজী Nonsense Rhymes সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "Nonsense is nothing but truth standing on its head." অর্থাৎ আজগুবী রচনাকে একটু ওলটপালট করে দেখলেই বাস্তব ব্যাপারের সন্ধান পাওয়া যায়। "মজার মুল্লুক"এর ক্ষেত্রেও এই কথাই সত্য। কবিতাটির আরম্ভ এইরূপ :—

"এক যে আছে মজার দেশ,
সব রকমে ভালো,
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ,
দিনে চাঁদের আলো।"

আয়নার মধ্যে যেমন সবই উল্টো হয়ে দেখা দেয়, মজার মুল্লুকেও তেমনি সব উল্টো।

"আকাশ সেথায় সবুজ বরণ,
গাছের পাতা নীল,
ডাঙ্গায় চরে রুই কাতলা,
জলের মাঝে চিল।"

শুধু বর্ণনাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে মজার ছবিও আছে। এখানে একটি কথা বলে রাখা আবশ্যক। যোগীন্দ্রনাথের রচনার আনুষঙ্গিক ছবিগুলি বিভিন্ন আর্টিষ্টের আঁকা হলেও ওগুলি সম্পূর্ণরূপে তাঁরই নির্দেশে আঁকা হত। সুতরাং ওগুলির পরিকল্পনার গৌরব তাঁরই প্রাপ্য।

মজার মুল্লুকের পরের অনুচ্ছেদগুলিতে এবং সঙ্গের ছবিগুলিতে দেখি, সেই আজবদেশে নেংটি ইঁদুর দেখে বেড়াল পালায় আর ছেলেরা রসগোল্লা ফেলে ক্যাষ্টর অয়েল খায়। এই পংক্তি কটি রচনার কালে যতদূর সম্ভব Robert Browning রচিত শিশুকবিতা হ্যামেলিনের বহুরূপী বাঁশীওয়ালার গল্পে ইঁদুরের কথা লেথকের মনে পড়ে থাকবে; সেই যে হ্যামেলিনের বিকট এবং আজব ইঁদুর যারা

"......fought the dogs and killed the cats,
And bit the babies in toe cradles".

মনে হয়, সেই অদ্ভুত কুকুরজয়ী, বিড়ালমারী ইঁদুরগুলো বা তাদের বংশধরেরাই যোগীন্দ্রনাথের "মজার মল্লুক"এ এসেছিল। তাই

"সেই দেশেতে বেড়াল পালায়
নেংটি ইঁদুর দেখে ;"

এই মজার দেশে আরও কত অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড হয় —মণ্ডা মিঠাই তেতো বোধ হয় আর ওষুধ খেতে ভালো লাগে, অন্ধকারকে শাদা দেখায়, আর শাদা জিনিস কালো মনে হয়। ছবিতে দেখি শিশি শিশি ক্যাষ্টর অয়েল নিয়ে ছেলেরা খাচ্ছে। আর পরের পংক্তিগুলি হল :—

"ছেলেরা সব খেলা ফেলে
বই নে বসে পড়ে ;
মুখে লাগাম দিয়ে ঘোড়া
লোকের পিঠে চড়ে।"

ভারতীয় লেখকের রচনায় ইংরেজীর অনুরূপ কোন ভাব দেখলেই আমরা ধরে নিই যে নিশ্চয়ই দেশী লেখক বিদেশী লেখকের নকল করেছেন, কিন্তু 'হাসিরাশি'তে যোগীন্দ্রনাথের আজগুবী কবিতাটি প্রকাশিত হবার অনেক পরে ইংরেজীতে George Orwell লিখলেন তাঁর Animal Farm. রাশ্যান কম্যুনিজ্ম্-এর উপর স্যাটায়ার। জোন্স নামে এক খামারের মালিকের জানোয়ারেরা কিভাবে তাকে খামার থেকে বার করে দিয়ে নিজেরাই মালিক হয়ে বসল, এ তারই কাহিনী। কার্লমার্কসের উদ্ভাবিত শ্রেণী-সংঘর্ষের থিওরি এবং শ্রমিক-বিপ্লব নিয়েই এই স্যাটায়ার রচিত। তবুও ঐ গুরুগম্ভীর পংক্তিগুলি যেখানে জন্তুরা গাইছে,

> "Soon or late the day is coming
> Tyrant Man shall be o'erthrown
> And the fruitful fields of England
> Shall be trod by beasts alone"

রস স্থলে "মজার মুল্লুক" এর

> "মুখে লাগাম দিয়ে ঘোড়া
> লোকের পিঠে চড়ে"

এই পংক্তি কটির প্রতিধ্বনি পাই। যোগীন্দ্রনাথ অবশ্য ব্যঙ্গরচনা লেখেন নি। বালকবালিকাদের আমোদের খোরাক জোগানই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু সহজ ভাষার পশ্চাতে গভীর চিন্তাধারার সন্ধান করতে গেলে মনে হয় যে, যাদের আজ আমরা অত্যাচারিত দেখছি, তারা যদি কোন দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, তাহলে তারাও নিজেরা অত্যাচারীতে পরিণত হবে। এ শুধু রাজনীতি বা সমাজনীতির কথা নয়, মনস্তত্বর কথা। সকলেই জানেন যে, যে বধূ অত্যাচারী শাশুড়ী, ননদের সঙ্গে চোখের জলে ভেসে ঘর করে, কালক্রমে সেই একদিন দারুণ অত্যাচারী শাশুড়ীতে পরিণত হয়। তাই ঘোড়া যেদিন স্বাধীন হয়ে হাতে ক্ষমতা পাবে, সেদিন সে মানুষকে ঘোড়া বানিয়ে তার পিঠে চড়বে। এইখানেই যোগীন্দ্রনাথের রচনায় অনুরূপ চিন্তা পাই Animal Farm এর পাতায়।

এরপর "মজার মুল্লুক" এ দেখি,

> "জিলিপী সে তেড়ে এসে,
> কামড় দিতে চায় ;
> কচুরি আর রসগোল্লা
> ছেলে ধরে খায় !"

এই পংক্তিকটিতে পূর্বের পংক্তিগুলির অনুরণন দেখি, আজ তুমি যাকে খাচ্ছ, সে একদিন তোমাকে খাবে। ভক্ত কবি কবীর বলেছেন,

"মাটি বহৈ কুম্ভারকো, তুঁ ক্যা রুঁদৈ মেহি। ইক দিন এ্যয়সা হোয়েগা,
মঁয় রুঁদোংগী তোহি।"

অর্থাৎ মৃত্তিকা কুম্ভকারকে বলছে, "আজ তুমি আমাকে দলিত—পিষ্ট করছ, কিন্তু এমন একদিন আসবে যখন তোমার দেহটাকেও আমি অমনি করব।"

"মজার মুল্লুক"এর পরের পংক্তিগুলি সবই আজগুবী।

> "ঘুড়ির হাতে বাঁশের লাটাই
> উড়তে থাকে ছেলে ;"

অভিনিবেশ সহকারে পড়লে এর মধ্যেও নিহিত অর্থ আবিষ্কার করা যায়। ঘুড়ি ওড়ান বালকের বিশেষ প্রিয় খেলা কিন্তু কেন বালক এ খেলা এত ভালবাসে ? এই প্রশ্নের উত্তর পাই সমারসেট মম্ রচিত "The kite" নামক ছোট গল্পে। ঐ গল্পে এমন একটি লোকের কাহিনী বলা হয়েছে যে বাল্যকাল থেকে তার প্রবলপ্রতাপশালিনী মায়ের পাল্লায় পড়ে কোনরকম স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে নি। তার মায়ের ভয় ছিল পাছে সে সাধারণ লোকের 'অসভ্য' ছেলেপিলের সঙ্গে মিশে খারাপ হয়ে যায়। তার সঙ্গতৃষা নিবারণের জন্য তার মা তাকে ঘুড়ি ওড়ানর নেশা ধরিয়ে দেন। পরে তার ঐ নেশা এমন আকার ধারণ করে যে ঐ জন্য স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ ও

মনোমালিন্য হয়। সে মনোমালিন্য এমন চরমে ওঠে যে শেষ পর্যন্ত তাই নিয়ে মামলা হয়। ফলে সে কারাবরণ করতে বাধ্য হয়। মমের গল্পের নায়ক হারবার্ট সানবেরির ঘুড়ি ওড়ানর বাতিকের সমর্থনে লেখক বলেছেন যে, সে নিজের অজ্ঞান্তে ঘুড়ির সঙ্গে আপন সত্ত্বাকে একীভূত করেছিল এবং ঘুড়ি যখন নীল আকাশের অসীম নীলিমায় ইতস্ততঃ উড়ে বেড়াত, হারবার্টও তখন তার বাস্তবজীবনের সীমাবদ্ধতা ভুলে গিয়ে অনন্ত আকাশে স্বচ্ছন্দগতির আনন্দ উপভোগ করত। "মজার মুল্লুক"এর যে ছেলেটি ঘুড়ির সুতোয় বাঁধা আকাশে উড়ছে, তার ছবি দেখে এবং মানসিক অবস্থা কল্পনা করে খোকাবাবুও নিশ্চয়ই ঐ হারবার্টের মতই মেঘলোকে স্বচ্ছন্দ বিহারের কল্পনা করে আনন্দে অধীর হবে।

ইঁদুরের বেরাল মারা ব্যাপারটাকে সব আজগুবী ছড়াতেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এমন কি, বাংলার ছড়া রচয়িত্রী কোন্ শাশ্বতকালের ঠান্‌দির কল্পনায়ও এই চিত্রই ধরা পড়েছিল। তিনি বল্লেন,

"ওরে ও নটে শাক,
তোর দেশে কি এই বিচার—
ইঁদুর বেরালে ধরে খায়!"

কিন্তু ইংরেজ কবি বোধহয় পুরুষ ছিলেন। তাই ঠান্‌দির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তিনি পেরে ওঠেন নি। ইঁদুরকে দিয়ে বেরাল খাইয়েই এই কল্পনাপ্রবণ মহিলাটির তৃপ্তি হয় নি। এরপর তিনি ছড়া কাটলেন,

"শুন গো মা ভগবতী
ছাগলে গিলেছে হাতী,
পুঁটি মাছ তানপুরা বাজায়!"

সুতরাং যোগীন্দ্রনাথের ছড়ায় শুধু সাগরপারের প্রভাবই নেই, পল্লীবাংলার শাশ্বতকালের ঐ গুণগুণ ধ্বনিটুকুরও প্রতিধ্বনি আছে।

পৃথিবীতে অর্থাৎ বাস্তব জগতে যা কিছু প্রতিনিয়ত ঘটছে, ঠিক তার বিপরীত ছবিটি দেখিয়েই "মজার মুল্লুক" এর আজগুবী চিত্রটি রচিত হয়েছে। অবিকল ঐ ভাবেরই ছায়া দেখি, "হিজিবিজি"র "উল্টা বুঝ্‌লি রাম" অথবা "ছড়া ও ছবি"র "ছেলে ও বুড়ো" কবিতায়। "উল্টা বুঝ্‌লি রাম" কবিতাটি এইরূপ :—

"উল্টা বুঝ্‌লি রাম—আরে
উল্টা বুঝ্‌লি রাম!
কা'কে করলি সওয়ার, আর
কার মুখে লাগাম!
কেউ বা বসে লুটছে মজা
ভাবছে কি আরাম।
আর টানতে গাড়ী দরদরিয়ে
ঝরছে কারো ঘাম।"

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ঘোড়ারা জামাকাপড় পরে ছাতা মাথায় দিয়ে ফিটন গাড়ীতে চড়ে বেড়াতে যাচ্ছে, আর দুটি ছোট ছোট ছেলে ঘোড়ায় স্থলাভিষিক্ত হয়ে গাড়ী টানছে। বলা বাহুল্য গাড়োয়ানটিও এক্ষেত্রে ঘোড়া। "মজার মুল্লুক"-এর মতই ঐ কবিতা পড়লে **Animal Farm** এর কথাও স্মরণ হয়।

"ছড়া ও ছবি"র "ছেলে ও বুড়ো" অবশ্য সহজ সরলভাবে রচিত। সঙ্গের চিত্র দু'খানি না থাকলে এর ভাবের থেকে এটিকে আজগুবী কবিতা বলে মনে হয় না।

"ছেলেরা সব ঘুমিয়ে আছে—
মুখে চুষি কাঠি।"

এই পংক্তিটির সঙ্গে কতকগুলি দুগ্ধের চুষিকাঠি মুখে দিয়ে শুয়ে থাকার ছবি দেখি। এরপর আর একটিমাত্র পংক্তি আছে,

"বুড়োরা সব খেলছে পাশা—
চশমা নাকে আঁটি।"

এই পংক্তিটির সঙ্গের চিত্রে দেখি কয়েকটি বালক তাকিয়া ঠেস দিয়ে গালে হাত দিয়ে গড়গড়া টানতে টানতে পাশা খেলছে। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের "ইচ্ছাপূরণ" গল্পটি স্মরণ করা যেতে পারে।

হয়। সে গল্পের নায়ক যে কে, তা বলা কঠিন। বৃদ্ধ পিতা সুবলচন্দ্র ও বালক পুত্র সুশীলচন্দ্র—দুটিমাত্র চরিত্র আছে গল্পটিতে। সুবলচন্দ্র শৈশবে যথাযথভাবে লেখাপড়া না করার জন্য অনুতপ্ত হয়ে ভাবছিলেন যে, যদি শৈশব ফিরে পাওয়া যায় তিনি আর সময় নষ্ট করবেন না। তাঁর পুত্র ভাবছিল যে পিতার মত বয়স্ক হলে বয়স্কদের শাসনের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। সেই সময় ইচ্ছাঠাকরুণ সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। পিতা ও পুত্রের মনস্কামনা জানতে পেরে তিনি উভয়কে (অবশ্য তাদের অজান্তে) বর দিলেন। পরের দিন সকালে উঠে পুত্র পিতার বয়সী ও পিতা পুত্রের বয়সী হলেন। এর ফলে যে হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি হ'ল, রবীন্দ্রনাথের গল্পটি তাই নিয়েই রচিত। যোগীন্দ্রনাথের "ছেলে ও বুড়ো"র ভাবও একই।

অনেক রকম আজগুবী ছড়া আজ পর্যন্ত রচিত হয়েছে। তার মধ্যে কোনটি বা সুকুমার রায়ের "দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম দেড়ে দেড়ে দেড়ে" মত ধ্বনিসঞ্জাত, কোনটি বা "হাঁস ঝিল সজারু"র মত দুটি শব্দের কষ্টকল্পিত সন্ধির উপর ভিত্তি করে রচিত, কোনটি বা মানুষের জগতের ঘটনা জন্তুজগতে ঘটনার উপর আধারিত। এ ছাড়াও কখনও বা দেখি, মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অস্বাভাবিক এবং অসম্ভবরূপে বর্ধিত হওয়া নিয়ে, আবার কখনও বা ম্যাজিকের মত কোন কিছু অদৃশ্য হয়ে যাওয়া নিয়ে আজগুবী ছড়া। এরকম অনেক আজগুবী ছড়াই যোগীন্দ্রনাথের রচনায় পাওয়া যায়।

১৩৫৮ সালের পৌষ মাসে মাসিক বসুমতীতে একটি রচনা প্রকাশিত হয়। তার থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি :—

"সাধারণ গৃহস্থ বাড়ীতেও (তখন) পাঠ্যেত্তর বইয়ের আমদানী ছিল না বলিলেই চলে। শিশু-সাহিত্যের একমাত্র পরিবেশক ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়। বাংলাদেশের এইকালের ছেলেমেয়েদের তিনি যাহা দিয়াছেন, তাহারা বড় হইয়া বিস্মৃতিপরায়ণ না হইলে তাঁহার নামে উচ্চতম স্মৃতিস্তম্ভ বাংলাদেশের কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই নির্মিত হইত।

"আমরা প্রায়ই এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় পুস্তক সংগ্রহের অভিযানে বাহির হইতাম। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্কলিত কি একখানি বই সংগৃহীত হইল। গোড়া হইতে বিমুগ্ধ মন লইয়া পড়িতে পড়িতে হঠাৎ সেই বাস্তব জীবনের পটভূমি হইতে এক অজ্ঞাত রহস্যলোকে উত্তীর্ণ হইলাম।"

রচনাটি একটি আত্মস্মৃতি। লেখক শ্রীসজনীকান্ত দাস। যে বইটির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, সেটি যোগীন্দ্রনাথের 'ছবি ও গল্প'। ঐ আত্মস্মৃতিতেই তিনি আরও লিখেছেন, "যোগীন্দ্রনাথ সরকারের নিকট আমার —তথা সেকালের ছেলেমেয়েদের ঋণের পরিমাণের কথা লিখিয়া শেষ করিতে পারিব না।...শিশু সমাজে রস-ভগীরথ হইলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার।"

এক দুর্লভতর সৌভাগ্যের বশে এক সময় তাঁর অতি নিকটে এসেছি, দেখেছি তাঁর হিমালয়ের মত ব্যক্তিত্ব, সমুদ্রের মত হৃদয়ের গভীরতা, ঝর্ণাধারার মত রসের ফোয়ারা আর সেই রসমধুধারায় স্নান করেছি। নিজের বাল্যকালের কথা, যৌবনের কথা কি সরস করেই না বর্ণনা করতেন। তার মধ্যে কিছু কিছু এখনও মনে পড়ে।

শুনেছি ১২৭৩ সালের ১২ই কার্তিক, রবিবার, রাত্রি ১২-৩০ মিনিটের সময়, ২৪ পরগণার অন্তর্গত জয়নগর গ্রামে তাঁর মাতুলালয়ে দাদামশায়ের জন্ম। তাঁর পিতার নাম নন্দলাল দেব-সরকার। মাতার নাম থাকমণি দেবী।

দেব-সরকারদের আদি পুরুষের বসতি ছিল বর্তমান পূর্ব পাকিস্থানের যশোহরে। এই পরিবারের বিভিন্ন শাখা নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং নানা ক্ষেত্রে যশস্বী হন। শোনা যায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব মহাশয়

—সকলেই এই বংশের বিভিন্ন শাখাসম্ভূত। যশোহর থেকে এই বংশের একটি শাখা পঞ্চগ্রামে চলে আসেন। তখন পর্যন্ত সরকারেরা "দেব" পদবীই লিখতেন। এবং শোভাবাজারের রাজবাড়ীর পূর্বপুরুষেরা ও ৺নন্দলাল সরকার মহাশয়ের পূর্বপুরুষেরা একত্রেই ছিলেন। এই বংশের নবকৃষ্ণ দেব মহাশয় পঞ্চগ্রাম থেকে শোভাবাজারে এসে জমিদার হয়ে বসেন এবং শোভাবাজারের বিখ্যাত রাজবাড়ীর প্রতিষ্ঠা করেন। বংশের আর একটি শাখা পঞ্চগ্রাম থেকে অন্য একটি গ্রামে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই গ্রামটির নাম জানতে পারি নি। এই গ্রাম থেকেই তাঁরা ২৪ পরগণার ত্রিতাড়ায় যান। গ্রামের ত্রিতাড়া নামটি লোকের মুখে মুখে "ত্যাতড়া"য় রূপান্তরিত হয়। ত্যাতড়ায় বাসকালে এই বংশের সীতানাথ দেবের পুত্র শ্যামসুন্দরই প্রথম সরকার পদবী লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর তিন-চার পুরুষ পরে যোগীন্দ্রনাথের পিতা নন্দলাল সরকারের জন্ম।

যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন নন্দলালের অষ্টম সন্তান। নন্দলালের প্রথমা কন্যার পর জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিনাশচন্দ্র, তাঁর পর চিকিৎসাজগতে সুবিখ্যাত স্যার নীলরতন, তাঁর পর উপেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথের পর যোগীন্দ্রনাথ।

শোনা যায় ১৮৬৪ সালে আশ্বিন মাসের একবার প্রবল ঝড়ে ও বন্যায় নন্দলালের নিতাড়ার ঘরবাড়ী ভূমিসাৎ হয় এবং সাত বৎসরের বালক অবিনাশচন্দ্র, তিন বৎসরের বালক নীলরতন ও ক্ষুদ্র শিশু উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে নিয়ে সপরিবারে নন্দলাল জয়নগর গ্রামে আত্মীয়ের গৃহে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। জয়নগরে ছিল নন্দলালের মাতুলালয় এবং শ্বশুরালয়। সুতরাং তিনি জয়নগরেই বাস করতে থাকেন। এইরূপে জয়নগরে অবস্থান কালেই মাতুলালয়ে যোগীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তারপর তাঁর শৈশব কেটেছে জয়নগরের "ধেনুচরা মাঠে" আর "সারাদিন পাখী ডাকা, ছায়ার ঢাকা পল্লীবাটে।" মুক্ত প্রকৃতির উদার অঙ্গনে নীল আকাশের চন্দ্রাতপের তলে অন্যান্য পল্লীবালকদের সঙ্গে নানা বাল্যচপলতার মধ্যে বড় হয়ে উঠতে লাগলেন যোগীন্দ্রনাথ। তাঁর বাল্যকালের বিষয় তিনি যেসব গল্প বলতেন, তার মধ্যে তাঁর পিতামহীর কথাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। যোগীন্দ্রনাথ যখন নিতান্ত শিশু তখন তিনি একবার খাট থেকে মাটিতে পড়ে যান এবং অনেক কষ্টে সেবার তাঁর জীবনরক্ষা হয়। আর একবার সেও নিতান্ত শৈশবেই—তাঁকে ঘরে শুইয়ে রেখে তাঁর পিতামহী (পুকুর থেকে) জল আনতে গেছেন। তাঁর মা তখন কোথায় ছিলেন জানি না। ইতিমধ্যে বৃষ্টি এল এবং ঘরের চালের মধ্য দিয়ে চুঁয়ে সেই জল শিশুর বক্ষে পড়তে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অনেক কষ্টে সেবার তাঁর জীবনরক্ষা হয়েছিল।

ক্রীড়ার সূত্রে তাঁরা গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে যেতেন এবং কখনও বা অন্যের গাছে, কখনও বা বনে আম, জাম, কাঁঠাল পেড়ে খেতেন। নীতিবিদ্ একে চুরি বলতে চান বলুন কিন্তু ঐ বালকেরা তাকে চুরি বলে ভাবতে পারতেন না। শরৎচন্দ্রের "রামের সুমতি"তে রাম যেমন "চোর" অপবাদ শুনে অবাক হয়ে তার বৌদিকে বলেছিল, "একটু তো মোটে নিয়েছি। ওকে কি চুরি করা বলে?" ঐ বালকদেরও আম কাঁঠালের সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে হয়তো সেই উত্তরই পাওয়া যেত। মানুষের জীবনে কোন শিক্ষাই বৃথা যায় না। শৈশবে এমনি অকাতরে পরের জিনিষকে নিজের বলে ভাবতে পেরেছিলেন বলেই উত্তরজীবনে যোগীন্দ্রনাথ কাস্ত নিজের বলে কোন জিনিস রাখতে শেখেন নি। তাঁর যা কিছু ছিল, সবই দশজনের জন্য। তাই বোধহয় আজ দেখছি, তাঁর রচনার উপর থেকেও যেন ব্যক্তির অধিকার লুপ্ত হয়ে গিয়ে তা জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। এ কথায় অর্থ অবশ্য এমন নয় যে তাঁর রচনাগুলিকে যে কেউ নিজের নামে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত করতে পারে। বাজারে তাঁর পুস্তকের এমন দুই একটি নকল দেখেছি, যা চুরির নামান্তর। এই গর্হিত কার্যের স্বপক্ষে ওকালতি করা বাতুলতা। আমার বক্তব্য এই যে বাংলার ঘরে ঘরে তাঁর ছড়াগুলি আবৃত্তি করা হয়ে থাকে—যাঁরা আবৃত্তি করেন,

তাঁরা যে সব সময় লেখকের নাম জানেন, তাও নয়। আবার রবীন্দ্রনাথের "পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য" বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "কী বিচিত্র এই দেশ"এর মত যোগীন্দ্রনাথের "হারাধনের দশটি ছেলে"—এই বাক্যটি আজ কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়েছে।

বর্ণপরিচয়ের সুবোধ বালক গোপালের সঙ্গে বালক যোগীন্দ্রনাথ বা তাঁর অগ্রজদের তুলনা করবার কোনও সুযোগই আমরা তাঁদের কাহিনী থেকে পাই না। নানা-রকম মজার মজার ক্রীড়া উদ্ভাবন এবং অন্যকে উত্যক্ত করে দুষ্টামী করতে বালক যোগীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয় ছিলেন। আবার গ্রামের মধ্যে দুষ্ট বালকদের দলও ছিল একাধিক এবং তারা সকলেই তাঁকে নিজেদের দলভুক্ত করতে চাইত কিন্তু সহজে "ভবী ভুলতেন না।" তাঁর প্রিয় খাদ্য ছিল কচুরি। গ্রামের ছেলেরা তাঁর এই দুর্বলতার সুযোগ নিত অর্থাৎ তাঁকে নিজেদের দলে টানবার জন্য কচুরি খাওয়াবার প্রলোভন দেখাত। একবার এইরকমভাবে দু'দল বালকই তাঁকে দলে টানবার আগ্রহে ক্রমাগত কচুরির সংখ্যা বাড়াতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত যে দল সর্বাপেক্ষা অধিক কচুরি 'ঘুষ' দিতে রাজী হল, তাদের পয়সায় ৩২টি কচুরি খেয়ে এই পেটুক বালক তাদের সঙ্গে "গুণ্ডামী" করতে যেতে রাজী হতেন।

আমরা যখন দাদামশায়কে দেখেছি, তখন তিনি বৃদ্ধ, অথর্ব, জরাগ্রস্ত। তবে তাঁর মুখেই তাঁর বাল্য ও যৌবনের খাবার ক্ষমতার যে গল্প শুনেছি, তা একাধারে কৌতুকাবহ এবং আজকের যুগের পক্ষে প্রায় অবিশ্বাস্য। শুনেছি জয়নগরের মাঠেঘাটে এবং পাড়ায় পাড়ায় দৌরাত্ম্য করে বেড়ানর সময় কখনও কখনও একটি বড় কাঁঠাল খেয়ে তিনি অনায়াসেই হজম করতেন। যখন তিনি যুবক এবং যতদূর সম্ভব তাঁদের পরিবার কলকাতাবাসী, তখন পুরো একটি গঙ্গার ইলিশ মাছ ভাজা জলখাবার হিসাবে তিনি খেয়ে ফেলতেন। এই সময় একবার নাকি তাঁর বড়বৌদি অর্থাৎ অবিনাশচন্দ্র সরকারের পত্নী রান্নাঘরের মধ্যে বসে রুটি সেঁকছিলেন এবং যুবক যোগীন্দ্রনাথ সেইখানে বসে বৌদির সঙ্গে গল্প করতে করতে ৩০।৩২ খানা হাতে-রুটি খেয়ে ফেলেন। আমরা যখন তাঁকে দেখেছি, তখন তিনি অত্যন্ত মিতাহারী কিন্তু তখনও তিনি লোককে খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, নিজে না খেতে জানলে কেউ খাওয়াতেও শেখে না। তেমনই নিজে রসিক না হলে, ধার করে রস পরিবেশন করাও সম্ভব না। তাঁর মত রসিক পুরুষ আজকের দিনে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না।

আমরা যখন নিতান্তই শিশু, দাদামশায়ের গিরিডির বাড়ী গোলকুঠীর সামনে দিয়ে তাঁর এক বন্ধুকন্যা শান্তিমাসী স্কুল যেতেন। ঐ পরিবারের সঙ্গে মামার বাড়ীর পরিবারের খুবই ঘনিষ্টতা ছিল। শান্তিমাসী রোজ বিকেলে স্কুল থেকে ফেরবার পথে গোলকুঠীতে একবার করে আসতেন। একদিন দাদুর নির্দেশে এক কাঠের ময়দামাখা বারকোষকে পিরিচ, একটি পেতলের গামলাকে পেয়ালা ও একটি প্রমাণ সাইজের হাতাকে চামচ বানিয়ে শান্তিমাসীকে চা খেতে দেওয়া হল। অবশ্য গামলাটিতে সত্যি চা ছিল না বলেই মনে হয়। কারণ এক গামলা চা দিলে তাতে তার স্নান হয়ে যেত। যাই হোক, সেদিন এই ব্যাপার নিয়ে যে হাসির হুল্লোড় উঠেছিল, তা আজও মনে পড়ে।

আরও মনে পড়ছে, দিদিমার কোন এক প্রাক্তন শিক্ষককে দেখিয়ে তিনি আমাদের বলতেন, "জান, ইনি আমার teacher- in-law". আর একটি গল্প আমার মার শৈশবের। মা তখন এক ভদ্রলোকের নিকট গান শিখতেন। পরে তিনি বিখ্যাত ওস্তাদ হন। সেই জন্য এই প্রসঙ্গে তার নাম উল্লেখ করলাম না। মাসিক পাঁচ টাকার বদলে ভদ্রলোক শিষ্যাকে সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শিনী করবার ভার নিয়েছিলেন এবং "বাদল ধারা হল সারা বাজে বিদায় সুর" এই একটি গানই বহুদিন ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে

শেখাতেন। দাদু এই ঘটনাটি আমাদের নিকট বলে তাই নিয়ে কৌতুক করতেন। নিজের দুই হাত পিছনে রেখে সুর করে "বাদল ধারা হল সারা" পর্যন্ত গেয়েই সহসা বাম হস্তটি পশ্চাৎ থেকে সামনে এনে কুচকাওয়াজের সময় যে সুরে "attention" বা "সাবধান" বলা হয়ে থাকে, সেই সুরে বলতেন, "দাও পাঁচ টাকা", আমরা তা শুনে হেসে লুটোতাম।

শুনেছি এক সময়ে দাদামশায়ের মাছ ধরবার খুব সখ ছিল। তাঁর বন্ধু অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায়ের একটি দোকান ছিল। সেখানে মাছ ধরবার জন্য 'চার' বিক্রী হত। সেই চারের একটি কৌতুকাবহ নাম ছিল, "ইধার আও।" যোগীন্দ্রনাথ এই কেনা "চার" দিয়ে মাছ না ধরে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় "চার" তৈরী করে তার নাম দিলেন, "উধর মাৎ যাও।"

তাঁর মৃত্যুর পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ দ্বারা আয়োজিত স্মৃতিসভায় সুনির্মল বসু যোগীন্দ্র-চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেই লিখেছিলেন, "যোগীন্দ্র-নাথের সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না তাঁরা হয়ত জানেন না কি রকম সদানন্দ, অমায়িক পুরুষ ছিলেন তিনি। 'হাসি-খুশি'র লেখক লোকটি যে কি রকম হাসিখুশী ছিলেন তার খোঁজ অনেকেই রাখেন না।"

—: o :—

ছোটদের বন্ধু যোগীন্দ্রনাথ

শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

কচি কাঁচাদের ডেকে
ছড়া দিয়ে ছবি এঁকে
তুমিই বসিয়েছিলে
পড়ার খেলায়;
হাসি আর খুসি দিয়ে
পসরা সাজিয়ে নিয়ে
কিশোর সাহিত্যের
প্রভাত বেলায়
ছোটদের দেখা, শোনা,
স্বপ্ন ও কল্পনা,
তাদের মনের মতো
সুমধুর বুলি

সহজ কথায় তার
রূপ দিয়ে মজাদার
শিশুর মনের দ্বার
দিয়ে গেছো খুলি।
শিশুর মনকে গড়া
ছড়া ও ছবিতে ভরা
'হাসিখুসি'-তেই তুমি
চির স্মরণীয়
আরও যত দান তব
অপূর্ব অভিনব।
ছোটোদের প্রিয় বন্ধু
তুমি বরণীয়।

শিশু-সুহৃদ যোগীন্দ্রনাথ

কিরণকুমার রায়

প্রাপ্তবয়স্কদের অফিস-কাচারী, লাভলোকসান, স্বার্থদ্বন্দ্ব, দায়-দায়িত্বের জগৎ থেকে একেবারে আলাদা সম্পূর্ণ ভিন্ন জগৎ শিশুদের। মিনি বেড়ালের ম্যাঁ শব্দ সেখানে হাসির উৎস, কুকুর ছানার মিটিমিটি চাউনি কৌতুকের ভাণ্ডার, সেখানে সরল পবিত্রতা আর অফুরন্ত বিস্ময়। বড়দের সেখানে যেতে গেলে গুরুগম্ভীর চালটা ফেলে যেতে হবে, সেখানে ছোটদের রঙ্গে নিজেদের মন রাঙাতে হবে। সেটি সুলভ নয় বলেই সার্থক শিশু-সাহিত্য রচয়িতা সব দেশেই দুর্লভ। যোগীন্দ্রনাথ সরকার ছিলেন সেই দুর্লভ মানুষ; তদুপরি তিনি আরেকটি বিরল সম্মানের অধিকারী। বাংলা ভাষায় তিনি শিশুরঞ্জন সাহিত্যের পথিকৃৎ, শুধু রূপকার হিসেবে নয়, সম্প্রচারক হিসেবেও।

কয়েকটি সামান্য রূপরেখায় পরিচয় দিতে গেলে সম্ভবত বলতে হবে: বাংলা শিশু-সাহিত্যের জনক স্কুল বুক সোসাইটী ও বিদ্যাসাগর; পথিকৃৎ যোগীন্দ্রনাথ; স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায় দক্ষিণারঞ্জন প্রভৃতি। আধুনিক যুগ পুষ্টির কাল।

দেড়শ বছর আগে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটী প্রকাশ করেন 'নীতিকথা' (১৮১৮)। বাংলা ভাষায় এটি প্রথম শিশুসাহিত্য হলেও বড়দের দৃষ্টিকোণ উৎসারিত উপদেশ মালার উপরে উঠতে পারেনি বইটি। বিদ্যাসাগর বাংলা শিশুসাহিত্যের জনক। তিনি শিশুর বর্ণ-পরিচয় ও কিশোর মনোরঞ্জনের বই সর্ব-প্রথম উপহার দিয়েছেন বাংলা ভাষায়।

কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের নীরস জগৎ থেকে শিশুগণকে আনন্দলোকে নিয়ে এসেছেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার। বিদ্যাসাগর মশায়ের মৃত্যুর ছয় মাস আগে পঁচিশ বছরের যুবক যোগীন্দ্রনাথ প্রকাশ করলেন 'হাসি ও খেলা'। তার প্রথম লেখাটি ছিল 'হাসি ও কান্না'—হা-হা সকাল হয়েছে! বাঃ কেমন সুন্দর সকাল! হা-হা কি মজা! কি মজা! কি মজা! হুঁ—আবার সকাল হল কেন? হুঁ—এখনি পড়তে বসতে হবে। হুঁ—উ! ও—মা—আ আ—অ!

তিনটি শিশুর দু-সারি হাসি এবং কান্নার ছবি দিয়ে দুভাগে বিভক্ত হয়ে ছাপা হয়েছিল এই লেখাটি। সারা বইটির পাতায় পাতায় অজস্র সুন্দর ছবি। গদ্য পদ্য আর ছবি নিয়ে পুরো বইটি মুদ্রিত। সেকালে এরকম বই একেবারে অভিনব। লেখকের সংশয় ছিল বইটির জনপ্রিয়তা সম্পর্কে। ভূমিকায় লিখেছিলেন: "আমাদের দেশে বালক-বালিকাদিগের উপযোগী স্কুল পাঠ্য পুস্তকের নিতান্ত অভাব না থাকিলেও গৃহপাঠ্য ও পুরস্কার-প্রদানযোগ্য সচিত্র পুস্তক একখানিও দেখা যায় না। এই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিবার জন্য 'হাসি ও খেলা' প্রকাশিত হইল। সাধারণের উৎসাহ পাইলে শীঘ্রই 'হাসি ও গল্প' নামে আরও একখানি সচিত্র গৃহপাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।"

অত্যন্ত অল্পকাল মধ্যেই প্রথম সংস্করণ দু হাজার কপি নিঃশেষ হয়ে গেল। উৎসাহিত যোগীন্দ্রনাথ বার করলেন এ বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ছবি ও গল্প'। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, ধাঁধা, বিজ্ঞান ও জ্ঞানভিত্তিক সরস রচনা এবং শিশু মনোরঞ্জক অসংখ্য ছবি—বাংলা ভাষায় সার্থক শিশু-সাহিত্যের জয়যাত্রা শুরু হল। তখনও

যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন সিটি স্কুলের শিক্ষক। এবার তিনি জীবিকার নাগপাশ ছিন্ন করে জীবনের সারস্বতরূপকেই প্রাণধারণের অবলম্বন করার অনুপ্রেরণা পেলেন।

যোগীন্দ্রনাথের প্রথম বইটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকায় (১৮৯৪) মন্তব্য লেখেন : "বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। ছেলেদের জন্য যে সকল বই আছে তা স্কুলে পড়িবার বই। তাহাতে স্নেহের বা সৌন্দর্যের লেশমাত্র নাই। তাহাতে যে পরিমাণ উৎপাড়ন হয়, সে পরিমাণে উপকার হয় না।...আপাততঃ ছেলেদের ইচ্ছাপূর্বক ঘরে পড়িবার বই রচনা করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে, নতুবা বাঙ্গালী ছেলের মানসিক আনন্দ ও স্বাস্থ্যানুশীলনের এবং বুদ্ধিবৃত্তির সহজ পুষ্টি সাধনের অন্য উপায় দেখা যায় না।...যোগীন্দ্রবাবু শিশুদিগের পিতামাতার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।'

কয়েক বছর পর যোগীন্দ্রনাথ প্রকাশ করলেন 'হাসি-খুশি' প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ। অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে এবং হারাধনের দশটি ছেলে ঘোরে পাড়াময় ইত্যাদি সরস ছড়ায় যোগীন্দ্রনাথ শিশুদের বর্ণমালা সংযুক্তবর্ণ ও অঙ্কের সংখ্যা শেখালেন। আনন্দের মধ্য দিয়ে তিনি শিশুদের জ্ঞানের সিঁড়িতে পৌঁছে দিলেন। ছড়ার যাদু আর ছবির মধু মিলে শিশু-জগতের এক নতুন যুগ শুরু হল। এরপর অনেক অনুকরণ হয়েছে; কিন্তু যোগীন্দ্রনাথ শুধু সাহিত্য-পথিক নন, তিনি ঐতিহ্যের স্রষ্টা। তাঁর নাম হয়ত জানে না কিন্তু এখনো বাঙালী মায়েরা তাঁরই ছড়া গুণগুনিয়ে গান করে : "ধন ধন ধন, বাড়িতে ফুলের বন! এ ধন যার ঘরে নেই, তার কিসের জীবন।" অথবা : "আয় রে আয় টিয়ে নায়ে ভরা দিয়ে! না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে, তা দেখে ভোঁদড় নাচে। ওরে ভোঁদড় ফিরে চা, খোকার নাচন দেখে যা!"

বাংলা ভাষায় "ননসেনস রাইমের" স্রষ্টাও যোগীন্দ্রনাথ। 'হাসিরাশি'তে তিনি লিখলেন আজগুবি কবিতা—'মজার মুল্লুক'।

এক যে আছে মজার দেশ
সব রকমে ভালো
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ
দিনে চাঁদের আলো!

শুধু মজার ছড়াই নয়, সঙ্গে মজার ছবি। ছেলেদের মন মজাতে শুধু কথা নয়, ছবিও যে অত্যাবশ্যক, এ মন্ত্র জানতেন যোগীন্দ্রনাথ। তাই যোগীন্দ্রনাথ মন্ত্রমুগ্ধ করতে পেরেছিলেন শিশুজগৎকে।

সেকালে শিশু-সাহিত্যের প্রকাশক হবার মত মনের বল ব্যবসায়ীদের প্রায় ছিল না। তাই যোগীন্দ্রনাথ নিজেই প্রতিষ্ঠা করলেন (১৮৯৬) 'সিটি বুক সোসাইটী'। এই গ্রন্থালয় থেকে তিনি নিজের বই ছাড়াও উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলদারঞ্জন রায়, অমৃতলাল গুপ্ত, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রভৃতি তৎকালীন শক্তিশালী শিশু-সাহিত্যিকদের বহু গ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলা ভাষায় শিশু ও কিশোর মনোরঞ্জক সাহিত্যের পুষ্টি ও প্রসার করেছেন।

একাত্তর বছর বেঁচেছিলেন যোগীন্দ্রনাথ। হাসিখুশি সুখে-দুঃখে সমান তুষ্ট মানুষটি রচনায় যেমন, জীবনেও তেমনি ছিলেন শিশু-মনোহর সুহৃদ। তাঁর জন্মশতবর্ষ আজ পূর্ণ হল। যুগে যুগে বাঙালী শিশুর মনোজগতে তিনি চিরজীবী হয়ে থাকবেন।

—:•:—

পথিকৃৎ যোগীন্দ্রনাথ সরকার

রোহিত রায়

যোগীন্দ্রনাথ সরকার পথিকৃৎ। পথিকৃৎ বাংলা শিশুসাহিত্যে এবং শিক্ষাজগতে। তিনিই প্রথম ছড়ার সাহায্যে বর্ণপরিচয়মূলক গ্রন্থ রচনা করেন, তিনিই প্রথম শিশুগ্রন্থে চলিত বাংলা ব্যবহার করেন, তিনিই প্রথম ছোটদের জন্যে বাংলা লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে চয়ন করে ছড়া সংকলন করেন, তিনিই প্রথম উদ্দীপক সংগীত সংকলন করেন, তিনিই প্রথম সংখ্যা গণনা শিক্ষা দেবার জন্য ছড়া রচনা করেন, তিনিই প্রথম 'গৃহপাঠ্য ও পুরস্কারপ্রদানযোগ্য' শিশুগ্রন্থ রচনা করেন, তিনিই প্রথম ছোটদের উপযোগী রামায়ণ-মহাভারত রচনা করেন, তিনিই প্রথম বাস্তবানুগ চিত্র অক্ষর পরিচয়ের উপায়রূপে গ্রহণ করেন, তিনিই প্রথম জানা দিয়ে অজানাকে, পরিচিত দিয়ে অপরিচিতকে শিক্ষাদানের জন্য ছোটদের গ্রন্থ রচনা করেন এবং তিনিই প্রথম বন্য ও গৃহপালিত পশু-পক্ষী-জীবজন্তুর সঙ্গে ছোটদের নিবিড়ভাবে পরিচয় করিয়ে দেন তাঁর শিশুচিত্তজয়ী অক্ষয় গ্রন্থগুলির মাধ্যমে।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার বাংলা সাহিত্যে এক উজ্জ্বল, স্মরণ্য নাম। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান এবং ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখ্য। তিনি বাংলা শিশুসাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তক। বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের পর নতুন এক যুগের (১৮৯১-১৯১৮) প্রবর্তন করেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার। একদা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে—সহজ কথায় যায় না লিখা সহজে।' —যোগীন্দ্রনাথ সরকার সহজ কথা সহজে লিখে এই দুরূহ সাহিত্যকর্ম সম্পাদন করেছিলেন।

আজ থেকে একশো বছর আগে ১২৭৩ সালের ১২ই কার্তিক (ইং ১৮৬৬) চব্বিশ পরগণা জেলার জয়নগর-মজিলপুর গ্রামে মামার বাড়ীতে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের জন্ম হয়। পৈতৃক নিবাস যশোহর। পিতা নন্দলাল এবং মাতা থাকমণির অষ্টম সন্তান যোগীন্দ্রনাথ। যোগীন্দ্রনাথের অপর কৃতী ভ্রাতা হলেন খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ নীলরতন সরকার।

গ্রাম্যপ্রকৃতি উদার উন্মুক্ত পরিবেশে ছোটবেলা থেকেই যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন কল্পনাপ্রবণ এবং ভাবুক প্রকৃতির। সংসারের আর্থিক অস্বচ্ছলতাহেতু যুবককাল অবধি তাঁর জীবন খুবই দুঃখে কাটে। কলকাতা সিটি স্কুল থেকে এনট্রান্স্ পাশের পর এই স্কুলেই তিনি শিক্ষকতার পথ নেন। এই সময় তিনি তৎকালীন কলকাতার জ্ঞানীগুণীদের সংস্পর্শে আসেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রী গিরিবালা দেবী আজও জীবিতা আছেন। অল্পদিনের মধ্যেই যোগীন্দ্রনাথ শিক্ষকতা ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে বইয়ের ব্যবসা সুরু করেন। ১৮৯৬ সালে তিনি কলকাতার বইপাড়ার কলেজ ষ্ট্রীটে সিটি বুক সোসাইটি নামে গ্রন্থ-প্রকাশনী খোলেন, আজও তা বিদ্যমান। তাঁর হাতের লেখা ছিল খুব সুন্দর, তিনি ছবিও আঁকতে পারতেন। মাছধরায় ছিল তাঁর অদ্ভুত সখ। শেষজীবনে তিনি অবশাঙ্গ হয়ে গিরিডিতে কাটান। সেখানেই তিনি ১৯৩৭ সালে পরলোকগমন করেন।

যোগীন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনের উন্মেষ হয় ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত ভিখারীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'কবিতা-কণিকায়। তখন তিনি বালকমাত্র। তারপর একে একে তাঁর কৌতুকস্নিগ্ধ শিশুরচনাগুলি প্রকাশ হতে থাকে তৎকালীন শিশু পত্রিকাগুলিতে। ভুবনমোহন রায় সম্পাদিত 'সাথী' পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা থেকে তিনি

লিখতেন। এছাড়া তিনি লিখিতেন 'সখা ও সাথী' 'মুকুল' এবং 'শিশু' পত্রিকায়। যোগীন্দ্রনাথের প্রথম শিশুগ্রন্থ 'জ্ঞানমুকুর' (১৮৯০ সাল)। জানুয়ারী ১৮৯১ সালে তার দ্বিতীয় গ্রন্থ 'হাসি ও খেলা প্রকাশিত হল।

রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'র (ফাল্গুন ১৩০১) লিখেছেন: বইখানি ছোট ছেলেদের পড়িবার জন্য। বাংলাভাষায় এরূপ গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। ছেলেদের জন্য যে সকল বই, তাহাতে স্নেহের বা সৌন্দর্যের লেশমাত্র নাই তাহাতে যে পরিমাণে উৎপীড়ন হয় সে পরিমাণে উপকার হয় না। * * * আপাততঃ ছেলেদের ইচ্ছাপূর্বক ঘরে পড়িবার বই রচনা করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে নতুবা বাঙালীর ছেলের মানসিক আনন্দ ও স্বাস্থ্যানুশীলনের এবং বুদ্ধিবৃত্তির সহজ পুষ্টিসাধনের অন্য উপায় দেখা যায় না। হাসি ও খেলা বইখানি সংকলন করিয়া যোগীন্দ্রবাবু শিশুদিগের এবং শিশুদিগের পিতামাতার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।' রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখলেন: 'বাংলাতে এরূপ গ্রন্থের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। যোগীন্দ্রবাবু বাঙ্গালীর মধ্যে এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পথপ্রদর্শক।' সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখলেন: 'এরূপ পুস্তক বাংলা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। যোগীন্দ্রবাবু অধ্যবসায় বলে সাহিত্যের এই নূতন বিভাগে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন।' আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখলেন: 'বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এই বই স্থান পাইবে।'

১৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৭ প্রকাশিত হয় তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ 'হাসিখুসি' (১ম)। আজ অবধি এই গ্রন্থের ১০৪টি সংস্করণ হয়েছে।

যোগীন্দ্রনাথ বাংলা লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে সযত্নে সংগ্রহ করে 'খুকুমণির ছড়া' বের করেন (১৩০৬)। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গজনিত স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর সংকলিত দেশাত্মবোধক উদ্দীপক সংগীত সংগ্রহ 'বন্দেমাতরম' (৫-৯-১৯০৫)। ভূমিকা লিখে দেন সখারাম গণেশ দেউসকর।

যোগীন্দ্রনাথ রচিত শিশুগ্রন্থের সংখ্যা ৩৭। আজ অবধি তাঁর গ্রন্থের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং ভবিষ্যতেও হবে। তাঁর গ্রন্থ বিলুপ্ত হবার নয়। তাই যোগীন্দ্রনাথ কালজয়ী এবং যুগ-যুগান্তের জনপ্রিয় শিশু-সাহিত্যিক।

—: 0 :—

পরমপুরুষ যোগীন্দ্র

শ্রীসুধাংশু চৌধুরী

শিশু মনের পরম পুরুষ
হে যোগি, যোগীন্দ্রনাথ,
কাব্য-সুধায় মধুর ছন্দে
করেছো যে আলোকপাত
সেই আলোকের দীপ্তি প্রভায়
সিক্ত করি শিশুমন,
কাব্য তোমার অমর হলো
তুমি হ'লে চিরন্তন॥
শতেক বর্ষ পার হলো আজ
কমেনি যোগীন্দ্র-প্রীতি,
কচি মনের জীবন-খাতায়
আজো তোমার পরিচিতি।
হাস্যে-লাস্যে ছন্দে- গানে
সুর আর মধুরতায়,
দামাল ছেলে আজো ডোবে
'হাসিখুসি'র পাতায় পাতায়।
তোমার স্মৃতি স্মরণ করি
বরণ করি বারংবার,
শিশু মনের দরদী বন্ধু,
'লহ নবীনের নমস্কার॥

শিশু-সাহিত্যের তীর্থঙ্কর যোগীন্দ্রনাথ

শ্রীনিখিল রঞ্জন রায়

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তথাকথিত শিশু-সাহিত্যের স্রষ্টা হিসেবে যাঁরা অক্ষয় খ্যাতি অর্জন করে গেছেন "হাসি-খুশির" রচয়িতা যোগীন্দ্রনাথ সরকার নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম। "অ-এ অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে, ইঁদুর ছানা ভয়ে মরে, ঈগল পাখি পাছে ধরে" ইত্যাদি ছড়াগুলি আজ কতদিন ধরেই না লক্ষ লক্ষ অস্ফুট-বোল বাঙালী শিশুকে ছন্দের দোলায় দুলিয়ে অক্ষর বিদ্যা তথা সাহিত্য-পাঠের প্রথম দীক্ষা দিয়েছে। অগণিত বাঙালী ছেলেমেয়ের হাতেখড়ি হয়েছে যোগীনবাবুর "হাসি-খুশির" সান্নিধ্যে। কেবলমাত্র জন-বল্লভতার তৌলে পরিমাপ করলেও যোগীনবাবুর "হাসি-খুশির"—"কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি, খেঁকশিয়ালী পালায় ছুটি" আর মদন মোহন তর্কালঙ্কারের "পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল"—বোধ হয় বাংলা ভাষায় সর্বাধিক জনপ্রিয় ও প্রচারিত ছড়া। ইংরাজী ভাষায় Nursery Rhymes and Lullabies আছে প্রচুর। ইংরাজী সারা বিশ্বের ভাষা, তাই অসংখ্য ছেলেভুলানো ইংরাজী ছড়া পৃথিবীর নানা ভাষা-ভাষী মানুষের কাছে সমাদৃত।

যোগীনবাবুর "হাসি-খুশি", "হাসিরাশি", 'রাঙাছবি' "হিজিবিজি" ইত্যাদি ছড়ার বই আর বনেজঙ্গলে, পশুপক্ষী জীবজন্তু ইত্যাদি সুখপাঠ্য রচনাগুলিও যতদিন বাংলাভাষা থাকবে ততদিনই পাঠকের চিত্তবিনোদন করবে। আমরা "তথাকথিত শিশু সাহিত্য" কথাটা ব্যবহার করি—একটা বিশেষ কারণে। সাহিত্যের একটা মামুলী শ্রেণী বিভাগে আমরা এক শ্রেণীর সাহিত্যকে শিশু-সাহিত্য আখ্যা দিয়ে থাকি। কিন্তু এই আখ্যাটা কতদূর যুক্তিসিদ্ধ তা বিচার করা যেতে পারে। প্রকৃত পক্ষে শিশু-সাহিত্য কথাটা কিছুটা ভ্রান্তিমূলক। প্রথমতঃ শিশু সাহিত্যের স্রষ্টা শিশু নয়। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষই তথাকথিত শিশু-সাহিত্যের স্রষ্টা বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, যোগীন্দ্রনাথ প্রমুখ সকলে পরিণত বয়সেই শিশু-সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। জগদ্বিখ্যাত কিশোর-গ্রন্থ "রবিনসন ক্রুসো" লিখেছিলেন ড্যানিয়েল ডিফো যখন তাঁর বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় যে যদি কোন প্রতিভাধর শিশু সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয় তবে সে নিশ্চয়ই শিশু-সাহিত্য রচনা করবে না। সে নিশ্চয়ই চেষ্টা করবে তার শিশুত্বকে জাহির না করে, সে যে তার "বাবার মতই বড়" তারই প্রমাণ দিতে। শিশু ভাবে যে সে ত মস্ত বড়। তাকে কেউ ছোট মনে করলে শিশু স্বভাবতই ক্ষুব্ধ ও অভিমানহত হয়। কাজেই শিশু দ্বারা শিশু-সাহিত্য রচনা আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষের মনের শিশুটা কখনো একেবারে বুড়িয়ে যায় না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পরিবেশ ও পরিস্থিতির আবরণ-আবর্জনার অন্তরালে নির্মল শিশু মনটি ঢাকা পড়ে থাকে। মানুষ হয়ে উঠে পাকা ও প্রবীন, বিষয়ী ও বস্তুবাদী। কিন্তু যিনি তাঁর বয়সের আধিক্য সত্ত্বেও অবোধ শিশুমনের সরলতা, মূঢ়তা ও আনন্দ প্রবণতা হারিয়ে ফেলেন না তিনিই প্রকৃত মহাত্মা। প্রৌঢ়ত্বের গাম্ভীর্য ও বার্ধক্যের স্থবিরতা ভেদ করেও শিশুর অকারণ অকৃত্রিম হাসির ঝিলিক জেগে উঠে তাঁর কণ্ঠে, মুখমণ্ডলে জাগে আনন্দের আভা। তিনি নিজেকে শিশুর সমান মনে করেন। চুলের পাক আর চামড়ার লোলতা সত্ত্বেও সে চির-তরুণ বুড়ো মানুষটা পাড়ার সব ছেলে-মেয়েদের সমবয়সী। বিষয়কাজের মাকড়সার বিষয়জালে বাঁধা চশমাপরা সেই বুড়ো ঠাকুরদাদা বলেন :—

"আমার ছুটি সেজে বেড়ায় তোমার ছুটির সাজে,
তোমার কণ্ঠে আমার ছুটির মধুর বাঁশি বাজে"।

কেউ কেউ বলেন যে তারুণ্য হল মনের একটা বিশেষ অবস্থা। বার্ধক্যও তাই।

"Old age is a mental habit which a busy man hardly finds time to acquire".

আবার যা সার্থক শিশু-সাহিত্য তা যেমন শিশুর প্রিয় তেমনি বড়োদের কাছেও সমান আদরণীয়।

পৃথিবীর শিশু-সাহিত্যের যাঁরা চিরস্মরণীয় স্রষ্টা যেমন ডেনিশ সাহিত্যের হ্যান্স্ ক্রিশ্চান হ্যাণ্ডারসন, "এলিস্-ইন-ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ডের" ছদ্মনামা লেখক লুই ক্যারল, "টম্ সোয়েয়ারের" রচয়িতা মার্ক টোয়েন, "পিটার প্যান এণ্ড ওয়েণ্ডীর" লেখক জে, এম্‌ব্যারী প্রমুখ সাহিত্যে যে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন তা কেবল শিশুদের জন্যই নয় শিশুদের মা-বাবাদের জন্যও বটে। তাই সার্থক শিশু-সাহিত্য এমনি জিনিস—যা কি ছোট কি বড়ো সবারই প্রিয়। যোগীন্দ্রনাথের রচনাগুলি সে দিক দিয়েও যে সার্থক ও সিদ্ধকাম রচনা সে বিষয়ে কোন তর্কের অবকাশ নেই। তথাকথিত শিশু-সাহিত্যিক বললে যোগীন্দ্রনাথের মহান কীর্তি ও গৌরবকে যেন ক্ষুণ্ন ও খণ্ডিত করা হয়। তিনি এক মহান শিল্পী মহাত্মান রাজা রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি যে সাহিত্য-সাধনা ও সৃষ্টির ধারা চলে এসেছে, যে সাধনার ফলশ্রুতি আমাদের শ্রেষ্ঠ গৌরব মাতৃসমা বঙ্গভাষার পরিপূর্ণ ফসলের ডালি,—যোগীন্দ্রনাথ সেই সাধক গোষ্ঠিরই অন্যতম।

জন্ম তাঁর ১৮৬৬ সন। ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে গত শতকের ৬০ এর কাছাকাছি সময়টা বাঙালী তথা ভারতীয়ের জীবনেতিহাসে যেন এক মহা জন্মের পুণ্যলগ্ন। একটা সুপ্তোত্থিত জাতির যত জিজ্ঞাসা, যত সমস্যা, যত দৈন্য, যত অভাব, যত দাবি সব কিছুর সমাধানের দায়-দায়িত্ব নিয়ে এই সময়টাতে এমন সব মানুষ আমাদের মধ্যে এলেন যাঁদের নানামুখী চিন্তা ও কর্ম এই অধঃপতিত দেশকে আবার জগৎ সভায় গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করল। যে বিশেষ কর্ম-ক্ষেত্রটি সাহিত্য-সাধক যোগীন্দ্রনাথ বেছে নিয়েছিলেন, এবং যে সাধনায় তাঁর সমুদয় শক্তি ও সঙ্গতি নিয়োজিত করেছিলেন, তাকে কেবল শিশু-সাহিত্য বললে সবটুকু বলা হয় না। জাতির বৈচিত্রময় নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃত্ হচ্ছেন যোগীন্দ্রনাথ। জীবনের মহান ব্রত উদ্‌যাপনে যোগীন্দ্রনাথ যে পথটি বেছে নিয়েছিলেন তা হচ্ছে ছোটদের জন্য স্বল্প কথায়, সহজ কথায় ও সুললিত ছন্দে ছড়া রচনা। "ছেলে ভুলানো ছড়া" প্রবন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদী এল বান" এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহমন্ত্রের মতো ছিল এবং সেই মোহ এখনো আমি ভুলিতে পারি নাই। আমি আমার সেই মনের মুগ্ধ অবস্থা স্মরণ করিয়া না দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিব না ছড়ার মাধুর্য এবং উপযোগিতা কী। বুঝিতে পারিব না, কেন এত মহাকাব্য খণ্ডকাব্য, এত তত্ত্বকথা এবং নীতিপ্রচার, মানবের এত প্রাণপণ প্রযত্ন, এত গলদ্‌ঘর্ম ব্যায়াম প্রতিদিন ব্যর্থ এবং বিস্মৃত হইতেছে, অথচ এই সকল অসংগত অর্থহীন যদৃচ্ছাকৃত শ্লোকগুলি লোক স্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। এই সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে।"

"ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা প্রথা-অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে ; সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারম্বার মানবের ঘরে শিশু মূর্তি ধরিয়া জন্ম গ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার, যেমন মূঢ়, যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন ; কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলিও শিশু-সাহিত্য ; তাহারা মানব মনে আপনি জন্মিয়াছে।"

তাই দুজ্ঞেয় রহস্যময় শিশুর চিত্তজগতে অনুপ্রবেশ করলেন যোগীন্দ্রনাথ ছড়া ও গল্পের সাহায্যে। রবীন্দ্রনাথেরই কথায় শিশুর দেহপুষ্টির জন্য যেমন চাই দুধ ভাত, তেমনি মানসিক বিকাশের জন্য চাই গল্প। শিশু মনের কাছে বাস্তব-অবাস্তবের বোধ নাই। তার অবাধ কল্পনায় সবই বাস্তব, সবই সত্যি। নানা অবাস্তব ও আজগুবি কল্পনা কাহিনীর মধ্য দিয়েই শিশুর প্রথম প্রবেশ ঘটে রসের মহলে। শিক্ষার তিন মহল—তত্ত্বের মহল, তথ্যের মহল ও রসের মহল। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রথম দু'মহলের প্রাধান্যই বেশী। তত্ত্ব আর তথ্য নিয়েই শিক্ষাবিদ্‌রা ব্যস্ত। নীরস তত্ত্ব আর তথ্যেই শিক্ষার্থীর মন হয়ে পড়ে ভারাক্রান্ত। শিক্ষা জিনিসটা যে একটা আনন্দময় ও পরম উপভোগ্য অভিজ্ঞতা সে কথা প্রায় আমরা বিস্মৃত হই। অথচ শিক্ষা-মনস্তত্ত্বের একটা বড় কথাই হল এই যে, যে জিনিস আমরা আনন্দের মধ্য দিয়ে শিখি সেই হল পাকা ও প্রকৃত শিক্ষা।

যোগীন্দ্রনাথ শিক্ষা-বিজ্ঞানের এই মূল নীতি অনুসরণ করে গেছেন তাঁর অনুপম রচনাবলীতে। যোগীন্দ্রনাথের লেখার যে কয়টি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে তার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। অনেক কথা বললেই ভালো করে বলা হয় না। ভালো করে বললেই ভাল বলা হয়। শিশুরা একবারে অনেক কথা বুঝতে পারে না, শুনতেও চায় না, পড়তেও চায় না। তাদের কাছে যে কথা বলার তা বলতে হবে ভালো করে। যোগীন্দ্রনাথের লেখার অল্পকথায় অনেক কিছু বলার অতি সুন্দর ও সার্থক প্রয়াস দেখা যায়। একটি ছবি হাজারো কথার সমান। ছবি ও অল্প দু'চারটি কথার সাহায্যে যোগীন্দ্রনাথ শিশু চিত্তজয়ী যে ছড়াগুলি রচনা করেছেন তার তুলনা নাই।

মুখোমুখি দু'টো কুমির। মাঝখানে একটা সাপ। এই নিয়ে দু'টি তিনটি ছবির সঙ্গে অল্পকথার ছড়া সাজিয়ে একটা দু'তিন পৃষ্ঠার গল্প উপহার দিয়েছেন শিশু-পাঠককে।

আমি খাব কি তুমি খাবে ?
একটু পরেই দেখতে পাবে।
ফুরিয়ে গেল সব চালাকি,
লেজটা কেবল একটু বাকি।

* * * * *

হাঁস আর দুষ্ট খেঁকশিয়ালের গল্প :
যাদু আজ পালাবে কোথা
ঘাড়টি আগে ভাঙব তবে চিবিয়ে খাব মাথা
কি হে সইলনা যে টান,
উল্টাবাজী খেয়ে শেষে জলেই চিৎপটাং।

এ রকম অজস্র ছবি-ছড়ার গল্পে যোগীন্দ্রনাথের লেখা বইগুলি সমৃদ্ধ। আজকাল হাসি-খুশির অক্ষম অনুকরণে লিখিত মেলা রংচঙে শিশু-পাঠ্য বই বাজারে প্রচলিত। কিন্তু এই অনুকৃত লেখাগুলির না আছে সুর, না আছে ছন্দ না আছে কোন অর্থ-সঙ্গতি। সত্যিকারের non-sense verse কিন্তু একেবারে sense রহিত নয়। Non-sense এরও একটা বিশেষ sense থাকে। যোগীন্দ্রনাথের লেখা ছড়াগুলির কল্পনা যতই অদ্ভুত হোক না কেন, প্রত্যেকটিই একটা বিশেষ অর্থ বাচক।

"এক যে ছিল মজার দেশ
সব রকমে ভালো,
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ
দিনে চাঁদের আলো।"

শিশুর কাছে কোন জিনিসকে উল্টো করে বললেই শিশু তার প্রতিবাদ করবে। যদি তার হাতটাকে রহস্য করে বলি পা, সে তক্ষুণি বলবে "ধ্যেত, তুমি কিচ্ছু জান না, তুমি বোকা।" উল্টো করে বলে ঠিক জিনিসটাকে তার মনে গেঁথে দেওয়াই উপরোক্ত ছড়াটার উদ্দেশ্য।

ন্যায়গুণাকর ভারতচন্দ্র আর গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্রের, বহু রচনাই জনপ্রিয়তার প্রসাদগুণে বাংলা প্রবচনে পরিণত হয়েছে। যোগীন্দ্রনাথের কিছু কিছু ছড়াও তেমনি আজ মুখে মুখে প্রচলিত। "হারাধনের দশটি ছেলে" একের পর এক মরে গিয়েও আজ বাংলা প্রবচনে পরিণত হয়ে অমরতা লাভ করেছে।

শিশুমনকে বুঝা এবং শিশুর কাছে কি কথা কি ভাবে বললে শিশু তা আনন্দের সংগে গ্রহণ করবে যোগীন্দ্রনাথ তা ভালভাবেই জানতেন। এটা তাঁর সহজাত প্রতিভা। এ জিনিস কোন প্রশিক্ষণ বা পদ্ধতির সাহায্যে শেখা যায় না। অবোধ শিশুর মনের অব্যক্ত কথাটি বুঝতে পারা বড় সহজ কথা নয়। যোগীন্দ্রনাথ এ অসাধ্য সাধন করেছিলেন। তাঁর রচনাগুলি তাই এত সহজ, স্বাভাবিক ও সুন্দর। তাঁর সৃজন যেন প্রকৃতির সৃজন! তাঁর এই অসামান্য প্রতিভার মূল্যায়নে বলা যায় একটি মাত্র কথা:

"যে পারে সে আপনি পারে,
পারে সে ফুল ফোটাতে।"

—:০:—

যোগীন্দ্রনাথ

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

তুমি এনেছিলে শিশুদের মনে
খুশীর ঝর্ণাধারা
ছড়িয়ে ছিটিয়ে কথার শ্রাবণ
আনন্দে মাতোয়ারা।
তোমার ছড়ায় ভরিয়ে রেখেছো
প্রতিটি শিশুর প্রাণ
একশ বছর পার হয়ে গেছে
তারা আজও অম্লান।

তুমি জেগে রবে প্রতিটি শিশুর
ফুলকচি অন্তরে
তুমি বন্দিত অভিনন্দিত
বাংলার ঘরে ঘরে।
মজার দেশের মধুর কাহিনী
কোনদিন ভুলব না
আঁকি হৃদয়ের পর্ণ কুটিরে
স্মরণের আলপনা।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

নবেন্দু সেন

"ওরে বাবারে গেলাম রে—বলিয়া নিতাই হঠাৎ মহালয়ার দিন চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে। কারণ কি জানিবার জন্য সকলে ব্যগ্র হইয়া দৌড়িয়া আসিল। আসিয়া দেখে নূতন জুতা লইয়া নিতাই বিব্রত। চকচকে বার্ণিশ চামড়া দেখিয়া মোহিত হইয়া নিতাই চীনের দোকানে এক জোড়া জুতা কিনিয়াছেন।......। আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে বাটিতে আসিয়া...দেখেন মহা-বিভ্রাট। কিছুতেই জুতা পায়ে হয় না। কত ধবস্তাধবস্তি কিছুতেই পায়ে ঢোকে না। শেষে নিরাশপ্রায় হইয়া দাঁতমাঁত খিঁচাইয়া 'লক্ষীছাড়া চীনেম্যান' বলিয়া গালি দিতে দিতে জুতার মুখটা সজোরে ফাঁক করিয়া উহার ভিতরে পা-টা ঠেলিতে লাগিলেন। হায়! হায়!...অমন খাসা জুতা পড়্ পড়্ করিয়া ছিঁড়িয়া গেল।"

কেশব সেনের 'বালকবন্ধু' (১৮৭৮) শিশু-পাক্ষিকের গল্প এটি। 'বালক বন্ধু' উনবিংশ শতকের প্রথম শিশু-পাক্ষিক তো বটেই, সর্বপ্রথম আদর্শ শিশু-পত্রিকাও। ইতিপূর্বে বাংলা শিশুসাহিত্য বলতে যে বিষয়টি বোঝায় তা ঠিক ছিলনা। প্রচলিত ছড়া, রূপকথা, উপকথা, ঘুমপাড়ানিগান, ধাঁধাঁ, ব্রতকথা বা পঞ্চতন্ত্রের ও হিতোপদেশের গল্পগুলি হয় লোকসাহিত্যের অন্তর্গত নয় সংস্কৃত থেকে নেওয়া নীতি, উপদেশ। 'স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭) থেকে প্রকাশিত একাধিক গ্রন্থে, এবং ১৮১৮'র 'দিগদর্শনে'র সময় থেকে প্রায় অর্দ্ধশত বৎসর পর্যন্ত যে বহু সংখ্যক শিশুপাঠ্য রচনার প্রয়াস লক্ষিত হয় তাও প্রকৃতপক্ষে শিশু সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত নয়। সম্ভবত তার কারণ এ সকল গ্রন্থগুলি মূলত বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ছিল। ছাত্র পাঠ্যপুস্তক ও শিশু-সাহিত্যের মধ্যে যে রসগত পার্থক্য, তখনো তা দূরীভূত হয়নি। শিক্ষার উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টা অতিক্রম করে বিমল আনন্দদানোপযোগী শিশু মনোরঞ্জনের কোন ব্যবস্থা সাহিত্যের জগতে তখনো হয়ে ওঠেনি। সে জন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছিল 'বালক বন্ধু' (১৮৭৮) পর্যন্ত। 'বালক বন্ধু'র পৃষ্ঠাতেই প্রথম "ঝক ঝকে নূতন টাইপে ছাপা, বিভিন্ন ধরণের ছোট ছোট পরিচ্ছন্ন আলোচনা, বক্স করিয়া একটি সংস্কৃত নীতি শ্লোক ও তাহার অর্থ, উপদেশাবলী, হেঁয়ালী কবিতা, মজার মজার গল্প, উৎসাহ দিবার জন্য বালকদের রচনা প্রকাশ—আট পৃষ্ঠার মধ্যে মোটামুটি......আনন্দের সমস্ত উপকরণ নৈপুণ্যের সহিত সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।"

যোগীন্দ্রনাথ তখন বারো বৎসরের বালকমাত্র। 'বালকবন্ধু' সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শিশুপত্রিকার পথিকৃৎরূপে দেখা না দিলে প্রমদাচরণের 'সখা' (১৮৮৩) জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 'বালক' (১৮৮৫), ভুবন মোহন রায়ের 'সাথী' (১৮৯৩) 'সখা' ও সাথী' (১৮৯৪) এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মুকুল' (১৮৯৫) প্রভৃতি বিখ্যাত শিশুপত্রিকাগুলি গড়ে উঠত কিনা সন্দেহ। অথচ এই সকল পত্রিকার মধ্যেই বাংলা শিশু সাহিত্যের বিপুল সম্ভাবনার কথা ধ্বনিত হয়েছে। প্রমদাচরণ সেনের সেই "আঃ, ছেড়ে দাওনা কুকুরচন্দ্র মায়ের কাছে যাই, এখন কি আর খেলা করার সময় আছে ভাই?"—কবিতাটি প্রথম 'সখা' (১৮৮৩) পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। পরে যোগীন্দ্রনাথের 'রাঙাছবি'তে (১৮৯৬) সঙ্কলিত হয়েছে। ১৮৮৪তে প্রমদাচরণের মৃত্যুর পরে 'সাথী'র সম্পাদক ভুবনমোহন রায় ১৮৯৪তে 'সখা ও সাথী' নাম দিয়ে দুটি পত্রিকা একত্র করে প্রকাশ করতেন। অবিমিশ্র

'সাথী' (১৮৯৩) পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠাতেই (প্রথম সংখ্যার) যোগীন্দ্রনাথ এলেন এগিয়ে। ছোট ছোট ভাই বোনেদের 'সস্নেহে আহ্বান' জানালেন,—

"কোথায় আছ ভাইটি আমার কোথায় আছ বোন,
আয় ছুটে আয় শোনরে এসে সাথীর আবাহন।"

সস্নেহ এ আহ্বান যোগীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্য-প্রীতির পরিচায়ক সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় আরো পূর্বে, সাত বৎসর পূর্বে ভিখারিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবিতা কণিকা'য় (১৮৮৬)। আর নিজের প্রথম রচিত গ্রন্থ 'জ্ঞান মুকুল' প্রকাশিত হয় ১৮৯০তে। 'সাথী' পত্রিকায় 'জ্ঞান মুকুল' (১৮৯০) সম্পর্কে সমালোচনা বেরয়—

"সহজ ভাষায় গল্প, নানাবিধ নীতিকথা, বিজ্ঞানের কথা প্রভৃতি (এই) পুস্তকে লেখা হইয়াছে এবং বালক-বালিকার মনোরঞ্জনের জন্য অনেকগুলি অতি সুন্দর চিত্রও দেওয়া হইয়াছে। বালক বালিকারা ইহাতে শিক্ষা ও আমোদ উভয়ই পাইবে।"

কিন্তু ঊনবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যিক এবং পরবর্তী বাংলা শিশুসাহিত্যের অন্যতম যোগ্য কর্ণধার রূপে যিনি বরেণ্য, তিনি ঐ 'নানাবিধ নীতিকথা' 'বিজ্ঞানের কথা' আর 'বালক বালিকাদের শিক্ষা'র উপকরণ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। 'গৃহপাঠ্য' এবং 'পুরস্কার প্রদান যোগ্য সচিত্র শিশু সাহিত্য রচনায় মন দিলেন তিনি। প্রথিতযশা চিকিৎসক স্যার নীলরতন সরকারের অনুজ, যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিও খেলা' (১৮৯১) প্রকাশিত হল। পঁচিশ বৎসরের তরুণ শিশু-সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ এর পরেও অর্দ্ধশতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন, কিন্তু অগ্রজের সাফল্যের ক্ষেত্রের মতো তাঁর নিজেরও সাফল্যের দিক একখানি গ্রন্থ রচনাতেই মোটামুটি নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদে রচিত এই গ্রন্থখানি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"...বইখানি ছোটছেলেদের পড়িবার জন্য। বাঙালা ভাষার এরূপ গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। ছেলেদের জন্য যে সকল বই আছে তাহা স্কুলে পড়িবার বই; তাহাতে স্নেহের বা সৌন্দর্য্যের লেশ-মাত্র নাই, তাহাতে যে পরিমাণে উৎপীড়ন হয় সে পরিমাণে উপকার হয়না।...'হাসিও খেলা' বইখানি সংকলন করিয়া যোগীন্দ্র বাবু শিশুদিগের এবং শিশুদিগের পিতামাতার কৃতজ্ঞতাভাজন।"

'হাসি ও খেলা', প্রথম সুষ্ঠু শিশুসাহিত্য পুস্তকের গৌরবে সম্মানিত। একাধিক কারণে গ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে আছে। সর্বমোট ৩৯টি রচনায় সমৃদ্ধ পুস্তকটিতে স্বচ্ছন্দ চলিত ভাষার ব্যবহার লক্ষিত হয়। শিশুসাহিত্যে চলিৎভাষার ব্যবহারের প্রথম প্রয়াস উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর একটি অনুবাদ গল্পে প্রথম লক্ষিত হয়। 'সখা' পত্রিকার ১২শ সংখ্যায় 'Parables of Nature' গল্পটির যে অনুবাদ প্রকাশিত হয় তাতে উপেন্দ্রকিশোর লিখেছেন,—

"কিন্তু তাহলে কি হয়, বাবুরা যে লাল রসগোল্লা পাতে নিয়েছেন, তার একটুখানি একবার চেটে না দেখলে কি চলে? মৌমাছি সেই দিকে গেল। এর মধ্যে একটা ছেলে চিৎকার করে বলিল 'ওরে! মৌমাছিটে ধর! ধর!
মাছি ভাবিল, বাবগো! এই বেলা পালাই।"

দেখা যাচ্ছে চলিৎভাষা ব্যবহারের রীতি উপেন্দ্র-কিশোর রচনাতে নির্দিষ্ট হতে পারেনি। 'সাধু'র মিশ্রণ এসে পড়েছে। সেদিক থেকে 'হাসি ও খেলা'র 'ভুলো ও বাঘা' রচনাটিতে যোগীন্দ্রনাথ যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা অবিমিশ্র চলিৎভাষা। সেখানে "খোকাবাবু...... লুকিয়ে লুকিয়ে ভুলোকে মারতে" গেছে। "কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে" "বলেছে, ভুলো মেরেছে।" ঐ একই

রচনায় অনায়াসে "সুধীর খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে 'বাবার' পিঠের উপর শুয়ে পড়েছে।" সমসাময়িক অন্যান্য শিশু-সাহিত্যিকদের গল্পরচনায় কিন্তু চলিৎভাষার ব্যবহার বিরল ছিল। এই "হাসি ও খেলা" পুস্তকেই সঙ্কলিত প্রমদাচরণ সেনের 'কেরাণী পাখী', রামব্রহ্ম সান্যালের 'জেব্রা,' উপেন্দ্র কিশোরের 'মজন্তালী' প্রভৃতি রচনাগুলির সাধু ভাষাই তার প্রমাণ।

'হাসি ও খেলা'র মধ্যেই যোগীন্দ্রনাথ প্রথম উপকথা রচনা করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে শিশুদের জন্য রচিত কোন রূপকথার পুস্তক আর নেই। সেদিক থেকে 'হাসি ও খেলা'র 'সাতভাই চম্পা' রচনাটি যোগীন্দ্রনাথের অন্যতম মৌলিক অবদানরূপে স্বীকার করা যায়।

"—ফুলগুলি দেখিয়া মালীর বড়ই আনন্দ হইল ; কিন্তু সে যেই হাত বাড়াইয়াছে, অমনি পারুল ফুলটি চাঁপা ফুলগুলিকে বলিয়া উঠিল,—

'সাত ভাই চম্পা জাগরে।'

চাঁপারা উত্তর করিল :—

'কেন বোন পারুল ডাকলে?'

—এখনো পাঠককে রূপকথার রসের জগতে তেমনি-ভাবেই ডাকে। এখনো 'এক যে ছিল রাজা তাঁর সাত রাণী।' শুনলেই বড় বড় চোখ ক'রে অধীর আগ্রহে শিশুরদল তেমনি ক'রেই গল্পদাদুর কোল ঘেঁষে এসে বসে। 'সুয়োরাণী'র কথায় তেমনি উত্তেজনায় তারা হাসে, কাঁদে। এখনো সে গল্পের রসনিষ্পত্তিতে "হেঁটে কাঁটা—উপরে কাঁটা"র প্রয়োজন হয়। গল্পের শেষে "আমার কথাটি ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়লো" বলার প্রয়োজন অনুভব এখনো হয়।

কাকাতুয়া কাকাতুয়া আমার যাদুমণি,
সোনার ঘড়ি কি বলিছে, বল দেখি শুনি?'

নিতান্ত হালে হয়তো আর ঠিক তেমনটি শোনা যায় না। কিন্তু দশ বিশ বৎসর পূর্বেও এসব ছড়ার খৈ শিশুদের মুখে অজস্র ফুটতো। 'হাসি ও খেলা'র ভূমিকায় যোগীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,—

"আমাদের দেশে বালক-বালিকাদিগের উপযোগী স্কুল পাঠ্য পুস্তকের নিতান্ত অভাব না থাকলেও, গৃহপাঠ্য ও পুরস্কার প্রদান-যোগ্য সচিত্র পুস্তক একখানিও দেখা যায়না। এই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিবার জন্য 'হাসি ও খেলা' প্রকাশিত হইল। সাধারণের উৎসাহ পাইলে, শীঘ্রই 'ছবি ও গল্প' নামে আরও একখানি সচিত্র গৃহপাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।"

এক বৎসর পরেই (১৮৯২) যোগীন্দ্রনাথের 'ছবি ও গল্প' প্রকাশিত হয়েছিল। অতএব 'হাসি ও খেলা'র আদর ও চাহিদা সহজেই অনুমেয়।

'ছবি ও গল্পে' উপেন্দ্র কিশোরের 'কেনারাম' রামেন্দ্রসুন্দরের 'চাঁদের কথা' নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'বসন্ত' এবং সত্যেন্দ্রনাথের 'বাংলাদেশ' ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের 'বৃষ্টিপড়ে টাপুর টুপুর,' 'মালক্ষ্মী, 'সাত ভাই চম্পা' এবং 'হাসিরাশি' নামক চারটি কবিতাও সঙ্কলিত হইয়াছিল। মোট তেইশটি রচনার বাকী সব কটিই যোগীন্দ্রনাথের নিজস্ব রচনা। এই গ্রন্থে যোগীন্দ্রনাথের শিশু উপন্যাস 'জয় পরাজয়' চারটি পরিচ্ছেদে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে 'মোহনলাল' (১৯১০) নামে পৃথক গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়। শিশুদের জন্য রচিত উপন্যাস লেখার যে রীতি যোগীন্দ্রনাথ সরকার এই পুস্তকে গ্রহণ করেছিলেন তা পরবর্তী শিশু সাহিত্যের একটি গ্রন্থ আদর্শরূপে স্থান পেয়েছিল। গ্রন্থটিতে কথোপকথনের ভাষা চলিৎ বাংলায় লিখিত। কেবল চলিৎ বাংলায় নয়, নিতান্ত আটপৌরে, সাধারণ জীবন যাত্রায় ব্যবহৃত নিত্যকার শব্দও লেখক স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেছেন। "কিহে মোহনলাল এত চটো কেন?" "মুখ সামলে কথা কও। ফের যা তা বলবে তো টের পাবে। আমি কাউকে কেয়ার করিনা" বা, "মণিকে মারছি, সে বুঝবে? মাঝখান থেকে তোমার ফোড়ন দিতে ডাকলে কে?"—ছবি ও গল্প' মূলত সচিত্র

গল্পের বই। শিক্ষার ও শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে রচিত পুস্তকের বাইরে নিরঙ্কুশ শিশু মনোরঞ্জনের জন্য লিখিত গল্পের বই হিসাবে যোগীন্দ্রনাথের এ কৃতিত্ব অসাধারণ। এই গল্প বলার সহজ ভঙ্গীতেই তিনি 'মজার গল্প' (১৮৯৬), 'ছোটদের রামায়ণ' (১৯১৮), 'ছোটদের মহাভারত' (১৯১৯) 'বনে জঙ্গলে' (১৯২৯) এবং 'ছোটদের চিড়িয়াখানা' (১৯২৯) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা ক'রেছেন। ছোটদের রামায়ণ ও মহাভারত বই দুটিতে সহজ সাধু ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, এত সহজ যে সরল শিশুরও বোধগম্য। কিন্তু "ছোটদের চিড়িয়াখানা"র ভাষা সরল চলিৎ বাংলা। গল্পচ্ছলে বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দেবার এই যে ভঙ্গী তাতেই গড়ে উঠেছে নূতন আস্বাদনের এক শিশু সাহিত্য। জানোয়ার পশু পাখীর প্রতীকে নীতিগল্প বা হিতোপদেশ-মূলক গল্পের আস্বাদন থেকে এ সকল রচনার রসাস্বাদন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উপদেশ নয়, ভালোমন্দর 'সারমন' নয় বিমল আনন্দের উপকরণে শিশু-কৌতূহল নিবৃত্তির এক অভিনব আনন্দপূর্ণ উপায়। শিশু প্রেমিক যোগীন্দ্রনাথের পক্ষে, শিশু চরিত্র নির্মল আনন্দের আকর হয়ে উঠুক এরূপ একটি ইচ্ছা থাকা স্বাভাবিক। কাজেই শিশুর অদম্য কৌতূহল যাতে বিচিত্রগামী হয়ে ওঠে তার জন্য একাধিক পুরাণের, তথা রামায়ণ ও মহাভারতের চরিত্র ও ঘটনা নিয়ে শিশুপাঠ্য পুস্তকও তিনি রচনা করেছিলেন। "কুরুক্ষেত্র বা কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ" (১৯০৯) 'শকুন্তলা' (১৯১০) 'সাবিত্রী সত্যবান' (১৮১০), 'শ্রীবৎস' (১৯১০), 'ধ্রুব' (১৯১৫), 'নল দময়ন্তী' (৩ সংস্করণ, ১৯১৭) রত্নাকর' (১৯২৫), 'লবকুশ' (১৯২৫), 'প্রহ্লাদ' (২ সংস্করণ ১৯২৬) প্রভৃতি গ্রন্থ এই সকল রচনার মধ্যে প্রধান।

বাংলা শিশু সাহিত্যে যোগীন্দ্রনাথের স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন,—

"যোগীন্দ্রনাথের প্রধান রচনাগুলিকে বলা যেতে পারে বিকল্পহীন, অর্থাৎ এরা যা দিতে পারে, অন্য কোনো মা বাবা তাঁদের প্রায় অজ্ঞান শিশু সন্তানকে মাতৃভাষায় সরল আনন্দময় প্রথম স্বাদ দিতে চান, যদি চান জাগিয়ে তুলতে তাদের কল্পনাশক্তি ও মৌলিকনীতি বোধ, যদি আকাজ্ক্ষা করেন তাঁদের হৃদয়বৃত্তির বিকাশ হোক, তাহলে এ-সব বই হবে তাঁদের অবলম্বন, কেননা অন্য কোন বই—অন্যান্য দিক থেকে উত্তম হলেও, শিশুর পক্ষে সবগুলি শর্ত পূরণ করেনা।"

যোগীন্দ্রনাথের প্রধান প্রধান রচনার মধ্যে পূর্বে আলোচিত গল্পগ্রন্থগুলি ব্যতীত 'রাঙাছবি' (১৮৯৬) 'হাসিখুসি' (১৮৯৭), 'খেলার সাথী' (১৮৯৮), হাসিরাশি (১৯০২), ছবির বই (১৯০১, 'হিজিবিজি' (১৯১৬), 'ছড়া ও পড়া' (১৯২১) প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রধাণত দুটি কারণে এই গ্রন্থগুলি দোসরবিহীন। ছড়া ও ছবি তার কারণ। বাংলা সাহিত্যে, লোক সাহিত্যের বাইরে অর্থহীন বা উদ্ভট ছড়া বা ননসেন্স রাইমের সৃষ্টি যোগীন্দ্রনাথের হাতেই প্রথম হয়। এবং এদিক থেকে 'হাসিখুসি' ও 'হাসি রাশি'র তুলনা সত্যিই বিরল। সেই চপলতা সেই প্রলাপেতে সফলতা আর ছেলেমিতে সিদ্ধি যার রসনিষ্পত্তিতে কোন গূঢ় গম্ভীর অর্থ নেই, মানে নেই। আছে শুধু পাগলামির বেড়াভাঙা উচ্ছ্বসিত হো হো হাসি। মজার দেশের সে সব মজার কথা শুনতে ভাল লাগেনা কার? যেখানে—

"জিলিপি সে তেড়ে এসে
কামড় দিতে চায়,
কচুড়ি আর রসগোল্লা
ছেলে ধরে খায়!'

যে দেশে 'পায়ে ছাতি দিয়ে লোকে
হাতে হেটে চলে
ডাঙ্গায় ভাসে নৌকা-জাহাজ
গাড়ী ছোটে জলে,—'

সেখানেই তো 'কড়িংবাবুর বিয়ে'তে "টুনী নাচে টুপি এঁটে নেংটি ইঁদুর দামা পেটে হেলিয়ে দুলিয়ে।" এই

রাশিরাশি হাসির দেশেই "অ-য় অজগর" তেড়ে আসে, 'ং'-পুষির গায়ে লেগে থাকে। এবং আরো কত কি— "আগে অ পরে আ" তা সবাই জানেন কিন্তু তারও আগে যে "কাক ডাকে কা-কা" কা কে জানেন? এ খুশির দেশে মুস্কিল আসানের উপায় কত সহজ। 'শৈল'র আজ পড়তে হবেনা। 'বই রাখ তুলে'। কেননা, "কৈ মাছ ভাজা খেতে শৈল গেছে ভুলে।" 'কমপেনসেশন্' এত অল্পে হবে না। তাই অর্ডার "খৈ আর দৈ দাও।"— বর্ণপরিচয় মুখ্য উদ্দেশ্য বলে কি মনে হয়? 'ননসেন্স রাইমে'র সাহায্যে শিশুমনে আনন্দ দেওয়া আর বর্ণপরিচয় করে দেওয়ার কি সুন্দর রীতি,—

গৌর মাঝি হাল ধরেছে
চৌদিকেতে পাল,
এই নৌকা চড়ে দাদা
বৌ আনবে কাল।

'ঔ'কার শুধু চেনা নয় তার উচ্চারণ-গত যে ধ্বনি-ঐশ্বর্য ছন্দের প্রবাহ-নিয়ন্ত্রণে, তা এক আশ্চর্য যাদু যেন সৃষ্টি করেছে। স্বরবর্ণে অনুপ্রাস হয়না এরূপ ধারণার চরম প্রতিবাদ রূপেও এ ছড়াটির মূল্য আর আস্বাদ? রবীন্দ্র-নাথের 'ঐ'কার সমৃদ্ধ "ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব রভসে'র পাশে রাখলেই এর শিশুসরল সৌন্দর্যের অনাবিল প্রকাশ যে রসের আস্বাদে স্বতন্ত্রজগতের তা বিচার্য। বোঝা যায়—

'বাঁশ বনের কাছে
ভুঁড়ো শিয়ালী নাচে,
তার গোঁফ জোড়াটি পাকা
মাথায় কনক চাঁপা—

উদ্ভট ছড়া, বা 'ননসেন্স রাইমে'র রাজা সুকুমার রায় যখন মঞ্চে আসেননি, তখন যোগীন্দ্রনাথ যে কত শত উদ্ভট ছড়া সৃষ্টি করেছিলেন তার হিসাব এখনও হয়নি। একটি উদ্ভট ছড়া আলোচ্য প্রসঙ্গে আমরা তুলছি।

বাঘের মুখে ঝুলতো যদি
রাম ছাগলের দাড়ি
শুয়োর যদি পাখীর মত
উড়তো ডানা নাড়ি,
গাছের ডালে ব'সে বাঁদর
গোঁফে দিত চাড়া,
ভুতুম পেঁচা আসতো ছুটে
বাগিয়ে বিষম দাঁড়া,
উৎসাহেতে ধোপার গাধা
গাইত যদি গান,
দেখে শুনে চমকে তবে
উঠতো না কার প্রাণ!'

তিনটি 'যদি' দিয়ে পাঁচটি উদ্ভট ক্রিয়ার যে উপভোগ্য বর্ণনা ছড়াটিতে উপস্থিত করা হয়েছে তা কেবল রসাবেদনের নয়, এক একটি পূর্ণ চিত্রের রঙে বর্ণাঢ্য। সব চেয়ে বড় ছড়াটির বয়ন কৌশল 'ক্রিসেন্ডো' নামক যে এক প্রকার বাক্য রীতি আছে, ছড়াটি সেই রীতিতে রচিত। 'যদি'র কৌতূহল নিবৃত্তি কিছুতেই হয়না যতক্ষণ পর্যন্ত না শেষ চরণটির 'তবে'র ষ্টেটমেন্টটুকু, অর্থাৎ দেখে শুনে চমকে তবে উঠতো না কার প্রাণ—পড়া হয়। ছড়ার জগতেও যে সাসপেন্স সৃষ্টি করা সম্ভব তার প্রমাণ এই ছড়াটি। কেবল রসসৃষ্টিতে নয়, বয়ন শিল্পেও যোগীন্দ্রনাথের যে নৈপুণ্য ছিল বাংলা ছড়ার জগতে তা চিরস্মরণীয়।

যোগীন্দ্রনাথের রচনাগুলির অন্যতম বড় আকর্ষণ ছবি। রচনার সঙ্গে চিত্রের যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক যোগীন্দ্র-রচনায় রয়েছে তা উনবিংশ শতকের যোগীন্দ্র-সমসাময়িক অন্য রচনাকারদের ক্ষেত্রে নেই। সমগ্র রচনার আবেদনটিই অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে দাঁড়ায় যদি যোগীন্দ্র রচনার ছবিগুলি বাদ দেওয়া যায়। যতীন্দ্রনাথ সেন অঙ্কিত 'পরশুরামের রচনার ছবিগুলোর মতো অনেকটা। যোগীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে ব্যবহৃত ছবিগুলি প্রধানত লিথোগ্রাফে তৈরী। অবশ্য বেশ কিছু বিদেশী ছবিও ব্লকে

ছাপা হয়েছে। বহু ছবি অন্যত্র (যেমন 'মুকুল' 'বালকবন্ধু' প্রভৃতি শিশু পত্রিকায়) প্রকাশিত হওয়ার পর যোগীন্দ্রনাথের পুস্তকে নিজের রচনার সঙ্গে ছাপা হয়েছে। যেমন প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা 'মুকুলে' প্রকাশিত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'শিয়ালের যুক্তি' রচনার ছবিটি যোগীন্দ্রনাথের 'রাঙাছবি'র 'দুষ্টশিবু' কবিতার অবিচ্ছেদ্য ছবি রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এই রূপ সংগৃহীত ছবিই হোক আর সম্পূর্ণ নূতন ছবিই হোক যোগীন্দ্র-রচনার অন্যতম অবিচ্ছিন্ন অঙ্গই হল তার ছবিগুলি। কতকগুলি রচনা আছে লেখা তাতে কম, ছবিই প্রধান। রচনার মূল বক্তব্য অক্ষরে নয় রেখায় প্রস্ফুটিত। যেমন, 'হাসিখুসি' প্রথম ভাগের সংখ্যা পরিচায়ক লেখা ও রেখার কথা। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এবং শূন্যর সাহায্যে যে মজাদার সং সাজানো হয়েছে তার চেহারা না দেখলে কোন সংখ্যাটি কেমন করে তার চোখ, কান, নাক, তলোয়ার ইত্যাদি হয়েছে তা বোঝা যাবে না। ছবিতে বালক বালিকাদের যে আনন্দ ও কৌতূহল কত তার প্রমাণ হাসিখুসির ছবি আঁকা রচনাটি। রচনাটি যৎ সামান্য, মাত্র একটি শব্দে দুটি চরণে লেখা হয়েছে, "খুকুরাণী খুকুরাণী করছ তুমি কি? এই দেখনা, কেমন আমি ছবি এঁকেছি।" কিন্তু 'হাসিখুসি'র একপৃষ্ঠায় দুটি ছবি এর জন্য প্রয়োজন হয়েছে। প্রথম ছবিটিতে খুকুমণি গভীর মনোযোগ দিয়ে শ্লেটে ছবি আঁকছে। কোলের উপরে তার শ্লেট। পাঠকের দিকে শ্লেটের উল্টোদিকটা রয়েছে। সেটা কালো। পরের ছবিতে প্রথম ছবির উৎসুক পাঠককে খুকুরাণী কি ছবি আঁকছে তার জবাব দিয়েছে, অর্থাৎ ২নং ছবিতে খুকুরাণী তাঁর আঁকা ছবিটা শ্লেটের পিঠ ঘুরিয়ে পাঠকদের দেখাচ্ছে। তাতে একটা মানুষের ছবি রয়েছে। ছবি দেখার কৌতূহল জাগিয়ে তা নিবৃত্তি করার এই যে আনন্দময় প্রচেষ্টা এটিই যোগীন্দ্রনাথের রচনার অন্যতম আকর্ষণ। হারাধনের দশটি ছেলের ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনীর মাধ্যমে সংখ্যা গণনার প্রয়াস লক্ষিত হলেও তার রস অন্যত্র। ভাগ্যহারা ছেলেগুলির জন্য, অর্থাৎ রচনার বক্তব্য-রসে, ছন্দ দোলায়, (পাঁচ মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে), শব্দ সজ্জায় এবং সর্বোপরি দশটি ছেলের দশটি পৃথক ছবিগুলিতে। রচনার সঙ্গে এরা অভেদ। 'খেলার সাথী'র 'খোকার ভাবনা' ছড়াটি সম্পর্কেও এই কথা খাটে। একটি হৃষ্ট পুষ্ট শিশু হামা দিয়ে দিয়ে একটি আয়নার কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। আয়নায় তার প্রতিবিম্বন। অতএব "এ আবার কে এল হেথা—ভাবছে খোকা তাই।" পাতায় পাতায় এই ছবি। ছড়ায় ছড়ায় এই ছবির সার্থকতা। রামু, শ্যামু যমজ দুটি ভাই'র কথায়, 'সাত ভাই চম্পা'র কথায় 'কালা হারে কি ধলা হারে'র কথায় সর্বত্রই এই ছবির প্রয়োজনীয়তা।

যোগীন্দ্রনাথের রচনার রসাবেদন সম্পর্কে একজন সমালোচকের মন্তব্য :

> "—যোগীন্দ্রনাথ সরকারের ছড়ায় লৌকিক রঙ কিছু গাঢ়তর এবং তাঁহার সহজ সরল আন্তরিকতায় একটি স্নেহ কোমলভাব বর্তমান।"

'লৌকিক রঙ' অর্থে যদি লোকজীবন সম্পর্কীয় বস্তুবিষয়কে বোঝায় তাহলে বলা যায় যোগীন্দ্র রচনায় এসব গাঢ়তর রূপে উপস্থিত নয়। পুষি, মেনী, ভুলো, বাঘা, রামু, শ্যামু, খোকাবাবু, খুকুরাণী প্রাসঙ্গিক, এবং স্বাভাবিক। ঊনবিংশ শতকের সকল শিশু সাহিত্যিকদের মধ্যেই এ সকল বিষয় ছিল। কিন্তু এদের নিয়ে রচিত ছড়া, গল্প, রূপকথার লিখন রীতিটি ঊনবিংশ শতকে যোগীন্দ্র-পূর্ব এবং যোগীন্দ্র সমসাময়িক অন্য কারো মধ্যে সহজ-দৃষ্ট ছিলনা। এদিক থেকে সমালোচক যথার্থই বলেছেন, যোগীন্দ্রনাথের রচনা যেন একটু বেশি কোমল, অন্তরঙ্গ, একটা করুণ রসে ভরা। 'হাসিরাশি'র যমজ ভাই কবিতাটি পড়ে চোখের জল ফেলেনা এমন শিশু বাঙালীর ঘরে খুব কমই আছে। এখনো ছেলেবেলার স্মৃতিতে অনেকেরই মন ভারী হয়ে ওঠে এই ভাই দুটির জন্য।

> রামুর যেদিন হইত না পড়া
> বেতগাছি হাতে ধরে
> গুরুমহাশয় শ্যামুর পিঠেতে
> কসিয়ে দিতেন জোরে,

বা একদিন শ্যামু কি জানি কি দোষে
চাকরে মারিল ধরে,
বিচারে র.মুর মিয়াদ হইল
ছয়টি মাসের তরে।

এখনো সেই সব অবিবেচক প্রতিবেশী, বিচারক এবং গুরুমশায়ের কার্যকলাপের জন্য অকারণে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এরূপ পাঠকের অভাব নেই। যোগীন্দ্র-রচনার এই সেন্টিমেন্টই তাঁর রচনায় রসগত আর একটি আকর্ষণ। তা সত্ত্বেও যোগীন্দ্র রচনার বড় আকর্ষণ চিত্র শোভিত মজার ছড়াগুলি। আচরণের অসঙ্গতিতে যে হাস্যরস সৃষ্টি হয় তাই যদি কৌতুক হাস্য হয় তবে যোগীন্দ্রনাথের 'চিৎপটাং' ছড়াটির তুলনা কোথায়? রেখায়, লেখায় ও ধ্বনি প্রবাহের ত্রিসঙ্গমে এমন সার্থক ছড়া খুব কমই আছে।—

'আজ, ব্যাপার হল কি
না ফেলতে টোপ অমনি গেলা,
খল-খল-খল কাতিয়ে খেলা
ক্রমে তোকা রুই কাতল্যা
গোনা পঁচিশটি।

—–আরো একটা
চিক্‌চিক্ গা খড়কে বাটা,
সারাটা পেট ডিমে আঁটা
মাথা ভরা ঘি!'—

কিন্তু এততেও মৎস্য শিকারী 'সাহেবে'র আশা মেটেনা,
'হঠাৎ যদি টোপ খায় ফের,
রুই একটা দশ বারো সের'—
অতএব আবার ছিপ ফেলতে গেলেন সাহেব। কিন্তু—
'প্যান্টুলনে বঁড়শী বিঁধে
অমনি চিৎপটাং।'

ডিম ভরা খড়কে বাটা মাছের যে চেহারা শব্দে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে তার নৈস্বর্গ্য যে কত নিখুঁত তা বিচার করলেই দেখা যায়। 'চিক্ চিকে গা।' 'খড়কে বাটা।' রূপালি গা বললে ঠিক এত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতো না। রূপালি তো বটেই। কিন্তু কেমন রূপালি? 'চিকচিকে।' ঝকঝকে নয়। 'খল খল খল কাতিয়ে খেলা'—শিশুর শ্রবণেন্দ্রিয়কে অবশ্যই আকৃষ্ট করে। এর সঙ্গে সঙ্গে আছে যোগীন্দ্রনাথের ছড়ার অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ, ছবি। রামেন্দ্রসুন্দর যথার্থই বলেছেন,—

"বাঙ্গালাতে এ সকল গ্রন্থের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। যোগীন্দ্রবাবু বাঙ্গালীর মধ্যে এক্ষেত্রে সর্ব্ব প্রথম পথ-প্রদর্শক। তাঁহার নিকট বাঙ্গালী চিরকাল ঋণী থাকিবে।'

যোগীন্দ্রনাথের কীর্তি আরো মহান রূপে বিরাজিত তাঁর ছড়াসঙ্কলনের গ্রন্থ 'খুকুমনি'র ছড়া'তে (১৮৯৯)। রামেন্দ্রসুন্দরের ভূমিকা সম্বলিত যোগীন্দ্রনাথের এই গ্রন্থটিই প্রথম বাংলা ছড়া সঙ্কলন গ্রন্থ; রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' (১৮০৭) তখনো প্রকাশিত হয়নি। সঙ্কলন গ্রন্থটি থেকেই যোগীন্দ্র মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। পঁচিশ বৎসরের যে তরুণ সেদিন নির্ভীক পদক্ষেপে শিশু সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেছিলেন তাঁরই প্রতিভার স্বাভাবিক পরিণতি 'খুকুমণির ছড়া'। কেবল লোক সাহিত্যের ছড়া নয়, শিশু সাহিত্যিকদের রচিত বহুসংখ্যক ছড়াও এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

কিন্তু তবু লজ্জা ও বেদনার কথা হলেও সত্য, হালের সাহিত্য চর্চা বড় সংশয়পূর্ণ। বড় বেশি সংশয়পূর্ণ শিশু সাহিত্য চর্চা। সত্তর বৎসরেরও বেশি কাল আয়ুষ্কে যিনি অর্দ্ধশতাধিকের উপর শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, গত অর্দ্ধশতকাল ধরে যার বিপুল গৌরব অম্লান ছিল তার জন্মের পর একশত বৎসর আজ কেটে গেল অথচ তার একখানি প্রামাণিক জীবনী গ্রন্থ এখনো রচিত হলনা। আক্ষেপের কথা নয়, আত্মগ্লানির কথা, আজ তাঁর সবকটি গ্রন্থ পাওয়া যায় না, সবকটি গ্রন্থের একটি পূর্ণ তালিকা পর্যন্ত নেই। সম্প্রতি যোগীন্দ্র শত বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে তাঁর অনেকগুলি গ্রন্থপুনর্মুদ্রিত হয়েছে, কিন্তু বাহুল্য বোধে সে সব গ্রন্থে প্রথম প্রকাশ্য কালটিও বর্জিত হয়েছে। কাজেই জিজ্ঞাসা জাগে—

"That crops you planted last year in
Your garden,
Has it begun to sprout
Will it bloom this year?"—T. S. Eliot.

যোগীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

আমাদের এই বাংলা দেশ যখন ইংরেজের অধিকারে আসে, তখন পরাধীনতার অভিশাপে আমাদের নানারকম দুর্গতি দিনে দিনে বাড়তে থাকলেও, একটি বিষয়ে আমরা খুবই সৌভাগ্যবান। সেটি হচ্ছে এই যে, বিধাতার আশীর্বাদে গত দু'শ বৎসরের মধ্যে এদেশে যতগুলি কীর্তিধর মানুষ জন্মে দেশের কল্যাণ করে গেছেন, এ পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে তা ঘটেনি। দেশের এই সব মানুষদের কথা ভুলে যাওয়া এক বড় রকমের অপরাধ। কিন্তু এত বেশী লোকদের তো সব সময়ে মনে রাখা সম্ভব নয়। সে জন্য সব দেশেই কোনও একটা উপলক্ষ উপস্থিত হইলে তার সুযোগে এরকম এক এক জনের স্মরণ-সভা করে তাদের সম্পর্কে খবরাখবর জিইয়ে রাখার রেওয়াজ আছে। আমাদের দেশে এই রেওয়াজটি সর্বপ্রথম দেখি কবি রবীন্দ্রনাথের যখন পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হলো সেই উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবের মধ্যে। তারপর কারো পঞ্চাশ, কারো ষাট, কারো সত্তর বা আশি বৎসর পূর্ণ হলে আমরা জয়ন্তী উৎসব করে আসছি এবং একশো বৎসর বাঁচা খুবই দুর্লভ, তাও আমরা দেখে তা স্মরণে উৎসব করেছি—মহারাষ্ট্রের কর্মবীর কার্ভে ও মহীশূরে বিশ্বেশ্বররাইয়ার।

যাঁরা বেঁচে নেই, তাঁদের স্মরণের জন্যও জন্ম অথবা মৃত্যু শতবার্ষিকী উৎসব করে, তাঁদের স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখার জন্য তাও করা হয়। রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর শত বৎসর পরে, শুধু এদেশেই নয়, এই দুনিয়ার অনেক দেশেই সমারোহের সঙ্গে সেই উৎসব পালিত হয়েছে।

আমাদের দেশে 'মৌচাক'-এর পাঠকদের মত যারা শিশু ও কিশোর, তাদের আনন্দ বিতরণের জন্য যাঁরা এদেশে মনোহারি শিশু বা কিশোর-সাহিত্য রচনা করে ছোটদের কাছে খুবই প্রিয়, তাঁদের প্রতিও তোমাদের তরফ থেকে সম্প্রতিকালে রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব প্রতিপালনের আয়োজন হয়েছিল। এবৎসর এদেশে স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা ভারতের মানুষের কল্যাণের জন্য যে অবিস্মরণীয় কীর্তিস্থাপন করে গিয়েছেন, তা তাঁদের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে স্মরণ করার যেমন ব্যবস্থা হয়েছে, তেমনই ব্যবস্থায় আজ তোমাদের মত বয়সীদের আনন্দ বিতরণের অন্যতম পুরোধা যোগীন্দ্রনাথ সরকারের জন্মশতবার্ষিকী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হচ্ছে। আমার বেশ ছেলেবেলাতেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় এবং শিশু চিত্তে আনন্দ বিতরণের জন্য তাঁর লেখা বহু ব্যাপার জানবার সুযোগ হয়েছিল। সেজন্য তাঁর শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁর বিষয়ে তোমাদের কিছু জানিয়ে, তাঁর প্রতি এদেশের শিশুদের কেন কৃতজ্ঞ থাকা উচিত সে বিষয়ে কিছু বলছি।

এদেশে আগে ছেলেদের ঘুমপাড়ানি গান, ছেলে ভুলানো ছড়া বা রূপকথা ছাড়া অল্পবয়সীদের জন্য কোন সাহিত্য ছিল না। যতদিন এদেশে বই ছাপার কোন ব্যবস্থা হয়নি, এগুলি লোকের মুখে মুখে এবং বিশেষভাবে ঠাকুমা-দিদিমাদের মুখে মুখে চলে এসেছে। ছাপাখানা এদেশে হওয়ার পর অবশ্য সেগুলির অনেকটাই ছাপা বইয়ের আকারে বার হয়ে তোমাদের জানার সুবিধা হয়েছে। কিন্তু ছাপাখানা হবার আগে শিশু-সাহিত্য বলে কিছু ছিল না।

এদেশে বাঙ্গালা ভাষায় শিশু মনের আনন্দের খোরাক

যোগাবার ব্যবস্থা সর্বপ্রথমে খৃষ্টান মিশনারীরা করেন এবং তারপর কেশবচন্দ্র সেনের প্রচেষ্টার কথা ধরা যায়। কিন্তু শিশু-মনে আনন্দের হিল্লোল বহাবার কৌশল তাঁদের রপ্ত ছিল না। এ বিষয় প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা হয় ঠাকুরবাড়ীর সাহায্যে প্রকাশিত শিশুদের উপযোগী 'বালক' মাসিক পত্রিকার মারফত এবং এজন্য আমরা বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কাছে ঋণী। তারপরের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হয় প্রমদাচরণ সেনের 'সখা' পত্রিকার মধ্যে দিয়ে। প্রমদাচরণ থেকে এমনি করে শিশু-সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি গুণীজনের সমন্বয়ে এই সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে বলিষ্ঠ শিশু-সাহিত্যের সৃষ্টি। এই শিশু-সাহিত্যিকদের তখন বৈঠক হ'ত ১৩ নম্বর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের একটি বাড়ীতে। এই বাড়ীতে তখন আমার ভগ্নীপতি উপেন্দ্রকিশোর ও আমরা থাকতাম। আমার সেজমামা দ্বিজেন বসু ও নরেন বসু, উপেন্দ্রকিশোরের ভাই কুলদারঞ্জন ও প্রমোদারঞ্জনও থাকতেন। প্রতিদিন তাঁদের বৈঠক বসত, আর প্রমাদাচরণ, অন্নদাচরণ, ও যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতি নিয়মিত আসতেন। তাঁদের রচনাসম্ভারে 'সখা' অনবদ্য হয়ে উঠেছিল। যোগীন্দ্রনাথ আবার সে সময়ে শিশু-মনোরঞ্জক পুস্তকাদি রচনা করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন এবং উপেন্দ্রকিশোর, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ও দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির লেখা পুস্তকগুলি সে সময় যত সুন্দর করে প্রকাশ সম্ভব ছিল তা করে, বাঙ্গালার শিশু-সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধনে প্রয়াসী হয়ে বাঙ্গালার শিশু ও কিশোরদের চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করেন। তাঁর বইয়ের দোকান 'সিটি বুক সোসাইটি' প্রথম শিশু-পাঠ্য প্রকাশনী এবং এ ব্যাপারে তিনিই পথপ্রদর্শক। তাঁর রচনা যে কত অনবদ্য তার পরিচয় তাঁর প্রত্যেকটি ছড়া, কবিতা ও গল্পের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। সে রসের ভাণ্ডারের তুলনা হয় না।

অ, আ, ক, খ যারা সবে শিখতে আরম্ভ করেছে, সেই নিতান্ত শিশুদেরও তিনি ভোলেন নি। তাই প্রথম ভাগের নাম সহজ ও সরল করার জন্য তিনি 'হাসিখুসি' রেখে, এই ধরণের আরও কয়েকখানি বই রচনা করেছিলেন। আজও সেই 'হাসিখুসি' বইয়ের 'অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে; ইঁদুর ছানা ভয়ে মরে, ঈগল পাখী পাছে ধরে' প্রভৃতি ছড়ার মাধ্যমে অক্ষর পরিচয়ের সহজ পদ্ধতির তুলনা অন্য কোন বইয়ে হয়নি। 'ওল খেয়ো না ধরবে গলা, ঔষুধ খেতে মিছে বলা'; ঠাকুরদাদার শুক্‌নো গাল' প্রভৃতি কত সহজে আমাদের বর্ণপরিচয়কে যে সুগম করে দিয়েছেন তিনি, তা বলে শেষ করা যায় না। সত্যই তাঁর শিশু-মনোরঞ্জন করার প্রতিভা অনন্য। একেবারে শিশু থেকে আরম্ভ করে, কিশোরদের জন্য তিনি রসের সঙ্গে জ্ঞানের সেবা করে গিয়েছেন।

কিশোরদের জন্য 'পশুপক্ষী', 'বনেজঙ্গলে' প্রভৃতি বইগুলি তাদের যে কত প্রয়োজনীয়, তা বুঝিয়ে শেষ করা যায় না। তোমরা নিজেরা এগুলি পড়ে তার রস উপলব্ধি করলে আনন্দলাভের সঙ্গে জ্ঞানলাভ করে উপকৃত হবে।

আজ সেজন্য তাঁর এই শতবার্ষিকী উপলক্ষে সকল শিশু ও আমরা অন্যান্য সকলে, এককালে শিশু ছিলাম বলে, আমাদের এই পরম বন্ধুর প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা জানানো অবশ্য কর্তব্য। এই উৎসব বাঙ্গালার সকলের উৎসব।

এবার যোগীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমের বিষয় উল্লেখ করে তাঁর পরিচয়-কথা শেষ করব। বাঙ্গালার স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বহু অপূর্ব দেশাত্মবোধক গান রচিত হয়। এগুলি যাতে হারিয়ে না যায়, সেজন্য তিনি 'বন্দেমাতরম্' নাম দিয়ে প্রায় ১০০টি জাতীয় সংগীত ও কবিতার একটি সংকলন প্রকাশ করেন। বিগত চীন আক্রমণের সময় যোগীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান সুধীন্দ্রনাথ সেই বই-খানির একটি নূতন সংস্করণ করেন এবং তাতে আমার একটি ভূমিকা সংযোজিত করে আমাকে সম্মান দেন। এই বইখানি চিরদিনের একটি জাতীয় সম্পদ।

• এই অশেষ গুণসম্পন্ন শিশু-সাহিত্য স্রষ্টাকে আজ আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

একটি অবিস্মরণীয় নাম ঃ যোগীন্দ্রনাথ সরকার

যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার

'কচি কচি গালভরা খিল খিল হাসি' দেখতে যিনি সব সময় ভালোবাসতেন, যিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কচি ও কাঁচার সবুজ মেলায় কাটিয়ে গিয়েছেন, সেই ছোটদের দরদী কবি যোগীন্দ্রনাথ সরকারের কথা খুব ছোট্ট করে তোমাদের আজ বলব।

সে আজ একশো বছর আগের কথা। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে কবি যোগীন্দ্রনাথ চব্বিশ পরগণার নেতরা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাল্যকাল ও কৈশোরকাল খুব দুঃখে কাটে। পড়াশুনা করবার জন্যে সামান্য খরচাটুকুও সব সময় ওঁর জুটতো না। গ্রামে কিছু দিন পড়াশুনা করবার পর তিনি কলকাতায় এলেন। যোগীন্দ্রনাথের পিতা নন্দলাল সরকারও খুব দুঃখ কষ্টে মানুষ হন। পিতার দারিদ্র্যে শেষে যদি ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়, এই ভয়ে নন্দলাল ছেলেকে গ্রামে রাখতে বেশিদিন সাহস করলেন না। ভাগ্যের উপর নির্ভর করে যোগীন্দ্রনাথ কলকাতাতে এলেন। তখনও তিনি কিশোরকাল উত্তীর্ণ হন নি।

যোগীন্দ্রনাথ যখন কলকাতায় এলেন তখন ব্রাহ্মনেতাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। জ্ঞান পাণ্ডিত্য বিনয় শিষ্টাচার প্রভৃতি বহু সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন তখনকার ব্রাহ্মরা। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে তিনি এনট্রেন্‌স্ পাশ করেন। যোগীন্দ্রনাথের আর পড়াশুনা হ'ল না। পুঁথিগত বিদ্যালাভ করা হ'ল না বটে কিন্তু জীবন সংগ্রামে জয়ী হ'তে গেলে যতোগুলো সদ্‌গুণের প্রয়োজন হয় যৌবনকালে পড়বার পূর্বেই যোগীন্দ্রনাথ তা একে একে আয়ত্ত করে নেন।

গ্রামের ছেলে কলকাতার মতো বড় সহরে এলে সাধারণতঃ নানা প্রলোভনে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষতঃ সহায় সম্বলহীন বালকের পক্ষে তা হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু যোগীন্দ্রনাথের ভাগ্য তাঁকে এমনি একটা ভালো সঙ্গে টেনে নিয়ে গেল যার ফলে তাঁর সদ্‌গুণ বিকাশের সুযোগ ঘটল।

যোগীন্দ্রনাথ কলিকাতার সিটি স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করলেন। সিটি স্কুলে শিক্ষকতাকালে তিনি ক্রমে তখনকার গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসতে লাগলেন। যোগীন্দ্রনাথ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের থেকে বয়সে মাত্র সাড়ে পাঁচ বৎসরের ছোট ছিলেন এবং বিবেকানন্দের চেয়ে মাত্র সাড়ে তিন বৎসরের। কাজেই বুঝতে পারছ তখন বাংলাদেশে চলছে বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্রের যুগ। বিশেষতঃ কেশবচন্দ্রের সাগরপারের খ্যাতিতে তখন কলকাতার বিদ্বান সমাজ পঞ্চমুখ ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের তখন জয় জয়কার। কবি ও আদর্শবাদী যোগীন্দ্রনাথের মনেও তখন নূতন ভাবের জোয়ার এলো। পিতা নন্দলাল হিন্দু হলেও যোগীন্দ্রনাথের মনে ব্রাহ্মধর্মের উদারতা গভীর রেখাপাত করল। যোগীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম হ'লেন। সিটি স্কুলে শিক্ষকতাকার্যে নিযুক্ত অবস্থাতেই তিনি ব্রাহ্ম হয়েছিলেন। নন্দলালের মধ্যমপুত্র নীলরতন ও চতুর্থ যোগীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। ভারত বিখ্যাত চিকিৎসক নীলরতন সরকার এবং বাংলা বিখ্যাত শিশুকবি যোগীন্দ্রনাথ সরকারের নাম আজ কে না জানে?

যোগীন্দ্রনাথের ছোটকাল থেকেই কাব্যপ্রতিভার স্ফুরণ দেখা গিয়েছিল। শিক্ষকতাকালে তাঁর এই শক্তির আরো বিকাশ ঘটে। যোগীন্দ্রনাথ আর শিক্ষকতা করতে চাইলেন না। কেননা তার অনেক আগেই যোগীনবাবুর কয়েকটি কবিতা ও ছড়ার বই বেরোয়। যোগীন্দ্রনাথের প্রথম পুস্তক 'হাসি ও খেলা' প্রকাশিত হয় ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে। তখন কবির বয়স মাত্র পঁচিশ বৎসর। বই লেখার মধ্য দিয়েই কবি তাঁর নিজের শক্তির পরিচয় পেলেন এবং সেই আত্মশক্তির ওপর নির্ভর করেই চলতে ইচ্ছুক হলেন। অন্যান্য চাকুরীর তুলনায় শিক্ষকতা অনেকটা স্বাধীন ধরনের চাকুরী হ'লেও যোগীন্দ্রনাথ কোনও রকম বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে থাকতে চাইলেন না। একেবারে সরাসরি স্বাধীনভাবে পুস্তক ব্যবসায়ে নেমে পড়লেন। তারই ফলে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হ'ল সিটি বুক সোসাইটি। কলেজ স্ট্রীটের ওপর সেই বিরাট প্রতিষ্ঠানটি আজও কবি যোগীন্দ্রনাথের বিপুল কর্মশক্তির সাক্ষ্য দিচ্ছে।

যোগীন্দ্রনাথের কাব্যশক্তির বিকাশ ধীরে ধীরে ঘটতে লাগল। তাঁর প্রথম বই "হাসি ও খেলার" কথা আগেই বলেছি। তার পর একে একে কত যে বই লিখে চললেন তার হিসেব লিখলে একটা গোটা পাতা ভরে যাবে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর বাংলা শিশু সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। ঐ শুভদিনটিতে ছেলেদের মনভুলানো প্রাণজুড়োনো কবি যোগীন্দ্রনাথের "হাসিখুসি" প্রকাশিত হ'ল। ছড়া ও ছবির সাহায্যে বাংলা বর্ণ পরিচয় করানোর চেষ্টা যোগীন্দ্রনাথের আগে আর কেউ করেননি। বাংলাদেশে কিংবা বাংলার বাইরে যে সব বাঙ্গালী আছেন তাঁদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছেন যাঁরা শৈশবে যোগীনবাবুর হাসিখুসি না পড়ে বর্ণ পরিচয় শিখেছেন। সেকালের তে কথাই নেই এমন কি একালেও বর্ণ-পরিচয়ের এতো বই থাকা সত্ত্বেও হাসিখুসির সমাদর ছোটমহলে যথেষ্ট রয়েছে। এমন কি শুনলে তোমরা অবাক হবে যে, রবীন্দ্রনাথের চেয়েও ছোটদের মন ভুলানো কবিতা ও ছড়া লিখিয়ে হিসেবে কবি যোগীন্দ্র-নাথের নাম ও দান অনেক বেশি। কারণ রবীন্দ্রনাথ শিশুদের কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন বেশি বয়সে, আর যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন শুধু শিশুদেরই কবি। সারাজীবন শুধু শিশুদের মুখে হাসি ফোটাবার আপ্রাণ সাধনা করে গিয়েছেন যোগীন্দ্রনাথ। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ থেকে (মৃত্যুকাল পর্যন্ত) ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকাল ধরে কবি যোগীন্দ্রনাথ নিরলস সাহিত্য সাধনা করে গিয়েছেন।

এই যে আজকের দিনে সন্দেশ তোমরা পড়ছো,—সেই সন্দেশ পত্রিকা প্রথম যিনি বের করেছিলেন তিনি ছিলেন আর একজন শিশু দরদী প্রতিভাবান লেখক। তাঁর নাম উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। শুধু কি লেখা? ছবি, গল্প সরস প্রবন্ধ সব কিছুতেই ছিল তাঁর অপূর্ব দক্ষতা। উপেন্দ্রকিশোরের সন্দেশে যোগীন্দ্রনাথও লিখতেন। যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন উপেন্দ্রকিশোরের বিশেষ বন্ধু এবং সন্দেশের তিনি ছিলেন উৎসাহী লেখক। শুধু মৌলিক রচনা লিখেই যোগীন্দ্রনাথ নিরস্ত হননি। পুরোনো কাল থেকে যে সকল ছেলে ভুলানো ছড়া আমাদের মা মাসি কিংবা ঠাকুমা দিদিমার মুখে মুখে চলে আসছে সেই অসংখ্য ছড়া এক জায়গায় জড়ো করে খুকুমণির ছড়া প্রকাশ করেছিলেন যোগীন্দ্রনাথ। ছোটদের তিনি এমন ভালো বাসতেন যে জীবনে কোনও ছেলেমেয়েকে ধমক পর্যন্ত দেননি। কবিতা, গল্প, ছড়া, ভ্রমণকাহিনী, জানবার কথা, আষাঢ়ে গল্প, ভুতুড়ে গল্প, ধাঁধা যখন যা কল্পনায় এসেছে তাই লিখেছেন এবং সব উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন সবুজ কচি অবুঝ শিশুদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে।

যোগীনবাবুর ছেলের মুখে শুনেছি যে, তিনি তাঁর নিজের ঘরে মাঝে মাঝে ছোটদের নিয়ে মশগুল হয়ে থাকতেন। একে বিস্কিট, তাকে মিষ্টি, ওকে গল্পের বই—দিয়ে ছোটদের আব্দার রক্ষা করতেন। সর্বদা হাসিমুখ। কবিপুত্র সমীন্দ্রনাথ বলেছেন,—'আমরা একটি দিনের তরেও বাবার কাছে বকুনি পর্যন্ত খাই-নি। মার খাওয়া তো অনেক দূরের কথা। কথাটা যে কত সত্যি তাঁর ছড়া কবিতা পড়লেই বোঝা যায়। ছেলেদের এমন প্রাণভরে ভালো না বাসলে কি এমন মন-কেড়ে নেওয়া শিশুকাব্য লেখা যায়?

যোগীন্দ্রনাথ ছেলেদের যেমন ভালোবাসতেন, তেমনি তাঁর বন্ধুদের প্রতিও তিনি অত্যন্ত মধুর ব্যবহার করতেন। অন্তরঙ্গ বান্ধব বাড়ি এলে তাকে আদর যত্ন করে তিনি অস্থির করে তুলতেন। কবি নিজে বেশ খেতে পারতেন এবং লোককে খাইয়েও তাঁর অত্যন্ত আনন্দ হ'ত। যোগীনবাবু জীবনের মধ্যভাগের পর থেকে কলকাতাতে কম থাকতেন। শেষদিকে কলকাতায় থাকতেন না। জমিজমা ও অন্যান্য সম্পত্তি যা করেছিলেন তা সবই গিরিডিতে ছিল। কলকাতা ওঁর মোটেই ভালো লাগত না। তিনি শেষজীবন একরকম গিরিডিতেই কাটান। গিরিডিতে মাঝে মাঝে উপেন্দ্রকিশোরও যেতেন।

যোগীনবাবুর সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে সুসাহিত্যিক কুলদারঞ্জন রায় (উপেন্দ্রকিশোরের সহোদর) প্রত্যহই যোগীনবাবুর বাড়ি যেতেন। দুবন্ধুতে খুব গল্পগুজব হত। নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ও বামনদাস মজুমদার নামে দুজন সেকালের নামকরা শিশুসাহিত্যিক যোগীনবাবুকে খুব ভালোবাসতেন। কবি যোগীন্দ্রনাথের প্রাণখোলা সরল সাদা হাসি ও উদার ব্যবহার যিনি একবার দেখেছেন তিনিই জীবনে আর তাঁকে ভুলতে পারেন নি। এত যে ভালো লোক ছিলেন তাঁরও শেষ বারো বৎসর ভালো-ভাবে কাটল না। শেষ বয়সে তিনি অবশাঙ্গ হয়ে বড় কষ্ট পেয়েছিলেন। দেহের ডানদিকটা সম্পূর্ণ অবশ হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও তাঁর সাহিত্যসাধনার বিরাম ছিল না।

মাছধরা তাঁর ভয়ানক শখ ছিল। অবশাঙ্গ হবার পর থেকে মাছ ধরা তাঁর বন্ধ হ'ল। তার জন্যে তিনি মাঝে মাঝে খুব দুঃখ করতেন।

যোগীন্দ্রনাথ শিশুদের মতোই সরলপ্রাণ ছিলেন বলেই শিশুমনের এত খবর রাখতে পারতেন।

হাসিখুসির কবি

নরেন্দ্র দেব

বাংলাদেশের বাচ্ছাগুলোর মুখে হাসি ফুটিয়েছেন যিনি, তাদের ছোট্ট মনটি খুসিতে ভরে দিয়েছেন যিনি, আজ থেকে একশো বছর আগে তিনি এসেছিলেন এ দেশে। ছেলে ভুলোনো ছড়া সেদিন মা-ঠাকুরমার মুখে থাকলেও কোনও বইয়ের পাতায় তা ওঠেনি। যোগীন্দ্রনাথ সরকারই প্রথম দেশের এই অভাব দুর করবার জন্য কলম ধরেছিলেন। শিশুরাজ্যের প্রথম রাজকবি তিনি। ইউরোপে, আমেরিকায় বাচ্ছাদের মন ভোলাবার জন্য কত রকম ছবি ও ছড়ার বইয়ের ছড়াছড়ি। তাদের ছেলে মেয়েরা শিশুকাল থেকেই বই পড়ার আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠবার সুযোগ পায়। আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ছিল। সম্বল মাত্র হিতোপদেশ আর পঞ্চতন্ত্র। আর বোধকরি—

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল॥"

পণ্ডিত মদন মোহন তর্কালংকারের 'রাতি' এই কবিতাটিই এদেশে প্রথম শিশু পাঠ্য কাবতা বলা যেতে পারে। বাচ্ছাদের জন্য ছবিওয়ালা ছড়ার বই ছিল না কিছুই সেদিন। পরে ছেলে মেয়েদের পাঠ্য কয়েকখানি পত্র পত্রিকা দেখা দিয়েছিল মাসিক শিশু সাহিত্য প্রচারের উদ্দেশে যেমন 'সখা' 'সখী' 'মুকুল' 'বালক বন্ধু' 'বালক' ইত্যাদি। শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য যোগীন্দ্রনাথ এই সব সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রথম লেখনী চালনা করেছিলেন।

কিন্তু আমাদের দেশ তখনও ছোটদের আনন্দ উল্লাসের সঙ্গে অবসর বিনোদনের কথা অভিভাবকেরা চিন্তাই করতেন না। ফলে উক্ত পত্র পত্রিকাগুলির একে একে অকাল মৃত্যু ঘটলো। যোগীন্দ্রনাথ সরকার এই সব সাময়িক পত্রিকাগুলির কোনও কোনওটিতে বাচ্ছাদের জন্য কিছু কিছু লিখতেন। কাগজগুলি একে একে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই শিশু দরদীর হৃদয় বড় বেশী ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তিনি তখন এগিয়ে এলেন নানা বিচিত্র ছড়া ও ছন্দে ছোটদের কণ্ঠ ভরে তোলবার জন্য।

আজ থেকে প্রায় ৭৫ বছর আগে শিশুদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য প্রকাশ করলেন যোগীন্দ্রনাথ 'হাসি ও খেলা' নামে একখানি সচিত্র শিশুপাঠ্য গ্রন্থ। এতে ছিল এদেশের একাধিক লেখকের শিশুদের উপযোগী রচনার সংকলন।

বইখানি প্রকাশ হতে না হতেই শিশু মহলে যেন একটা হুল্লোড় পড়ে গেল। দেখতে দেখতে দু'হাজার বই বিক্রী হয়ে গেল। দেখে যোগীন্দ্রনাথ উৎসাহিত হয়ে পরের বছরেই ছবি ও গল্প নামে আর একখানি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এখানিও তিনি পুর্বসুরীদের রচনা থেকে নির্বাচন ও সংকলন করে প্রকাশ করেছিলেন। অবশ্য, তাঁর স্বরচিত কিছু গল্প ও ছড়াও এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছিল।

পরবর্তী কালে তিনি বাচ্ছাদের জন্য লেখা বিলাতী উদ্ভট ছন্দ ও ছড়ার অনুকরণে ও অনুসরণে 'হাসি রাশি' নামে একখানি সচিত্র পুস্তক প্রকাশ করেন। অবশ্য; এই খানি বেরিয়েছিল তাঁর 'হাসি ও খেলা' প্রকাশিত হবার প্রায় দশ বছর পরে। এই বই খানি বেরবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যোগীন্দ্রনাথের সংগৃহীত

খুকুমণির ছড়া প্রকাশিত হয়ে শিশু রাজ্যে তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর দু'বছর আগে যোগীন্দ্রনাথকে অমরত্ব এনে দিয়েছিল তাঁর 'হাসি খুসি' বইখানি। সেই 'অ'য়ে অজগর আসছে তেড়ে।' আজও এদেশের কচি কাঁচাদের শিক্ষার প্রথম আনন্দগান রূপে গণ্য। আজ তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলতে চাই শিশু সাহিত্য রচনায় তিনিই আমাদের প্রকৃত আদি গুরু।

যৌবনে যোগীন্দ্রনাথ

সাড়া

বনফুল

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার
উনসত্তরের চৌকাটের উপর দাঁড়িয়ে
তোমায় জানাচ্ছি শত কোটি নমস্কার,
লৌকিকতার আড়ষ্ট পোষাক পরে'।
মনে পড়ছে
এমন একদিন ছিল
যেদিন তোমাকে লোক-দেখানো নমস্কার করবার কথা
ভাবতেই পারতাম না।
সেদিন তুমি আমার অন্তরঙ্গ ছিলে
সঙ্গী ছিলে
সাথী ছিলে
মনে হচ্ছে সেদিন যেন তোমার কোলে বসে'
তোমার গলা জড়িয়ে
শুনেছি বীর ফটিক চাঁদ বাবু
মেহের আলি আর কাঠ বেরালীর কাহিনী ;
হারাধনের দশটি ছেলেকে
আমারই স্বপ্নলোকে মূর্ত্ত করেছিলে তুমি একদিন।
সেদিন তুমি আপনার লোক ছিলে
তোমাকে নমস্কার করবার কথা ভাবতেই পারতাম না।

কালের প্রবাহ কিন্তু ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে আমাকে
তোমার কোল থেকে।
হয়েছি সমাজের লোক
কাজের মানুষ
সংসারের নানা দাবীর জোগানদার।
হঠাৎ পিছু ফিরে দেখেছি
আমার ছেলেমেয়েরা
বসে' আছে তোমার কোলে।
তাদের কলহাস্য উঠছে
মেহের আলির গল্প শুনে
তোমাকে ঘিরে হুড়ো হুড়ি হাসাহাসি করছে তারা
আমি যেমন করতুম।
কিন্তু তারাও থাকে নি বেশী দিন
তারাও ভেসে গেছে সংসারের প্রবাহে।
হয়েছে কাজের মানুষ
কেউ ডাক্তার, কেউ ইনজিনিয়ার
কেউ বা আরও কিছু।
তোমার রূপকথালোকে বেশী দিন তারাও থাকে নি
কিন্তু তোমার রূপকথালোক
শূন্য হয় নি তা বলে।
সেখানে ছুটেছে আমার নাতি নাতনীরা।
ছোট ছেলের খেলার মাঝে বসে আছো তুমি চিরকাল
চিরশিশু যোগীন্দ্রনাথ সরকার।
তোমার চারিদিকে ফুলের ভীড়
তারার ভীড়
রামধনুর যাতায়াত।
ওগো চির-শিশু,
তোমাকে ঘিরে দোয়েল, টুনটুনি
কোকিল, হলদে পাখীরা
রূপের হাট,
গানের হাট
সাজিয়ে রেখেছে চিরকাল।

উনসত্তর বছরের চৌকাটে দাঁড়িয়ে
সবিস্ময়ে চেয়ে দেখছি তোমার দিকে
আর ভাবছি তোমার কাছে ফিরে যেতে পারব না,

তাই ওগো আমার পরমাত্মীয় যোগীন্দ্র নাথ সরকার
আজ তোমাকে জানালাম লৌকিকতার
লোক-দেখানো নমস্কার।
শতকোটি নমস্কার।

মনের ভিতর কিন্তু একটা অবুঝ যেন বলছে
যা তুমি হারিয়েছ তা আর ফিরে পাবে না।
হঠাৎ তুমি যেন হেসে বলছ—
কেন পাবে না,
চলে এসে, ব'স না তোমার নাতি-নাতিদের দলে।
ভাবছি এ ডাকে সাড়া দিতে পারব কি?
শরতের হালকা মেঘের মতো
লঘু-ছন্দে
ভেসে যেতে পারবে কি তোমার কাছে
মাল বোঝাই
প্রকাণ্ড মহাজনী নৌকোটা?

গিরিডির 'গোলকুঠি', যোগীন্দ্রনাথ যেখানে জীবনের
বেশীর ভাগ অতিবাহিত করেন।

আমটি আমি খাব পেড়ে

অধ্যাপক ড: বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

ছেলে ভুলানো ছড়ার যে ধর্ম—যোগীন্দ্রনাথ সরকারের শিশুপাঠ্য কবিতাগুলির সেই ধর্ম—স্বাভাবিকতা। গাছের ডগায় ফুলের মত তাঁহার কলমের মুখে এই কবিতাগুলি যেন আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে। পড়িলে মনে হয়, চিন্তা নাই ভাবনা নাই প্রস্তুতি নাই প্রয়াসের চিহ্নমাত্র নাই। শিশু যখন আপন মনে কথা কহিয়া যায় সেই কথার মালার উপর তাহার মনের প্রাতচ্ছবিটি পড়ে তাহার ভাবের সঙ্গতি নাই, অর্থের ধারাবাহিকতা নাই, তাহা নানারূপের নানা রঙের নানা মুডের নানা ছবির এক একটি অ্যালবাম। শিশুর মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সহিত একাত্ম হইতে পারিলে তবেই সে ছবির উৎসের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হইবে। যোগীন্দ্রনাথ* তাহা পারিয়াছেন। তাহার ভাষায় শিশুর মুখের মিল খুঁজিয়া পাই। শিশু যেমন চিরনুতন, তাঁহার ছড়াগুলিও তেমনি আজ পর্যন্ত পুরাতন হইতে পারিল না। আমার নাতনী যখন আপন মনে বসিয়া দুলিয়া দুলিয়া গানের সুরে হারাধনের দশটি ছেলের হিসাব করিয়া যাইতেছে আমার মনকেও সে তাহার সঙ্গী করিতে ছাড়ে নাই। যোগীন বাবুর দৌলতে আমার তিন বছরের নাতনীর সমবয়সী হইতে আমার কিছুমাত্র বাধিতেছে না।

শুধু আনন্দ নয় ব্যাবহারিক ক্ষেত্রেও তাঁহার দানের মূল্য অপরিমেয়। শিশুদের বর্ণশিক্ষা দিবার জন্য তিনি যে পদ্ধতির প্রবর্তন করিলেন এদেশের পক্ষে তাহা অভিনব। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের হাতে খড়ি দিয়েছিলেন বটে কিন্তু যোগীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন বলিয়া বিদ্যাস্থানে ভয়ের দৈত্যটা মাথা চাড়া দিতে পারে নাই। হায় সেদিন প্যারী সরকারের পাশেও বিধাতা যদি যোগীনবাবুর মত একজন দেবদূতকে পাঠাইয়া দিতেন তাহা হইলে ইংরাজী পাঠ মরুস্থলীর রুক্ষতা এতটা ভয়ঙ্কর হইত না।

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের জন্ম শতবর্ষ পুর্ণ হইতে চলিয়াছে। আমরা এই উপলক্ষে তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। বাংলা ভাষা যতদিন থাকিবে যোগীন্দ্রনাথের স্মৃতি বাঙালীর মনে ততদিন অম্লান থাকিবে। অজগর যতই তাড়া করুক আম খাইবার আশা শিশুমনে অক্ষয় হইয়া থাকিবে, এবিষয়ে আমার মনে সংশয় মাত্র নাই।

যোগীন্দ্র-স্মৃতি

সুনির্মল বসু

সে আজ অনেকদিন আগেকার কথা। আমরা দুটি ভাইবোন গিরিডিতে গুরুতর ব্যাধিতে শয্যাশায়ী, —দৈবাৎ সে সময়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক স্যার নীলরতন সরকার মশাই গিরিডিতে এলেন। তাঁকে আমাদের দেখানো হোলো। তিনি আমাদের জন্যে ব্যবস্থা করলেন এক রকম উগ্র-ঝাঁকালো লাল রংয়ের মিক্‌স্‌-চার। এই লাল্‌চে ওষুধের তীব্র ঝাঁঝে ব্যাধি-রাক্ষসী পালাই-পালাই করেও যেন আমাদের মোহ আর কাটিয়ে উঠতে পারছিল না, ঠিক এমনি সময়ে বাবা এনে দিলেন আমাদের লাল মলাটের একখানা মোটা বই। বই-খানির নাম "শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী।" বাবার কাছে জানলাম স্যার নীলরতনের ছোট ভাই যোগীন সরকার মশাই হচ্ছেন এই বইখানির গ্রন্থকার।

মাথা তুলে উঠে বস্‌তে পারতাম না। সর্ব্বাঙ্গের যন্ত্রণায় মুহ্যমান থাকতাম প্রায় সকল সময়েই। বয়স তখন আমাদের দশ বারো বছরের বেশী নয়।

এই শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলীখানা এক অতি অলৌকিক প্রভাব বিস্তার করল আমাদের এই আধিব্যাধি যুক্ত দেহে ও মনের উপর।

দিদি ও আমার মধ্যে চল্ল প্রবল পাল্লা এই বইখানা নিয়ে। যে আগে সেরে উঠবে বইখানার মালিকানা স্বত্ব পাবে সে।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের জ্বালা যন্ত্রণা যেন কুস মন্তরের চোটে কোথায় উধাও হয়ে গেল। আমরা রোগের সমস্ত ক্লান্তি ভুলে দিনরাত সম্মোহিত হয়ে রইলাম এই অথৈ আনন্দ-সমুদ্রে। ওঃ কী আনন্দ, কী আনন্দ! পাতার পর পাতায় কী অমৃত রসের ছড়াছড়ি, কী স্বর্গীয় পুলকের পরিবেশন—সে কথা আজও ভুলতে পারি নাই।

রাত্রে স্বপ্ন দেখতাম—দিদি আমার আগে ভালো হয়ে উঠেছে—আমার সমস্ত প্রাণের ব্যথা যেন কান্না হয়ে উছ্‌লে উঠতে চাইত—বইখানা তবে দিদিরই হয়ে গেল—হায় হায় হায়।

দুজনেই আমরা এক সঙ্গে ভালো হয়ে উঠলাম খুব তাড়াতাড়ি। বইখানার মালিক হলাম আমরা দুজনেই। গোলমাল গেল চুকে।

এখনো ভেবে উঠতে পারছি না,—আমাদের এত তাড়াতাড়ি ভালো করলো কে—ঐ লাল মিক্‌স্‌চার না ঐ লাল মলাটের বই।

তখন থেকেই যোগীন্দ্রনাথের আমি একজন গোঁড়া ভক্ত হয়ে উঠলাম।

শিশু সাহিত্যের ঊষর ক্ষেত্র আজকাল সরস শস্য-শ্যামল হয়ে উঠেছে। ফল, ফুল, শস্য-পর্ণের নয়ন-মন-হারী অপূর্ব সমারোহে ও সৌন্দর্য্যে আজ তা অতি মাত্রায় সমৃদ্ধ। কিন্তু আমাদের শৈশবকালের প্রথম অংশটা পার হতে হয়েছে অনুর্ব্বর মরুভূমির উপর দিয়ে। দুই একটি তাল খেজুরের গাছ যা ছিল, তারি ছায়াই তখন আমাদের ছিল পরম তৃপ্তিদায়ক চরম আনন্দকর।

"রাত্রি পোহাইল উঠ প্রিয় ধন
কাক ডাকিতেছে কর রে শ্রবণ।

কিম্বা

"পাখী সব করে রব রাত্রি পোহাইল,
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।

এই সব ছড়াই ছিল তখন আমাদের বড়াইয়ের বস্তু। এই সব কবিতাই আমাদের প্রাণে স্বর্গীয় আনন্দের ঝরণা ঝরাতো। এর বেশী আর কিছু আমরা আশা করতে পারতাম না।

দারুণ দুর্ভিক্ষের সময় বুভুক্ষুর যা দশা হয়, আমাদের দশাও তাই হোতো। পেটুক বামুনের মত সামনে যা পেতাম গোগ্রাসে তাই গিল্‌তে চেষ্টা করতাম।

ঠিক এই রকম সময়ে যোগীন্দ্রনাথ এলেন ভগীরথের মত শঙ্খ বাজিয়ে, মরুর বুক চিরে তিনি বহালেন নব গঙ্গার ধারা।

অসহ আনন্দে অধীর শিশুর দল দুই হাতে সেই ধারা পান করতে লাগল অঞ্জলি পুরে পুরে। শিশুর অভিভাবকেরা দুই হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করলেন এই যুগ-প্রবর্ত্তক মানুষটিকে। সমগ্র বাংলাদেশ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল এই অলোক-সামান্য প্রতিভার দিকে।

পরে "হাসিখুসি"র হল্লা উঠল। হাসিরাশির হর্‌রায় দিক্‌দিগন্ত মুখরিত হোলো, রাঙাছবির জেল্লায় রামধনুর রং ঠিক্‌রে পড়তে লাগল দিকে দিকে, খেলার সাথীর দেখা পেয়ে ছিঁচ্‌কাঁদুনের মুখেও হাসির বন্যা বয়ে গেল, লঙ্কাকাণ্ড কুরুক্ষেত্র নিয়ে ঘরে ঘরে শিশুদের মধ্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বেধে গেল। ছড়ায়, গল্পে, গানে, ছন্দে, ছবিতে সারা বাংলাদেশে এক নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি হোলো। ছোটরা ভাবল—'ধন্য আমরা' বড়রা ভাবলে—"হায় রে—আবার কেন ছোট হয়ে গেলাম না।'

যোগীন্দ্র নাথের সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না —তাঁরা হয়তো জানেন না কি রকম সদানন্দ অমায়িক পুরুষ ছিলেন তিনি। 'হাসি খুসি'র লেখক লোকটি যে কি রকম হাসি খুসি ছিলেন—তার খোঁজ অনেকেই রাখেন না।

যাঁরা গিরিডি গেছেন, তাঁরা জানেন—যোগীন্দ্রনাথের বাড়ী গোলকুঠী এক সময় ছিল সমস্ত আনন্দ-উৎসবের কেন্দ্রস্থল। আর এই উৎসব-তীর্থের প্রধান পাণ্ডা ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ স্বয়ং। পুজার সময় 'গোলকুঠীর' গোলমাল কানে না এলে মনটা যেন দমে যেত।

মনে পড়ে প্রতি বৎসর কোজাগরী সন্ধ্যায় যোগীন্দ্র নাথের উদ্যানে পুর্ণিমা সম্মিলনীর কথা। সে অনাবিল আনন্দ যিনি একবার উপভোগ করেছেন তিনি তা আর জীবনে ভুলবেন কি না সন্দেহ।

মনে পড়ে প্রসিদ্ধ শিশু-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন রায় মহাশয়ের বাজীকরের ছেলে সেজে অপুর্ব্ব ভঙ্গিতে নৃত্যগীতের কথা। তার অপরূপ সুরের—

"আজ পুর্ণিমার সম্মিলন,
যোগীন বাবুর নিমন্ত্রণ—

এখনো আমার কানে ভাসছে। বাংলা দেশের এমন বিখ্যাত লোক খুব কমই আছেন, যাঁরা এই পুর্ণিমা-সম্মিলনীতে যোগ না দিয়েছেন, এর আনন্দ উপভোগ না করেছেন।

এই সমস্ত উৎসবের পুরোধা ছিলেন এক সময় যোগীন্দ্রনাথ।

যোগীন্দ্রনাথের কাছে বয়সের কোন বাছ-বিচার ছিল না—তিনি ছিলেন সকলেরই বন্ধু। শিশুরা বিনা সঙ্কোচে তাঁর সঙ্গে মিশ্‌তো, যুবকেরা পরম বান্ধবের মত তাঁর

সঙ্গে রহস্যালাপ করত। বয়সে বৃদ্ধ হলেও তাঁর প্রাণ ছিল শিশুর মত সরল।

যোগীন্দ্রনাথের মাছ ধরবার সখ ছিল খুব বেশী রকম। আমরা দেখেছি—গিরিডিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি ছাতা মাথায় দিয়ে টোপ ফেলে বসে আছেন পুকুরের ধারে। ঝড়-বাদল, রোদ-বাতাস কিছুতেই তাঁর দৃষ্টি নাই। অসম্ভব ধৈর্য্য-শক্তির পরিচয় এটা।

একদিন তিনি মাছ ধরতে চলেছেন—হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখা। আমি তখন স্কুলের বালক। বই নিয়ে স্কুলে চলেছি। আমায় দেখে তিনি তাঁর স্বাভাবিক মধুর হাসি হেসে বল্লেন,—

"ওহে. লিখিবে পড়িবে মরিবে দুখে
মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে।"

যোগীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলবার ছিল—কিন্তু সময়ের অভাবে অতি সংক্ষেপে দু'চারটি ব্যক্তিগত কথার অবতারণা করলাম মাত্র।

আমার অতি সৌভাগ্য যে, যোগীন্দ্রনাথের স্নেহ আমি লাভ করেছি, তাঁর উৎসাহে আমি উৎসাহিত হয়েছি—তাঁর অযাচিত প্রীতিতে আমি ধন্য হয়েছি। মৃত্যুর পুর্ব্বে পক্ষাঘাতে যখন তিনি অথর্ব্ব-প্রায় তখনো তাঁর মুখের বিমল হাসিটির অভাব কখনো ঘটেনি। শিশুর মত সরল হেসে তখনো তিনি আমাদের প্রাণের আনন্দ জানিয়েছেন।

উপযুক্ত বয়সে যোগীন্দ্রনাথের তিরোধান হয়েছে—এ জন্যে দুঃখ করবার কিছু নাই। দুঃখ এই যে জীব-দশায় তাঁকে বাংলাদেশ যথাযোগ্য সম্মান দেয় নাই। বাংলাদেশে শিশু-সাহিত্যিকেরা চিরকালই অবজ্ঞাত, অপাংক্তেয়। রবীন্দ্র-জয়ন্তী থেকে আরম্ভ করে ছোট বড় অনেক জয়ন্তী এই কলকাতা সহরে হয়ে গেছে। যদি শিশু-সাহিত্যিকের কদর থাকত, তবে আমার বিশ্বাস আজকের এই Post-mortem sympathy জানাবার আগে মহা সমারোহে যোগীন্দ্র জয়ন্তীর অনুষ্ঠানও নিশ্চয় হোত।

যদি কোনো দিন সত্যিকারের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হয়—তাতে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাকবে যোগীন্দ্রনাথের কথা—এ আমার ধ্রুব ধারণা।

———

যোগীন্দ্রনাথ

সুধীরঞ্জন দাস

স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ সরকারের পুণ্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার জন্যে তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী পালনের আয়োজন হয়েছে জেনে যারপরনাই প্রীত হলেম। তাঁর কাছে দেশবাসীদের যে অপরিশোধনীয় ঋণ রয়েছে এই আয়োজন তারই স্বীকৃতিমাত্র। এ সম্মান তাঁর নিতান্তই প্রাপ্য ছিল।

শিশুদের হৃদয় মনের বিকাশ ও প্রসারের জন্যে যে তাদের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা দরকার এককালে সেই বোধ আমাদের দেশে অনুভূতই হয় নি। সে আমলে শিশুদের মনোরঞ্জনের একমাত্র সম্বল ছিল তাদের ঠাকুমা, দিদিমা, মাসীমাদের বা বাড়ির পুরান দাসীদের মুখে বলা গল্প বা ছড়া। তার মধ্যে খুব বেশী বৈচিত্র্য না থাকলেও শিশুদের ওই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হোতো। শিশু সাহিত্যের একান্ত অভাব ছিল তখন আমাদের দেশে। সেই অভাব পুরণের জন্যে আজ পর্যন্ত যে প্রচেষ্টা হয়েছে যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন তারই পথিকৃত। শিশুদের মনের মতন করে তিনি একখানার পর আর একখানা বই লিখে বা সংকলন করে গেছেন। "হাসি খুসী" ও "হিজিবিজি" দিয়ে অক্ষর শিক্ষা থেকে সুরু করে "হাসি রাশি" ছবি ও গল্প, ছড়া ও ছবি বনে জঙ্গলে ইত্যাদি নানা বয়সের শিশুদের রুচি উপযোগী নানা গল্পের বই তিনি শিশুদের সামনে তুলে ধরেছেন। শিশুরা তন্ময় হয়ে সে সব গল্প ও ছড়া প'ড়ে কি আনন্দই না পেত। এই আনন্দ বিধানের জন্যে যোগীন্দ্রবাবু শিশুদের ও তাদের বাপমায়ের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। আজকে সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে যোগীন্দ্র বাবুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে পরম তৃপ্তি লাভ করছি।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

সজনীকান্ত দাস

সাধারণ গৃহস্থ-বাড়ীতেও পাঠ্যেতর বইয়ের আমদানী ছিল না বলিলেই চলে। শিশু-সাহিত্যের একমাত্র পরিবেশক ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়। বাংলা দেশের এই কালের ছেলে-মেয়েদের তিনি যাহা দিয়াছেন তাহারা বড় হইয়া বিস্মৃতিপরায়ণ না হইলে, তাঁহার নামে উচ্চতম স্মৃতিস্তম্ভ বাংলা দেশের কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই নির্ম্মিত হইত।

* * * *

মায়ের মুখে শোনা কাহিনী এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের কথা বাদ দিলে ছাপার অক্ষরে প্রথম কোন্ গল্প আমার শিশুমনকে আলোড়িত ও অস্ফুট কল্পনাবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়াছিল—দুস্তর স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করিয়া তাহারই সন্ধান করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। সেই আমার ঘটনা বৈচিত্র্যহীন শৈশবের স্বচ্ছ নির্ঝর-ধারা আজিকার বাত্যাহত তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ ঘূর্ণাবর্ত্তসঙ্কুল আবিল জলস্রোত হইতে বহু দূরে পিছনে পড়িয়া আছে। কালের বিপুল ব্যবধানে প্রায় সকল ছাপার অক্ষরই সেই নির্ঝর-ধারার স্নিগ্ধচপল নৃত্যপ্রবাহে উপলখণ্ডের মত হারাইয়া গিয়াছে। হাতড়াইতে হাতড়াইতে অকস্মাৎ যোগীন্দ্রনাথ সরকারের "ছবি ও গল্প" আমার বিলীয়মানস্মৃতি পথে ভাসিয়া উঠিল। ভুলিয়া গিয়াছিলাম এই 'ছবি ও গল্পে' সঙ্কলিত শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের "বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর" কবিতাটিই আমার সাহিত্য-জীবনকে প্রথম উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিল। গ্রীষ্মাবকাশের দ্বিপ্রহরে এই মহার্ঘ রত্ন-সম্বলিত বইখানি সংগ্রহ করিতে গিয়াই দাদাকে আহত করিয়া মায়ের কান্নার কারণ হইয়াছিলাম। বইখানির নাম স্মরণে উদিত হওয়া মাত্রই আমার অস্ফুট শৈশবকালকে ক্ষণকালের জন্য ফিরিয়া পাইলাম। বিচিত্র চিত্রশোভিত সেই 'ছবি ও গল্পে'র পাতায় পাতায়' আবার সেই শিশুমনের অনন্ত কৌতূহল ও অসীম আগ্রহ লইয়া বিচরণ করিতে লাগিলাম। মনে পড়িল—"আমাদের গোবর্দ্ধন, ওরফে গোব্‌রার" "ফাঁকি দিয়া স্বর্গলাভ", সহৃদয় "কেনারাম"র অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা লাভ, বুদ্ধিমান "রামধনে"র মুক্তিলাভ এবং তাহাকে উপলক্ষ করিয়া পাড়ার বকাটে ছেলেদের সেই ছড়া—

> বুদ্ধিমান রামধন,
> সাবধানে থেকো,
> নাকে মুখে ছিপি এঁটে
> বুদ্ধি ধরে রেখো।"

এবং সর্ব্বোপরি চারিভাগে বিভক্ত চার পরিচ্ছেদের বড় গল্প "জয়-পরাজয়" (আমার জীবনের প্রথম ধারা-বাহিক উপন্যাস) নানা বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়া গল্পের নায়ক মোহনলালের শেষ পর্যন্ত এই জ্ঞানলাভ—"দেবত্বের কাছে পশুত্ব পরাজিত।" এই চারটি গল্পের সাহায্যেই বাংলা ছোট ও বড় গল্পের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়। এই চারিটির মধ্যেই ভৌতিক, আধিভৌতিক, লৌকিক, পারমার্থিক, অদ্ভুত, আজগুবি, হাস্য-ব্যঙ্গাত্মক, গম্ভীর—এমন কি, আজকাল বহুলব্যবহৃত মনস্তাত্ত্বিক রসের যথেষ্ট ইঙ্গিত পাইয়াছিলাম (শুধু অধিকাংশ বাংলা গল্পে যাহা প্রাণ—সেই নারীপুরুষ-ঘটিত প্রেম বা যৌন আবেদনের কোন সন্ধান এইগুলিতে মিলে নাই।) পূর্ব্বে 'বর্ণপরিচয়' 'কথামালা' প্রভৃতিতে অনেক গল্প পড়িয়াছিলাম; কিন্তু সেগুলির কোনটাতেই

মনে গল্প-রসের সঞ্চার হয় নাই, বানান এবং অর্থের গহনে গল্পের রসের মাধুর্য্য ও আকর্ষণ হারাইয়া গিয়াছিল। এই প্রথম ছাপার অক্ষরে এমন একটি বস্তুর খোঁজ পাইলাম, যাহা পাঠ্য পুস্তকে ছিল না, যাহা কাব্য হইয়াও বাস্তব লোক হইতে কল্পনার অবাস্তব রাজ্যে আমাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিল।

"জয়-পরাজয়" ছোট হইলেও আজিকার বুদ্ধিতে বিচার করিয়া দেখিতেছি ইহাতে উপন্যাসের বাঁধন অতি চমৎকার; বাঙালী ছাত্রজীবনের দৈনন্দিন অতি সাধারণ ঘটনার সমষ্টি হইলেও ইহা সমাপ্তি পর্যন্ত পাঠকের কৌতুহল জাগ্রত রাখে। ইহার উদ্দেশ্য—অন্যায়ের সহিত সংগ্রামে ন্যায়ের জয়লাভ—অতি সহজ স্বাভাবিক ভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে, পাঠ্য পুস্তকের গল্পের যাহা দোষ পাঠকের চোখে আঙ্গুল দিয়া মরাল প্রকট করিবার প্রয়াস ইহাতে নাই। কলিকাতা হইতে ট্রেনযোগে বাড়ী বগুলায় মায়ের কাছে যাইবারকালে নায়ক স্বপ্নে চিরশত্রু নেপালের সহিত সংঘর্ষে আহত ও মুর্চ্ছিত হইয়া যখন 'বগুলা, বগুলা' শব্দ শুনিয়া আত্মস্থ হইল তাহার তখনকার সেই অচেতন বিহ্বলতা আমি আজ পর্যন্ত অনুভব করিয়া থাকি; পুর্ববঙ্গ রেলপথে বগুলা ষ্টেশনটি যতবার পারাপার করিয়াছি, ততবারই এক জাগ্রত জীবন্ত অনুভূতি আমাকে অভিভূত করিয়াছে।

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের নিকট আমার—তথা সেকালের ছেলেমেয়েদের ঋণের পরিমাণের কথা লিখিয়া শেষ করিতে পারিব না। বিদ্যাসাগর, মদনমোহন, অক্ষয়কুমার ছানা পাকাইয়া গোল্লা প্রস্তুত করিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথ আসিয়া তাহা রসে ফেলিয়া রসগোল্লা করিয়া ছড়িলেন; এই দুই জনের ক্ষেত্রে পাঠ্য পুস্তকের ক্রমপরিণতিতেই রসের সঞ্চার হইল। শিক্ষিত-সমাজ তাহা গ্রহণ করিলেন। শিশুসমাজে রস-ভগীরথ হইলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার। যোগীন্দ্রনাথ আমাকে রসরাজ্যের যে নমুনা দিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা চিত্তে স্মরণ করিতেছি।

—০—

খেয়াল খুসির খেলা

আশাপূর্ণা দেবী

পাঁচ থেকে পঁয়ষট্টি বয়সের এমন কোনো একটি বাঙালী-আছে কি, যে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের বই পড়ে মানুষ হয়নি? এমন একটিও শিশু থেকেছে কি, যে একদা দুঃসাহসে ভর করে সোচ্চার ঘোষণায় মুখর হয়ে ওঠেনি 'অজগর তেড়ে আসছে' বটে, কিন্তু 'আমটি আমি পেড়ে খাবোই'।

নিতান্ত আজকের দিনের শিশুরা হয়তো বহুবিধ 'বর্ণ পরিচয়ের' অরণ্যে দিশেহারা হয়ে বেড়াচ্ছে, তাই বাংলার ঘরে ঘরে একই সুর ধ্বনিত হচ্ছেনা। কিন্তু একদা হয়েছে। বাংলার ঘরে ঘরে পৃথিবীর চিরন্তন লীলা রহস্যটি অবোধ শিশুকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে. 'ইঁদুর ছানা ভয়েই মরে। ঈগল পাখী পাছে ধরে।'

বাঙালী-জীবনে যোগীন্দ্র সরকারের অবদান কতখানি, সে কথা আজ ভাববার দিন এসেছে। আমরা যদি সেই অবদান সম্পর্কে উদাসীন থাকি, সেটা আমাদের পক্ষে লজ্জারই কথা। তবে আশার বিষয় যোগীন্দ্রনাথ সরকারের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে কিছু কিছু ভাবনা ও আলোচনা হচ্ছে।

আর এই আলোচনার মাধ্যমেই আমরা নতুন করে উপলব্ধি করছি, একদা যোগীন্দ্র সাহিত্য কেমন করে প্রত্যেকটি বাঙালীর মনোলোকে একটি খুসির রাখী পরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

সেই রাখী বন্ধনটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে আলোচনা ক্ষেত্রে। বক্তা যদি আলোচনা সূত্রে উল্লেখ করেন, 'দাদখানি চাল, মুসুরির ডাল, চিনিপাতা দৈ'—সঙ্গে সঙ্গেই শ্রোতাদের ভিতর একযোগে গুন গুনানি উঠবে, 'দুটো পাকা বেল সরিষার তেল, ডিম ভরা কৈ।'

অথবা বক্তা যেই বলে ওঠেন, আফ্রিকাতে কাফ্রী সুখে কাটিয়ে বারো মাস—অমনি সেই 'সুখের' প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে চিন্তা না এসে আমার আপনার মধ্যে ধ্বনিত হয়, 'সেই খানেতে কঙ্গো দেশে জঙ্গো করে বাস।'

সে ধ্বনি এগোতে এগোতে 'ঘুমের প্রকৃত ওষুধ' আবিষ্কারের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত না গিয়ে ছাড়েনা। কারণ কার না মনে আছে তার শেষ লাইনটি অবধি লেখকের নাম জেনে না জেনে, অথবা জেনে ভুলে গিয়েও তাঁর অনবদ্য রচনা গুলি বাংলাদেশ কণ্ঠস্থ করে রেখেছে। কিম্বা শুধুই কণ্ঠস্থও নয়। অন্তরস্থই বলা চলে।

অথচ এই আশ্চর্য ঘটনাটি সম্পর্কে আমরা যেন তেমন অবহিত নই। 'শিশু সাহিত্য' নিয়ে আলোচনা সভা বসিয়ে অনেক সময় আমরা যোগীন্দ্রনাথ সরকারের নাম উল্লেখ করতে ভুলে যাই। 'শিশু সাহিত্য' নিয়ে গবেষণা পুস্তক লিখতে বসে সে নামটি ছুঁয়ে যাই কি না যাই! শিশুদেরকে আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় নামাতে বসে অথবা স্কুলে পাঠশালায় তাদের দিয়ে আবৃত্তি করাতে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের কোনো ছড়ার কথা আমরা মনে আনতে চাই না।

অথচ কে না আমরা আমাদের সেই সোনার শৈশবে 'হাস খুসি' 'হাসিরাশি' 'হাসি ও খেলা' 'রাঙা ছবি' 'খুকু মণির ছড়া'র ছন্দ দোলায় বিভোর হয়েছি? আজও

তো দোলা ওঠে তার কোনো একটি লাইন কানে এলেই। তবু এই উদাসীন্য। আর একটি আশ্চর্য্য!

হয়তো যোগীন্দ্র সাহিত্যের সারল্য তার একটি কারণ। হয়তো যে অভ্যাসের বশে আমরা মাটির নীচের শিকড়টিকে ভুলে থাকি, সেই অভ্যাসটাই কারণ। হয়তো বা সেই যুগটা যে কোনো বিষয়েই তেমন সজাগ সচেতন ছিল না, সেটাও একটা কারণ। সে যুগ লেখাটাকে যতটা মনে রাখতো, 'লেখককে বোধ করি ততটা নয়।'

যদি বলা হয় আধুনিক শিশু সাহিত্যের পথিকৃৎ হচ্ছেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার, তা'হলে বোধকরি সেটা অত্যুক্তি হবে না। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের পরে ক্রমশঃ এসেছেন উপেন্দ্র কিশোর, কুলদা রঞ্জন, দক্ষিণারঞ্জন, সুকুমার (যতদুর স্মরণ হয় বোধ হয় অবনীন্দ্রনাথও) সুখলতা, নবকৃষ্ণ, এবং আরো অনেক জন।

কিন্তু যোগীন্দ্রনাথের মত এমনসব বয়সের ছেলে-মেয়ের জন্য সবরকম লেখা আর কেউ লিখেছেন কিনা সন্দেহ। শুধুই যে ছড়ার বই তা তো নয়, শিকার কাহিনী, ভ্রমণ কাহিনী, জীব জন্তুর কাহিনী, বিজ্ঞানের গল্প, ভূতের গল্প, রামায়ন মহাভারত, কী নয়?

নিতান্ত শৈশব কাল থেকে পুর্ণ কৈশোর পর্য্যন্ত শিশু চিত্তাকাশের সমস্ত দিগন্ত তিনি উন্মোচন করে দিয়েছেন তাঁর সোনার কাঠির জাদুতে। শুধু সেকালের পরি-প্রেক্ষিতে বিচার করেই নয়। আজকের দিনের কষ্টি-পাথরে যাচাই করে দেখলেও শিশু-সাহিত্য—গঙ্গার ভগীরথ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকারের এই বহু বর্ণের রচনা-সম্ভার বাস্তবিকই একটি বিস্ময়ের বস্তু।

এই শতবার্ষিকী স্মারক হয়তো অনেক পণ্ডিতজন, অনেক রসিকজন, অনেক স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁদের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে এবং নতুন যুগের দৃষ্টি ভঙ্গী দিয়ে যোগীন্দ্র সাহিত্যের নতুন মূল্যায়ন করবেন, তাতে যে শুধু কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করাই হবে' তা নয়, আজকের যুগও কিছু লাভবান হবে। নিতান্ত শিশুদের জন্য অনাবিল শিশু সাহিত্য তো বেশী রচিত হয় না।

আমার আলোচনা কিন্তু অন্য আর এক দিক থেকে। আমি যোগীন্দ্রনাথের ওই ছেলে ভুলনো ছড়া থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করে দেখাতে চাই এই সব সরল স্বচ্ছ নির্মল কৌতুকময় ছড়াগুলির মধ্যে কী ভাবে আত্মগোপন করে আছে লোকতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, বিচিত্র মনস্তত্ত্ব।

অবশ্য আমার এ আবিষ্কারটি একান্তই মৌলিক, এবং যে আবিষ্কারের জন্ম ক্ষণকালের খুসির মেজাজ থেকে।

প্রথমেই সেই অমর কাব্য চরণটি ধরা যাক—

'অয়ে অজগর আসছে তেড়ে,
আমটি আমি খাবো পেড়ে।

আমার মনে হয়—

এটি হচ্ছে মানুষের চিরন্তন দুর্দমনীয় লোভের মনস্তত্ত্ব। অজগর অবশ্যই ভয়ের প্রতীক? তা' সে ধর্ম ভয়, পাপপুণ্যের ভয়, আইনের ভয়, লোক-নিন্দার ভয়, নিষেধের ভয়, যাই হোক। কিন্তু মানুষের সেই চিরন্তন তৃতীয় রিপু সব ভয়কে তুচ্ছ করে গাছে ঝুলে থাকা পাকা আমটির দিকে হাত বাড়াবেই। যেমন বাড়িয়েছিল আদি মানবী 'ইভ্'।

আবার ওই ছড়ারই আর দুটি চরণ—

ইঁদুরছানা ভয়েই মরে,
ঈগল পাখী পাছে ধরে।'

ধরা যায়না কি, এর মধ্যে সুচিত হচ্ছে আবহমান কালের সেই প্রবল দুর্বলের ইতিহাস? চিরকালই ইঁদুর ছানারা ঈগলের ভয়ে কম্পমান। আর ঈগলরা—

আচ্ছা চলে আসা যাক, 'অ আ ক খ র' ছড়ায়—'অ আ দু'ভাই অজ বেয়াকুব আসল কুড়ের ধাড়ি, গোঁফ দাড়ি সব পাকনো, তবু বগলে পাততাড়ি।' (জানিনা যোগীন্দ্রনাথ সরকারের বইয়ের অনবদ্য ছবিগুলি কার আঁকা। মনে হয় আজও তার জুড়ি মেলা ভার।) এরা যেন জগতের বখা ধাড়ি ছেলেদের প্রতীক।

অথবা জগতের ভিজে বেড়ালের দলের প্রতীক সেই দুটি ভাই। 'ঋ ৯' দু' ভাই ভিজে বেড়াল ঋষির মত আজ, পরের গাছে ৯চু চুরি করতে না হয় লাজ।'

বর্ণমালার জঞ্জাল সাফ্ করতে ওই 'দু ভাই'কে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করার আয়োজন হয়েছে, বা হচ্ছে কিন্তু এই দুনিয়ার হাট থেকে? ভিজে বেড়ালদের তাড়ানো যাবে কি?

'হিজিবিজির'ই আর এক অসাধারণ ছড়া—

'রুইতন হরতন ইস্কাবন চিড়ে,
কেন বাপু মরিবে লোকের ভীড়ে।
আছে যারা দাঁড়িয়ে, দেয় যদি মাড়িয়ে।
ভুঁড়ি যাবে ভস্‌কে, টুঁটি যাবে ছিড়ে।

সমাজতত্বের কী স্পষ্ট ছবি। কিন্তু ভুঁড়ি ভস্‌কাবার প্রতিকার? অতএব কী করা?

তারও উপদেশ আছে। অতএব—
'চেঁচামেচি রাখো, লুকাইয়া থাকো,
পাখী যথা চুপচাপ বসে থাকে নীড়ে।'

* * * *

এই ঘেরাওয়ের যুগ সেই পূর্ব যুগের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ হাসি হাসবে, না সক্ষোভ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলবে?

তারপর দেখি 'মজার মুল্লুক।'

যার সুরু হয়েছে 'রাত্তিরেতে বেজায় রোদ, আর দিনে চাঁদের আলো—' দিয়ে। কবি এর মধ্যে শুধু অবাস্তবতার ছবিই আঁকতে চেয়েছিলেন, না ভবিষ্যতের ছবি আঁকতে চেয়েছিলেন?'

যে ভবিষ্যতে নেংটি ইঁদুর দেখে বিড়ালে ছুট মারবে, আর জিলিপিরা তেড়ে এসে মানুষকে কামড় দিতে চাইবে? ঘোড়ারা মানুষের মুখে লাগাম দিয়ে, তার পিঠে চড়ছে, আর ঘুড়ির হাতের বাঁশের লাটাইয়ে ছেলেরা উড়ছে, এ দৃশ্য কি দেখতে পাচ্ছি না আমরা?

অতএব যদি বলি দূরদ্রষ্টা কবি এই ছেলে ভুলনো ছড়ার মধ্যে ভবিষ্যৎ সমাজচিত্র এঁকে গেছেন, ভুল বলা হবে কি?......অবশ্য পরবর্তী ছড়া 'কালা ধলার' যুদ্ধ সমকালীন।

আর 'রামু শ্যামুর' কাহিনী?
সেতো চিরকালীন।

রামুরা যখন 'ক্ষুধার জ্বালায় কেঁদে কেঁদে টলে পড়ে, 'জননী' তখন শ্যামুকে কোলে বসিয়ে আহার দেন এই ত্রিজগতের রাষ্ট্রনীতি।

আবার শ্যামুর অপরাধে রামুর ছ'মাস জেল, এও অবশ্যই নিছক কৌতুক কথা নয়?

'হাসিরাশির' সেই বিখ্যাত কাহিনী 'ব্যাঙত্ব লাভটিই কি সব সময় তলিয়ে বুঝি আমরা? 'লিপ্ ফ্রগ, খেলতে খেলতে মনে প্রাণে আকৃতি প্রকৃতিতে ব্যাঙ্ হয়ে যাওয়া।

'গোল মাথা চ্যাপ্টা হলো লম্বা হলো ঠ্যাং
একেবারে হয়ে পড়লো আস্ত কোলা ব্যাঙ।'
এ কিসের ইঙ্গিত?

আর 'ছড়া ও পড়ার' সেই ওস্তাদ আর্টিষ্টটির আর্ট

একজিবিশনের ছবিটি কার না মনে আছে? যে তার ছবির পসরা দেয়ালে টাঙিয়ে সগর্বে ঘোষণা করছে—আমি—

'কুমীর যখন আঁকি,
সাধ্য কি যে ভাববে সেটা ভুতুম দেশের পাখী।
আঁকলে পরে মাছ,
বোকাগুলোই বলবে, 'এটা
রাম ছাগলের নাচ।'
আমার খুকি, খোকা।
হাতীও নয়, ঘোড়াও নয়, নয়কো তেলা পোকা।
বুঝছো তুমি ছাই—
খুঁৎটি ধরার আগে বাপু কায়দা শেখা চাই।'

এই ওস্তাদরা কি শুধু ওই 'ছড়া ও পড়ার' পাতার মধ্যেই অবস্থিত?

এমন অসংখ্য নমুনা আছে যোগীন্দ্রনাথের রচনার পাতায় পাতায়। কিন্তু অধিক নমুনায় পুঁথি বাড়ে।

অতএব এখানেই ইতি।

এই তুলনাগুলি, অথবা এই 'মৌলিক আবিষ্কার' নিতান্তই হাসি খুসি প্রসূত। তবু এই খেয়াল খুসির খেলাটি দিয়েই শ্রদ্ধার্ঘ জানাই সেই 'হাসিখুসির রাজা, হাসি ও খেলার রাজা, রাশি রাশি হাসির রাজা যোগীন্দ্রনাথ সরকারকে।

শৈশব বাল্য ভরাট ছিল যে ছড়া ও ছন্দে, পড়বার অভ্যাস হয়েছে যাঁর রচনা দিয়ে, আজও যাঁকে শিশুদের সবচেয়ে প্রিয় লেখক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক বলেই মনে করি, সেই যোগীন্দ্রনাথের এই শতবার্ষিকীর ডালায় আমার এই অর্ঘটি দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

আশা করছি এই উপলক্ষে আজকের শিশুদের কাছে নতুন করে আর বিশদ করে যোগীন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিচয় দেওয়া হবে। অবশ্য তাদের হাতে একবার তুলে দিতে পারলেই, তারা নিজেরা বুঝে নেবে, এ জিনিস 'বহুর' অরণ্যে হারিয়ে যাবার জিনিস নয়। এ সাহিত্য চির সবুজ, চির শ্যামল, চির সতেজ।

———

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

সামান্য একটি নাম।

একজন সাধারণ এণ্ট্রান্স পাশ করা ইস্কুল মাষ্টার, মাইনে মাত্র পনেরো টাকা, গ্রামের শিক্ষক,—নগণ্য ও সাধারণ। কিন্তু এই সাধারণ নামটিই বাংলা দেশে অসাধারণ বলে স্মরণীয় হয়ে রইল। একটি শতক উত্তীর্ণ হয়ে আজ তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী। এরমূলে ছিল শুধু একটি সত্য—ঐকান্তিক সাধনা। যে সাধনা ছোটদের একান্তভাবে শিক্ষা ও আনন্দবর্দ্ধনের সাধনা।

চব্বিশ পরগণার জয়নগর গ্রামে যোগীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন আজ থেকে একশো বছর আগে। গ্রামের ছেলে, গাঁয়ের ইস্কুলেই সুরু করেছিলেন লেখাপড়া। প্রাথমিক পড়া শেষ করে চলে যান দেওঘরে। সেখানে উচ্চ ইংরেজী ইস্কুলের পড়াশুনা শেষ করেন এবং সেখান থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন।

প্রবেশিকা পাশ করে কলিকাতায় এলেন, সিটি কলেজে ভর্তি হলেন এফ-এ পড়ার জন্য। কিন্তু পড়াশুনা বেশী দিন করা চললো না। কলিকাতায় থেকে পড়াশুনা করার যে খরচ সেই টাকার সংস্থান ছিল না। পড়াশুনা বন্ধ হলো।

এক ইস্কুলে চাকরী নিলেন শিক্ষকের, মাইনে পনেরো টাকা। তখনকার দিনের পনেরো টাকা এখনকারদিনের মতো নয়। সেকালের চারটে পয়সা খরচ করলে একটি মানুষের একবেলা পেট ভরে খাওয়া হতো। তবু টাকার অঙ্ক হিসাবে মাইনেটা কমই বলতে হবে।

এই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াতে পড়াতে তাদের মনের খবর তিনি পেলেন, আর সেই শিশুমনকে খুশি করার কাজে তিনি মেতে উঠলেন। সুরু হল ছোটদের অ-আ ক-খ থেকে। বই লিখলেন—হাসিখুসি।

হাসিখুসি শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়, বিশ্ব-সাহিত্যে একখানি স্মরণীয় শিশুদের শিক্ষার বই। যে যুগে এই বইখানি রচিত হয়েছিল সেযুগে শিশুমন নিয়ে এতো গবেষণা হয়নি শিশুশিক্ষাকে এখনকার মত জাতীয় সমস্যা বলেও প্রাধান্য দেওয়া হতো না ডক্টর ফ্রয়েবল এর কিণ্ডারগার্টেন ও ডক্টর মন্তেসরির পদ্ধতি তখনও শিক্ষিত সমাজে আলোড়ন তোলে নি। গতানুগতিক যা চলছে তাই মানুষ চালাচ্ছে। সেই সময় আমাদের মতো একটা অনগ্রসর পরাধীন দেশে বর্ণ-পরিচয়ের সহজ মাধ্যম হাসিখুসি প্রকাশিত হওয়া এবং তার পরিকল্পনা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার, যোগীন্দ্রবাবু সেই বিস্ময়ের স্রষ্টা। হাসিখুসি তিনি লিখলেন। অ-আ, ক-খ যে ছাড়া তার কোথাও একটা যুক্তাক্ষর নেই। ছোটদের উচ্চারণে কোথাও কোন বাধা নেই, জলের মত তারা বলে যাবে। ছবি দেখে ছড়া মুখস্ত হবে, তারপর অক্ষরের পরিচয় হবে অনায়াসে। ছোটদের সঙ্গে একাত্ম না হলে এ ধরণের ধারণা মনে আসে না। ছোটদের সঙ্গে সেই আত্মীয়তার বন্ধন যোগীন্দ্রবাবুর ছিল।

হাসিখুসির হারাধনের দশটি ছেলের কাহিনী বাংলাদেশে বিখ্যাত। এক থেকে দশ অবধি শেখা, তার যোগ আর বিয়োগ করার এমন সাবলীল ছন্দরূপ তাঁর আগে আর কারও মনে আসে নি।

হাসিখুসির স্বীকৃতিও যোগীনবাবু পেলেন। সেযুগে ভাল বইকে ভালো বলতে সুধীসমাজে বাধতো না। বইয়ের প্রচার সুরু হলো। যোগীনবাবু এবার আরো বই লিখলেন—হাসিখুসি, চমচম, রাঙাছবি ইত্যাদি। ছোটদের কৌতূহল মেটানোর জন্য জন্তু জানোয়ার নিয়েও তিনি বই লিখলেন—চিড়িয়াখানা ও বনে জঙ্গলে। ছোটরা ছড়া ভালবাসে, সেই জন্য তিনি ছোটদের শত শত ছড়া সংগ্রহ করে একখানি বই করলেন—খুকুমণির ছড়া।

বই বিক্রি হয়, খ্যাতি হয়। এবার শিক্ষকতা ছেড়ে তিনি বই প্রকাশের ব্যবসা সুরু করলেন। টাকা পয়সা সামান্য যা হাতে এলো গিরিডিতে তিনি একখানি বাড়ী করলেন—গোলকুঠি। কলিকাতার আবহাওয়ায় প্রাণ যখনই হাঁপিয়ে উঠতো তখনই তিনি গিরিডিতে গিয়ে থাকতেন। জীবনের শেষ ক'বছর তিনি গিরিডিতেই কাটিয়ে ছিলেন।

যোগীনবাবু যা কিছু লিখেছেন সবই ছোটদের জন্য। তাঁর বইয়ের আকার ছোট কিন্তু ছোটদের একান্ত উপযোগী। জীবনে তিনি অবকাশ পেয়েছিলেন আরো বই লিখতে পারতেন কিন্তু পঞ্চাশখানি বই তিনি লিখে যেতে পারেন নি। শেষ বয়সে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, ডান হাতখানি অবশ হয়ে যায়, তখন বাঁ হাত দিয়ে তাঁকে লেখার অভ্যাস করতে হয়।

প্রখ্যাত ডাক্তার স্যার নীলরতনের তিনি ছিলেন ছোট ভাই।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কাছে তাঁর যাওয়া-আসা ছিল।

বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায়ের তিনি ছিলেন অন্তরঙ্গ। দুজনেরই মাছ ধরার সখ ছিল, একসঙ্গে মাছ ধরতেন। দুজনেই মাছের 'চার' নিজেরা তৈরী করতেন। সারদাবাবু বলতেন—আমার চারের নাম 'ইধার আও'। যোগীবাবু বলতেন—আমার চারের নাম 'উধার মত যাও'।

যোগীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে ম্যাকসিম গোর্কির শিশুসাহিত্য সম্পর্কিত মন্তব্যটি মনে পড়ে—'To successfully create fiction and educative literature for children we need the following : first, writers of talent capable of writing simply, interesting and meaning-fully ; then editors of culture, with sufficient political and literary training, and finally the technical facilities to guarantee timely publication and due quality, of books for children, যোগীন্দ্রনাথের মধ্যে এই তিনটি গুণই ছিল হাসিখুসির শতাধিক সংস্করণের প্রকাশেই তা প্রমাণিত হয়েছে।

আজ যোগীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী হচ্ছে। বিলাতে পিটার প্যানের মর্মরমূর্তি আছে। কলিকাতায় হারাধনের দশটি ছেলের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করার কথা শিক্ষাবিদরা কি চিন্তা করতে পারেন ? অবশ্য কলিকাতা লণ্ডন নয় তা জানি।

যোগীন্দ্রনাথ ও নবকৃষ্ণ

শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য

প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক স্বর্গত যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সহিত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের প্রথম পরিচয় ঠিক কিভাবে হয়, তা সঠিক জানা না থাকলেও একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, যেক্ষেত্রে দু'জনেরই উদ্দেশ্য এক সেক্ষেত্রে যে কোন সূত্রেই উভয়ের পরিচয় ঘটা স্বাভাবিক। তবে এটাই মনে হয় যে, নবকৃষ্ণ যখন প্রমদাচরণ সেন প্রবর্তিত 'সখা' ছোটদের বিখ্যাত প্রাচীন মাসিক পত্রিকা) সম্পাদনা করেন, সেই সময় থেকেই এঁদের উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। যোগীন্দ্রনাথ ও নবকৃষ্ণ উভয়েই ছিলেন বয়সে প্রায় সমবয়স্ক।

যে সুযোগ অন্বেষণ করে সুযোগও যে তার কাছে এসে দেখা দেয়, যোগীন্দ্রনাথের জীবনেও ঘটেছিল তাই। 'সখা' পত্রিকাখানি যখন নানা কারণে উঠে যায়, তখন যোগীন্দ্রনাথ বন্ধু নবকৃষ্ণের সহায়তায় 'সখা'র সমস্ত ব্লকগুলি কিনে নেন এবং এ থেকেই তিনি পুস্তক রচনা ও ব্যবসায়ের একটি বিশেষ প্রেরণা লাভ করেন।

যোগীন্দ্রনাথ ও নবকৃষ্ণের মধ্যে হৃদ্যতা যে কত গভীর ছিল এবং পরস্পর পরস্পরকে যে কিভাবে দেখতেন তার বহু নিদর্শন আছে। যোগীন্দ্রনাথ যখনই নবকৃষ্ণকে পত্র লিখতেন, তখনই 'ভাই নবকৃষ্ণ' বলে সম্বোধন করতেন এবং শেষে লিখতেন 'তোমার যোগিনী'। তাঁদের এই ভালবাসা জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। আজকের দিনে সাহিত্যিকদের মধ্যে এই প্রীতি বিরল বললেও অত্যুক্তি হয় না।

তৎকালীন এই দুই শিশু-সাহিত্যিক বন্ধুর জীবনের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার কথা বলি।

একবার জয়নগরে যোগীনবাবুর বাড়িতে গিয়েছেন নবকৃষ্ণ। যোগীনবাবু, নবকৃষ্ণ ও সিটি বুক সোসাইটির (যোগীনবাবুর বইয়ের দোকান) বিশ্বস্ত কর্মচারী কেশববাবুর প্রচেষ্টায় সন্ধ্যার অন্ধকারেই মাছ ধরা হ'ল এবং সকলে মিলে চড়ুইভাতি হ'ল সেখানে। নবকৃষ্ণকে কাছে পেয়ে যোগীন্দ্রনাথ আনন্দে যেন আত্মহারা হয়ে গেলেন।

আর একদিনের ঘটনা। শারদীয়া উৎসব আরম্ভ হতে আর বাকী মাত্র কয়েক দিন। যোগীন্দ্রনাথ হঠাৎ নবকৃষ্ণর কাছে এসে বললেন, 'তোমায় ভাই সাত-আট দিনের মধ্যেই একখানি বই লিখে দিতে হবে। আমি উপহারের জন্য 'সিটি বুক' থেকে সেটি প্রকাশ করব।' যোগীনের অনুরোধ নবকৃষ্ণ ঠেলতে পারলেন না। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করলেন। সে বইখানি নবকৃষ্ণের 'টুকটুকে রামায়ণ'। যোগীনবাবুই এই বইয়ের নামকরণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই বই লেখার ব্যাপারে যোগীন্দ্রনাথ বন্ধুর জন্য যে কতখানি শ্রম স্বীকার ও আন্তরিকতা দেখিয়েছিলেন, সেই কথাটাই এবার বলি।

হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্কোয়ারের (এখন মহাত্মা গান্ধী রোড) মোড়ে 'নবীন ফার্মাসী'র উপর তখন ছিল শ্রীকান্তের হোটেল। এই হোটেলের পাশের একখানি ঘর যোগীন্দ্রনাথ নবকৃষ্ণের এই কাজের জন্য স্থির করে

দেন। প্রত্যেক দিন যথারীতি বিকালে যোগীন্দ্রনাথ সেখানে যেতেন এবং দু'জনে এক সঙ্গে টিফিন খেয়ে বেড়াতে বেরুতেন। যোগীন্দ্রনাথের এই যত্ন ও চেষ্টা না থাকলে, এত অল্প সময়ের মধ্যে বইখানি প্রকাশ হ'ত কিনা সন্দেহ।

যোগীন্দ্রনাথ অনেকের কাছেই বলতেন, 'নবকৃষ্ণ ভট্টাচায্যি হলে কি হবে, পছন্দেও সাহেবকেও হার মানিয়ে দেয়।' এছাড়া তিনি আরও বলতেন, 'নবকৃষ্ণের 'ছেলেখেলা' বইখানি যে কি বস্তু, আমাদের দেশ তা বুঝল না। এটা দেশের দুর্ভাগ্য।'

যোগীন্দ্রনাথের বইয়ের অনেক ব্লকই নবকৃষ্ণ তাঁর বইয়ে ব্যবহার, করতেন। এটা বলাই ছিল যে, নবকৃষ্ণ যখন যে ব্লকই চান না কেন, যেন তাঁকে দেওয়া হয়। তিনি সকলের কাছে এ কথাও বলতেন যে, নবকৃষ্ণ ও আমি পৃথক নয়। সত্যই এই সরল ও নিরহঙ্কার মানুষটির অন্তর বন্ধুর প্রতি' যে কি ভালবাসায় ভরা ছিল, তা বলে শেষ করা যায় না। একবার তাঁর ছেলের বিবাহের সামাজিক হিসাবে জলের জগটিও অসুস্থ নবকৃষ্ণকে পার্শেল করে দেশে (হাওড়ার নারিটি গ্রামে) না পাঠিয়ে তিনি অন্তরে শান্তি পাননি।

আর একটি ঘটনার কথা বলি। নবকৃষ্ণের বয়স যখন ৬০ বৎসরের উপর, তিনি তাঁর স্বগ্রামে আছেন, এমন সময় তাঁর নামে একটি ইন্সিওর সেখানে গিয়ে হাজির। তিনি তো অবাক, কোথা থেকে এ ইন্সিওর এলো—তাও আবার একেবারে ১৭৫ টাকার! পরে দেখা গেল, সে টাকা এসেছে বন্ধু যোগীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। আর তাতে লেখা, 'ভাই নবকৃষ্ণ, তোমার কতকগুলি লেখা আমি বই-এ দিয়েছি এবং সেই বই থেকে আমি বেশ কিছু টাকাও পেয়েছি। তোমায় তারই সামান্য কিছু পাঠিয়ে দিলুম। ভায়ের পাঠান টাকাটি গ্রহণ করলে বিশেষ সুখী হব।'

এতক্ষণ যোগীন্দ্রনাথ ও নবকৃষ্ণের পত্র-বিনিময়ের মধ্যে এবং উভয়ের মুখে যা শুনেছি, তারই কিছু কিছু উল্লেখ করায় চেষ্টা করেছি। এখন নিজের দু'একটি ব্যক্তিগত ঘটনার কথা বলে এই রচনা শেষ করব।

যোগীন্দ্রনাথের অনুসন্ধিৎসা ছিল অসাধারণ। ভবানী দত্ত লেনে ছিল বঙ্গবাসী পত্রিকার অফিস। আমি তখন ছিলাম ঐ পত্রিকার সহঃ সম্পাদক। যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় যোগীন্দ্রনাথও ছিলেন ভবানী দত্ত লেনের ওয়াই, এম, সি, এ বিল্ডিং-এর উপর তলায়। একদিন এই সময় হঠাৎ তিনি আমায় ডেকে পাঠিয়ে স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, ছোট মাছ বঁড়শীতে গেঁথে আমরা যে বড় মাছ ধরি, তাকে তোমরা 'জাওলা' না 'জিওলা' বলো? আমি যা জানি তা বলায় তিনি খুসি হলেন।

আর একদিন তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি গেলে তিনি বললেন, ভট্‌চায্যি এত নার্ভাস কেন? আজকাল চিঠি লিখলেই লেখে, 'এই হয়ত' তোমার কাছে আমার শেষ চিঠি, দিন ত' সন্নিকট'— ইত্যাদি। পরে তিনি নিজের হাত বার করে, কয়েক দিন পূর্বের কার্বঙ্কলের মত কিছু একটা অপারেশনের দাগ দেখিয়ে বলেছিলেন, ভট্‌চায্যিকে বলো, আমি তো তার মত হতাশ হই না।'

আমার মেজ ভাই সুপ্রভাত এক সময়ে চেঞ্জে গিয়ে তাঁর বারগাণ্ডার বাড়িতে প্রায় দেড় মাস ছিলেন। আমার ছোট ভাই গোকুলেশ্বর ও পরে আমিও সেখানে যাই। আমাদের জন্য জলখাবার আসত তাঁর গিরিডীর বাড়ি থেকে। পরে আমরা যখন চলে আসি, তখন তাঁর কি আক্ষেপ! কারণ. তাঁর আম বাগানে তখন আম ধরেছে, আর আমরা সেই আম খেয়ে আসতে পারলুম

না। কি স্নেহশীল অন্তঃকরণ, কি ভালবাসা। যতদিন সেখানে ছিলুম, মনে হত যেন নিজেদের বাড়িতেই আছি।

যোগীন্দ্রনাথ ও নবকৃষ্ণ দু'জনেই যখন অশক্ত, তখন যোগীনবাবুর পুত্র রুচিবাবু ও আমি চেষ্টায় ছিলাম যে, কোন রকমে যোগীন বাবুকে ধরাধরি করে নামিয়ে, গাড়িতে করে নবকৃষ্ণর বাসার জানলার কাছে নিয়ে গিয়ে দুই ভাইয়ের শেষ একবার সাক্ষাৎ করিয়ে দেব। কিন্তু সে চেষ্টা আমাদের ফলবতী হবার পূর্ব্বেই কাল যোগীন্দ্রনাথকে নবকৃষ্ণের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল।
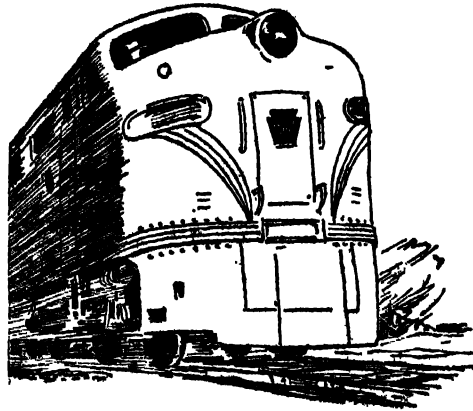
যোগীন্দ্রনাথ সরকার

অজয় হোম

আজ আমরা যাঁর জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে শ্রদ্ধা জানাতে সমবেত হয়েছি সেই যোগীন্দ্রনাথ সরকার ছিলেন যথার্থ এবং সার্থক শিশু-সাহিত্যিক।

যোগীন্দ্রনাথের আগে শিশু-সাহিত্য রচনায় কেউ কেউ হাত দিলেও তাঁরা কেউই একান্ত ভাবে শিশু-সাহিত্যিক ছিলেন না। ঠিক শিশু-সাহিত্য বলতে আজ আমরা যা বুঝি, তখন তা ছিলও না। ছিল অল্প বয়স্কদের জন্যে পাঠ্যপুস্তক। আর পাঠ্যপুস্তক যেটা নীতিমূলক রচনা। অবশ্য সেই অগ্রজরা ভিত্তি রচনা না করলে যোগীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটতো কিনা সন্দেহ। এঁদের মধ্যে যাঁরা ব্যতিক্রম ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন প্রমদাচরণ সেন। ইনি যোগীন্দ্রনাথের মতোই ছিলেন সিটিস্কুলের শিক্ষক। যাঁর একটি কবিতা শিশুকাল থেকে এখনও আমার মনের সুরে বাঁধা, যেটিকে যোগীন্দ্রনাথ তার প্রণীত ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'রাঙাছবি'তে স্থান দিয়েছিলেন, সেই—"আঃ! ছেড়ে দাও না কুকুরচন্দ্র। মায়ের কাছে যাই, এখন কী আর খেলা করবার সময় আছে ভাই? " অপর জন ছিলেন আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী। তৎকালীন শিশু অর্থাৎ জুভেনাইল পত্রিকা 'মুকুল'-এর সম্পাদক। আর ছিল 'ব্রাহ্মসমাজ'। যে প্রতিষ্ঠান সেদিন জাতীয় কল্যাণের সর্বাঙ্গীন কামনায় সৎ এবং সুন্দর শিশু-সাহিত্য রচনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। আর এঁরা সকলেই ছিলেন সেই ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত।

যোগীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনা তাঁর একক মননের সত্তার নয় অন্তরালে সক্রিয় হয়ে আছে একটি বিশাল যুগের বিপুল প্রাণ প্রেরণা। তাই যোগীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে গিয়ে মানসপটে ফুটে উঠছে উপেন্দ্রকিশোর, দক্ষিণারঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখদের। এঁরা সবাই বাংলা দেশের একটা সাধারণ যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁদের সামনে ছিল দুটি লক্ষ্য। একটি আত্মসংগঠন, অপরটি জাতীয়চেতনার উদ্বোধন।

বাইরে তখন দেশজুড়ে বিভিন্নমুখী আন্দোলনে, দেশের নেতারা অনুভব করলেন এইসব আন্দোলন ও আত্মবোধনকে যদি স্থায়ীরূপ দিতে হয় তবে শুরু করতে হবে একেবারে গোড়া থেকে। এই গোড়া বা মূল হচ্ছে দেশের শিশু। সৎ এবং সুন্দর সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে যদি ছোটদের মনোগঠন করতে পারা যায় তাহলে সেই মুহূর্তের সমস্ত সুচনা ভবিষ্যতে তার পরিপুর্ণতায় গিয়ে পৌঁছতে পারবে।

সেই যুগে মিশনারি সম্প্রদায় ও তাদের প্রভাবিত গোষ্টির হাত থেকে শিশু মনোগঠনের ভার কেড়ে নেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। প্রকাশ করেন বালকপাঠ্য প্রথম পাক্ষিকপত্র 'বালকবন্ধু' ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। সেই আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দুঃখ দারিদ্র আর অকাল মৃত্যুকে বরণ করলেন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত অসাধারণ শিশু-পত্রিকা 'সখা'র সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন। এগিয়ে এলেন আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে 'মুকুল' সম্পাদনার ভার নিয়ে। দেখা দিলেন উপেন্দ্রকিশোর, যোগীন্দ্রনাথ সরকার। যোগীনাথ বসু, সেই আদর্শের জন্যেই ছোটদের জন্য প্রবন্ধ কবিতা লিখলেন সখারাম গণেশ দেউস্কর ও বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল। ঠাকুর বাড়ির শিশু-পত্রিকা 'বালক'-এর জন্যে

প্রাণ মন ঢেলে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন অজস্র মন-ভরানো শিশু-কবিতা, পাঞ্জাব-মারাঠা ইতিহাসের কাহিনী, 'মুকুট'-এর মতো নাটক আর 'রাজর্ষি'র মতো উপন্যাস। দক্ষিণারঞ্জন এসেছিলেন আরও কিছু পরে বাঙালীর সামনে সেদিন স্বদেশ তার সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর রূপকথা বাংলা শিশু সাহিত্যের ডালি সাজানোর জন্যে নয়। তাঁর রচিত 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' বাঙালীর ঐতিহ্য সাধনার আর একদিক, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আত্মদীপনে ক'টি কল্যাণ প্রদীপ।

যোগীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁকে আজ আমরা একটি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিরূপে স্মরণ করতে পারছি না। আনন্দময় নির্মল শিশু-সাহিত্যের মাধ্যমে সর্বতোমুখী সুশিক্ষা সঞ্চারকে কতখানি সার্থক করে তোলা যায় যোগীন্দ্রনাথের বইগুলি তার উদাহরণ। কিন্তু তাঁর সফলতার পশ্চাৎপটে যে যুগচেতনা, যে কর্মোদ্যম, বিভিন্ন অনন্য ব্যক্তিত্বের যেসব প্রভাব নিহিত হয়ে আছে সে সম্বন্ধে অবহিত না হলে তাঁর শতবার্ষিকী স্মরণ সম্পূর্ণ অর্থহীন।

যোগীন্দ্রনাথ পাঁচ থেকে পনের ষোল বছরের শিশুদের মনের কাছে গত ৭৫ বছরের উপর ধরে আজও অম্লান মহিমায় বিরাজ করছেন। এই বিশেষ বয়সের সাহিত্য সৃষ্টিতে তিনি শুধু অপ্রতিদ্বন্দ্বী নন, সার্থকও। তিনি তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন 'মজার মুল্লুক'। যেখানে অবাস্তবও অতি সহজে সম্ভবপর। সেই মুল্লুকের প্রবেশ পথ খুলতে হয় কল্পলোকের চাবি দিয়ে। কারণ সে মুল্লুক, 'চোখ খুললে যায় না দেখা, মুদলে পরিষ্কার'।

শিশুদের অপরিহার্য সঙ্গী ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম বই 'হাসি ও খেলা' প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বাংলা ভাষায় এরূপ গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। ছেলেদের জন্যে যে বই আছে তা স্কুলে পড়িবার বই, তাহাতে স্নেহের ও সৌন্দর্যের লেশমাত্র নেই, তাহাতে যে পরিমাণে উৎপীড়ন হয় সে পরিমাণে উপকার হয়না।' নীতি উপদেশের প্রত্যক্ষ প্রভাব হতে মুক্ত নয়নমনলোভন 'হাসি ও খেলা'। শিশু-সাহিত্যের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল।

রাঙাছবি (১৮৯৬), হাসিখুসি (১৮৯৭), খেলার সাথী (১৮৯৮) এবং লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে প্রথম চয়নিকা 'খুকুমণির ছড়া' (১৮৯৯) প্রভৃতি শিশু-সাহিত্যের উৎসাহিত ধারা বেগবতী ও পুষ্ট হয়ে জাতীয় চিত্তপথে অগ্রসর হয়েছে। কে অস্বীকার করতে পারে শিশু-সাহিত্যে ও শিক্ষা জগতে যোগীন্দ্রনাথের যুগান্তকারী কীর্তি ছড়ার সাহায্যে বর্ণপরিচয় শেখানো?—

'অ-অজগর আসছে তেড়ে।
আ-আমটি আমি খাব পেড়ে।'

তিনি লেখেন নি কি? ছোটোদের জন্যে গল্প কবিতা ছাড়া জীবজন্তুর কাহিনী জীবনী সাহিত্য নানা বিষয়েই বই লিখেছেন। তাঁর ১৯১১ সালে প্রকাশিত জীববৃত্তান্তের বই 'পশু-পক্ষী' ১৯৫০ সালে আমি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত করতে গিয়ে নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করেছি। আশ্চর্য হয়েছি সে যুগে কতখানি শ্রমস্বীকার তাঁকে করতে হয়েছিল এই অমূল্যসম্পদ ছেলে বুড়ো সবার হাতে তুলে দিতে।

যোগীন্দ্রনাথের উপলব্ধ এবং নির্দেশিত শিশু-সাহিত্য সৃষ্টির পথ শিশুমনের স্বপ্নাতুর কল্পনা শক্তির উন্মেষের সহায়ক। একটা আশ্চর্যরকম দূরদৃষ্টি তার ছিল, যার প্রভাবে তিনি সাহিত্যের সাহায্যে একটা নতুন আনন্দজগৎ সৃষ্টি ক'রে সেখানে প্রবেশাধিকার দিলেন এমন অমৃতের সন্তানদের যারা কেবল মুগ্ধ এবং

বিস্মিত হতেই জানে, অবিশ্বাসীর সন্দিগ্ধ মন নিয়ে কি পেল না তার জন্যে অপেক্ষাও করে না, হিসেবও করে না।

সাধারণত লেখকের গল্পসৃষ্টির ক্ষমতা পাঠককে আনন্দ দিল কিনা, মুগ্ধ করল কিনা, তার কল্পনাকে উন্নত করতে পারল কিনা সেটাই বড়ো হয়ে দেখা দেয়। যোগীন্দ্রনাথ এই ক্ষমতা ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন প্রথম বাঙালী। এই বিচিত্র বর্ণের সাহিত্যরাজ্যে উত্তরণের প্রথম পথ নির্মাতা।

শিশু-সাহিত্যের পথিকৃতরূপে সামনে অগ্রসর হবার যে দিক তিনি নির্দেশ করে দিয়েছিলেন তার ক্রমপ্রসার পরবর্তী বহুজনের প্রয়াসে হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর নামটি উজ্জ্বল শিখার মতো এখনও ওই পথের নিশান আলোকিত করে রেখেছে। শুধু তাই নয়, ওই পথের প্রয়োজন কথা এখনও সকলকে নীরবে বলছে।

শিশুর চিত্তলোককে কল্পনার ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করার প্রয়োজন অত্যন্ত আবশ্যক এবং গভীর। এই প্রয়োজনে মনের প্রসার্যমান অনুভূতির ব্যাপক বিকাশ হয়। শিশুর মনের গোপন কোণে পুঞ্জীভূত জিজ্ঞাসার রহস্য থেকে হয় সব সময় বিচিত্র বর্ণের কল্পনা-কুসুমের প্রস্ফুটন। সংসারের ও ঘরের সীমিত পরিসরের মধ্যে সে তার আশা ও কল্পনাকে সংকুচিত করতে পারে না। এই পরম সত্যটি যোগীন্দ্রনাথ ধারণা করেছিলেন এবং গল্প-কাহিনীতে সে সবের আরম্ভ ও অফুরন্ত আয়োজন করে দেন। পাঠ্যপুস্তক ও গল্প-কাহিনীর পার্থক্য এবং প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর কৃতিত্ব।

এটা সত্য এবং অনস্বীকার্য যে তাঁর বহু রচনা বিদেশী সাহিত্য থেকে রূপান্তরিত। কিন্তু যোগীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের প্রকাশ হল পৃথক ভাষায় ও পৃথক পরিবেশে রচিত কাহিনী ও কথা আত্মস্থ করার এবং স্বীকরণের দ্বারা সম্পূর্ণ নবরূপ দেবার ক্ষমতায়। উদাহরণ স্বরূপ 'হাসিখুসি'র 'হারাধনের দশটি ছেলে' টেন লিটল্ নিগার বয়েজ-এর অনুকৃতি। কিন্তু টেন লিটল্ নিগার বয়েজ তার উৎস-সাহিত্যে প্রবচনের মর্যাদা পায়নি। সেখানে 'হারাধনের দশটি ছেলে' আমাদের বাংলা সাহিত্যে প্রবচনরূপে গৃহীত হয়েছে। আমরা ওই ছেলেদের ভাগ্য নিয়ে তুলনা দিই, রসিকতা করি, আক্ষেপও করি এবং দশ নম্বরী ছেলেটিকে বার বার বনেই পাঠাই। প্রসঙ্গত বলি, তাঁর 'হাসিখুসি' এক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় ছাড়া সর্বাধিক সংস্করণ—শততম সংস্করণের সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

যোগীন্দ্রনাথের অন্যদিক থেকেও প্রশংসা প্রাপ্য এবং তা দিতে আমরা যেন কখনও না কুণ্ঠিত হই। শিশুদের জন্যে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী নিয়ে রচনার ক্ষেত্রেও তিনি অনলস তৎপরতা দেখিয়েছেন। তাঁর রচিত ছোটদের রামায়ণ, ছোটদের মহাভারত, উশীনর, কুরুক্ষেত্র বা কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ, দ্রৌপদী, প্রহ্লাদ, রত্নাকর, লবকুশ, শকুন্তলা, শ্রীবৎস, সাবিত্রী-সত্যবান, সীতা, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ প্রাচীন ভারতের পুণ্যকথা পরিবেশন করেছে। শিশুর মানসক্ষেত্র উর্বর করার প্রয়োজনে ভারতের ধ্রুব-সাহিত্যের ভূমিকা যে কতো গুরুত্বপূর্ণ ও রমণীয়, আখ্যানের দিক থেকে এবং চরিত্রগঠনের উদ্দেশ্যে, একথাও তাঁর মানসপটে বিকশিত হয়েছিল। এসব বইয়ের বহু সংস্করণ শুধুমাত্র কাহিনীর নিজস্ব খ্যাতিতে বা রমণীয় গুণে নয়, বরং তা তাঁর রচনার প্রসাদগুণের জন্যেও বটে। একথাও স্মরণীয় যে শিশু-সাহিত্যে সাধু ভাষার পরিবর্তে কথ্য ভাষা ব্যবহারও প্রথম করেন যোগীন্দ্রনাথ।

আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। আমাদের লোক সাহিত্যের ভাণ্ডারে শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্যে

স্নেহাতুর ঠাকুমা মা মাসী পিসাদের রচিত অসংখ্য ছড়া আছে। যোগীন্দ্রনাথের আগে কোনো কোনো সাহিত্যরসিকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হলেও তিনিই 'খুকুমণির ছড়া' নামে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রথম প্রকাশ করেন। বলা যেতে পারে, এখানেও তিনি পথিকৃৎ।

তাঁর উপর ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ। তাঁর লেখার উপর যে মন্তব্য করেছিলেন সেটি খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছিলেন—"ছেলেদের যেমন চাই দুধ ভাত, তেমনি চাই গল্প। যে মা মাসিরা তাদের খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছে, এতকাল তারাই তাদের মিষ্টি গলায় গল্প জুগিয়ে এসেছে।

"ছেলেদের সেই সত্যযুগ আজ এসে ঠেকেছে কলিযুগে—আমাদের দিনের মা মাসিরা গেছেন গল্প ভুলে—কিন্তু ছেলেরা তাদের ফরমাস ভোলেনি। ছেলেরা আজও বলচে, গল্প বলো—। কিন্তু তাদের ঘরের মধ্যে গপ্‌প নেই। এই গল্পের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্যে যাঁরা কোমর বেঁধেছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য যোগীন্দ্রনাথ। তিনি নিজের সম্বল থেকেও কিছু দিচ্ছেন, ভিক্ষে করেও কিছু সংগ্রহ করেছেন। ছেলেরা ত' আশীর্বাদ করতে জানে না, সেই আশীর্বাদ করার ভার নিলেন—তাদের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ"

যোগীন্দ্রনাথকে নিয়ে বাংলার বর্তমান শিশু-সাহিতের আরম্ভ। তাঁর প্রদর্শিত ও নির্দেশিত পথে শিশু-সাহিত্য বহুদূর অগ্রসর হয়ে এসেছে। যুগে বা কালে অগ্রসর হয়েছে বটে কিন্তু সত্যিকারের শিশু-সাহিত্য যা আমাদের ছেলেবেলায় মন ভরিয়েছিল এখনও বার্ধক্যের সীমানায় এসে সেসব পড়লে আর-এক রসাস্বাদন করি। এই হল নিত্যসাহিত্য। শৈশবে কৈশোরে যৌবনে প্রৌঢ়ত্বে বা বার্ধক্যে একই গ্রন্থ থেকে এক এক বয়েসে এক এক রসাস্বাদন। বর্তমানের তথ্য প্রধান শিশু-সাহিত্য সে রস পরিবেশন করছে কিনা বুঝতে পারি নে। বর্তমানে শিশু-সাহিত্য আবার পুরাতন পথ অনুসরণ করবে কিনা বিচার করবার এখন উপযুক্ত সময়।

যোগীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ব্যক্তিগত একটি ঘটনা যেখানে তাঁর চরিত্রের একটি দিক উদ্‌ঘাটিত হবে সেই কথা উল্লেখ করে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষ করব।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর দাদামশায়ের বাড়ি ২৪ পরগনার অন্তর্গত জয়নগর গ্রামে বাংলা ১২৭৩ সালের ১২ কার্তিক রবিবার ইংরেজি ২৯শে অক্টোবর ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রাত্রি সাড়ে বারোটার সময় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্বর্গীয় নন্দলালদেব সরকার ধনী না হলেও গ্রামের মধ্যে সর্বজনমান্য মানুষ ছিলেন। যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন মাতা বাকমণির অষ্টম গর্ভের সন্তান। সেজন্যে প্রাচীন সংস্কার অনুযায়ী তিনি ভাবীকালে একজন মহৎ মানুষ হবেন, এই বিশ্বাসে ও আশায় তাঁকে বাড়ির শাসনে বহুদিন পর্যন্ত নিরামিষ খেতে হয়েছে।

যোগীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় শিক্ষালাভ করেন নিজ গ্রাম জয়নগরের বিদ্যালয়ে। পরে দেওঘর থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলকাতার সিটি কলেজে ভর্তি হন। কলেজে তিনি লাতিন ভাষা গ্রহণ করেন। সেসময় এই ভাষা খুব কম লোকেই পড়তো। মনে হয়, সেই জন্যেই তিনি এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। তাছাড়া ক্রমাগত দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ও লেখা পড়ায় অনেক অসুবিধের সৃষ্টি করে। লেখাপড়া ছেড়ে জীবন ধারণের জন্যে এবং একান্নবর্তী পরিবারের প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে সিটি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সমগ্র বিদ্যালয়ের ছোট বড়ো সকলের প্রীতির পাত্র হয়ে ওঠেন। প্রধান শিক্ষক

কৃষ্ণকুমার মিত্র যোগীন্দ্রনাথকে বড়োই স্নেহের চক্ষে দেখতেন।

শিক্ষকতা করতে করতেই তিনি মনের আনন্দে ছোটোদের জন্য লিখতে শুরু করেন এবং তাঁর বইয়ের দোকান 'সিটি বুক সোসাইটি' প্রবর্তন ক'রে শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রকাশে আত্মনিয়োগ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই অসামান্য সব পুস্তক প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর দারিদ্র্য ঘুচে যায়।

কলকাতা তাঁর কর্মস্থল এবং ব্যবসাস্থল হলেও তিনি নিরিবিলি পছন্দ করতেন। এই কারণে গিরিডিতে ছিল, বহু জমি ও বাড়ি। তাঁর বাড়ি 'গোলকুঠি'র, পাশের বাড়ি ছিল, আমাদের 'হোমভিলা।' পারিবারিক সৌহার্দ্য এবং অন্তরঙ্গতা ছাড়াও আমার মার দেশ তাঁরই গ্রামে ছিল বলে গ্রাম সম্পর্কে তিনি ডাকতেন যোগীনদা বলে। আমরাও তাই জ্ঞান হওয়া অবধি যোগীন মামাকে জানি।

পাঁচ থেকে পঁচাত্তর বছরের মানুষের সঙ্গে সমান ভাবে আড্ডা জমাতে আর কাউকে বিশেষ দেখি নি। আমাদের দুষ্টুমীতে খুশী হয়ে যেমন তাঁর কাছ থেকে তাঁর লেখা বই উপহার পেয়েছি, তেমনি পেয়েছি ভালো কাজেও। নতুন বই বেরলে বাবা-মাকে দিতেনই, আমরা যে কতো সময়ে পেয়েছি তার হিসেব নেই।

দেখেছি তাঁর মধুময় পারিবারিক জীবন। তাঁর স্ত্রী গিরিবালা আমাদের 'গিরিমাইমার' মতো সেবাপরায়ণা এবং পরের দুঃখে দুঃখী হতে অনেককেই দেখেছি কিন্তু পরের সুখে সুখী হতে আর কাউকে তেমন দেখিনি। ছেলেবুড়ো সবাইকে কাছে ডেকে যোগীন্দ্রনাথ আনন্দের আসর বসাতেন। মুখে মুখে ছড়া রচনায় ধাঁধাঁয় গল্পে গানে সকলকে মাতিয়ে তুলতেন। চিরকালের এক সদানন্দ পুরুষ তিনি। গোলমাল করার জন্যে ছোটোদের বকলে তিনি মনে বড়ো ব্যথা পেতেন। বলতেন, ওদের তোমরা কেউ বকোনা। ওদের ছাড়া আমি থাকতে পারি না। ওদের গোলমাল আমার ভালো লাগে।"

আবার দেখেছি বাড়ির ছেলেমেয়েরা কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে নীরবে দীর্ঘকাল রাত জেগে তাদের সেবা করতে। তিনি নিজে ছেলেবেলায় গরীব ছিলেন বলে গরীবের ব্যথা বুঝতেন। বহু দুঃস্থ এবং গরীব ছাত্রকে সাহায্যও করতেন।

গিরিডিতে কোজাগরী পূর্ণিমার দিন এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো। সেই পূর্ণিমা সম্মেলন-এর প্রবর্তক ছিলেন তিনি। মানুষের সঙ্গে সদ্ভাব ও প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখাকে সবসময় মূল্যবান বলে মনে করতেন।

তাঁর মুখে শুনেছি ছেলেবেলায় তিনি আমাদের মতোই দুরন্ত ছিলেন। আমাদের মতোই বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে এর বাড়ির আম ওর বাড়ির কাঁঠাল না বলে গ্রহণ করে দিব্যি বাল্যভোজ লাগাতেন এটা যে একটা অন্যায় বা অপরাধ দিলদরিয়া যোগীন্দ্রনাথের তা আদৌ মনে হতো না। তিনি নিজে যেমন খেতে পারতেন, তেমনি অপরকে খাইয়েও আনন্দ পেতেন।

ইংরেজি ১৯২৩ সালে যোগীন্দ্রনাথের শরীরে পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন থেকে তিনি মুখে মুখে ছড়া-কবিতা বলে যেতেন আর বাড়ির লোকেরা তা লিখে রাখতেন। বহুদিন তিনি পক্ষাঘাত-গ্রস্থ হয়ে ছিলেন।

যোগীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার শেষ অন্তরঙ্গতা ঘটে ইংরেজি ১৯৩১ সালে। গ্রীষ্মের ছুটিতে আমাদের বাড়ি যোগীন্দ্রনাথের 'গোলকুঠি'র পাশে 'হোমভিলা'য় আমি

একা আছি। বাড়ির লোকজন তখনও আসেনি। আর গোলকুঠির ঠিক পিছনেই আছি আমার সতীর্থ বন্ধু অসিত গুপ্ত তাদের বাড়িতে। অসিত যোগীন্দ্রনাথের সহোদর ভাই স্বর নীলরতন সরকারের শ্যালিকার ছোটো পুত্র।

সেবার গিরিডিতে অসহ্য গরম। দুপুরে অসিত আমার ওখানে। গরমের গুঁতোয় শুয়ে বসে আড্ডা দিয়ে কিছুতেই সুরাহা করতে পারছি না। ভিজে গামছা গায়ে জড়ালেও মিনিট খানেকের মধ্যে শুকিয়ে যাচ্ছে। বোধহয় তাপমাত্রা ১১৭ কি ১১৮° ডিগ্রি ফারেন-হাইট ছিল। অসিত বুদ্ধি বাতলালে, "আয়, আমরা গান গাই, তাহলে গরম বোধ চলে যাবে'। অসিতের বুদ্ধি চিরকালই এমন indigenous।......ব্যস, শুরু হয়ে গেল গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য খুলে গান; গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত গাইতে হবে। সুর জানার দরকার নেই। নিজস্ব সুরে গাইলেই চলবে। তাছাড়া দুজনেই আমরা অতিরিক্ত মাত্রায় অ-সুর। ধোপার গাধাও লজ্জা পায়। অসিত প্রতিটি চরণের গোড়ায় বিকট সুরে ও চিৎকারে একটা 'হেঁ-ই যোগ করে। আমি গানকে জোরদার করার জন্যে দু একটি বাক্য যোগ করি।

চিৎকার এবং অন্যান্য সব মাত্রা চড়িয়েই চলেছি। কতক্ষণ চলেছিল মনে নেই। ঘণ্টা দুয়েক তো নিশ্চয়ই। গীতাঞ্জলি শেষ করে গীতিমাল্য ধরেছি, এমন সময় যোগীন্দ্রনাথের পেয়ারের চাকর বেহারী এসে বলল, 'বড়োবাবু, আপনাদের দুজনকেই ডাকছেন। প্রমাদ গণলাম—সর্বনাশ। খেয়ালই হয়নি পাশের বাড়ীতে উনি অসুস্থ হয়ে আছেন।......কোনো রকমে গুটি গুটি পায়ে অত্যন্ত অপরাধীর ভাব করে তাঁর সামনে দাঁড়ালাম। দেখলাম মুখে একটা চাপা হাসি।

বললেন, "বাবারা। আমি আর বেশিদিন নেই। গরম যদিইবা সহ্য হয় কিন্তু তোদের গানের গুঁতোয় আমার প্রাণটা এখনই বেরবে বেরবে করছে। এই বুড়োটাকে মেরে তোমাদের কি কোনো লাভ হবে? তোমরা যে তাতার ভীষ্মলোচনকেও হার মানলে।" [তাতা—সুকুমার রায়ের ডাক নাম]। মাথা চুলকানো ছাড়া আর আমাদের কি করার থাকতে পারে।

তারপর বললেন, "বস, বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন।" আমাদের বসার পর বললেন "গানের এরকম সুর কোথা থেকে পেয়েছিলে?" ততক্ষণে সাহস একটু ফিরে এসেছে, বললাম, 'সুর তো সব জানি নে, নিজেরাই সুর দিয়ে নিয়েছি।"

হ্যাঁ সুর বটে।" বলেই হাসি। "কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি হেঁচকি দিয়ে হেঁ-ই 'আলোকেব এই ঝরণা ধারায় লিখেছিলেন?"

'না, ওটা আমাদের গানের জোর বাড়াবার জন্যে, দম নেবার জন্যে।' হা হা করে হেসে বললেন, "তা তো হল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো কোথাও অভিধান বহির্ভূত শব্দ ব্যবহার করেন নি, কিন্তু কানে আমার অনেক শব্দ এসেছে যা সংগীত কেন ভদ্রসমাজেও ব্যবহার হয় না। সেগুলির কারণ কি?"

আমতা আমতা করে বলি, 'ওটা গানের ফোর্স বাড়াবার জন্যে।

"গানে ফোর্স? সেটা আবার কি?"

'ধরুন, যদি বলেন, 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাইনে'—এটা যেন কিরকম মিনমিনে। ভগবান শুনবেন কেন? তাই ফোর্স দিয়ে বললে

ভগবানের টনক নড়বে, সেই জন্যে গেয়েছি মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, ওরে শালা চিরদিন কেন পাই নে।"

সঙ্গে সঙ্গে হো হো করে দিলখোলা হাসি। ওহে তোমরা যে হিরণ্যকশিপুকেও হার মানালে বলেই তাঁর স্ত্রীকে ডাকলেন, গিরি। গিরি!

গিরিমাইমা ট্রে তে করে তিন গেলাস বেলের সরবৎ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। যোগীন্দ্রনাথ আমাদের গানের খবর বলেন আর হাসেন। হ্যাঁ মাঝে মাঝে কেন, ঠিকই তো। তা চিরদিনের জন্যে তোমাদের আবেদনটা বেশ জোরদারই।......

চলে যখন আসছি গিরিমাইমা বললেন, তোমাদের চিৎকার সামনেই উপভোগ করেছেন, আর হেসেছেন শেষে বললেন, ছেলে দুটো গরমের গুঁতোয় চেল্লাচ্ছে; ওদের জন্যে বেলের সরবৎ করো, আমি ডেকে পাঠাই।

এই সদানন্দময়, শিশুসাহিত্যের পথিকৃৎ চিরাশিশু যোগীন্দ্রনাথ শনিবার ১২ই আষাঢ় ১৩৪৪ ইংরেজি ২৬শে জুন ১৯৩৭ নরদেহ ত্যাগ করে আনন্দলোকে প্রয়াণ করেন।

---

* সারা বাংলা সাহিত্য মেলা তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত ভাষণ। জয়দেব কেন্দুবিল্ব, ১৩ই জানুয়ারী ১৯৬৭।

যোগীন্দ্রনাথ

শ্রীরাণা বসু

বিংশ শতকে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজনের সাধনায় বাঙলা শিশু-সাহিত্য আজ গড়ে উঠেছে তাঁদেরই একজন হলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার।

শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'মুকুল'ই যোগীন্দ্রনাথ সরকারকে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট করে তোলে। যোগীন্দ্র-নাথের যে কবিতাগুলো আজও শিশুমহলে সমান সমাদৃত তাদের অধিকাংশেরই প্রকাশ ঘটে 'মুকুল' পত্রিকায়। 'শিশু' পত্রিকারও লেখক-লেখিকাদের অন্যতম ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ। উপেন্দ্র-কিশোর সম্পাদিত 'সন্দেশ' পত্রিকায় যোগীন্দ্রনাথ অনেক আজগুবী ছড়া লিখেছিলেন, যেগুলো পরে তাঁর 'হিজিবিজি' বইয়ে সংকলিত হয়।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার ছবি, গল্প ও ছড়ায় এক আশ্চর্য জগতের দুয়ার শিশুদের মধ্যে মুক্ত করে গেছেন। তাঁর বইয়ের সংখ্যা কম নয়, মৌলিক রচনা ও সম্পাদনা সংকলন ইত্যাদি ধরে তাঁর বইয়ের সংখ্যা চুয়াল্লিশ। তাঁর সব গ্রন্থই এখনো সমান প্রচারিত ও জনপ্রিয়।

যোগীন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থ 'জ্ঞান-মুকুল' আনুমানিক ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সহজ ভাষায় গল্প, নানারকম নীতিকথা, বিজ্ঞানের কথা ইত্যাদি বইখানাতে সংকলিত হয়। এর পরে যোগীন্দ্রনাথ 'হাসি ও খেলা' (১৮৯১) প্রণয়ন করেন। নিজের লেখা ছাড়াও তিনি 'হাসি ও খেলা'র মধ্যে প্রমদাচরণ, উপেন্দ্রকিশোর, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখের কয়েকটা রচনা সংকলন করেছিলেন। সংকলনটির অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলো ও তাদের বিষয় এবং বাইরের সাজ সমস্তই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কালে প্রকাশিত বালক-বালিকাদের সাহিত্য-গ্রন্থ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। গ্রন্থখানা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফাল্গুন, ১৩০১ বঙ্গাব্দের 'সাধনা' পত্রিকায় লিখে-ছিলেন : 'বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। ছেলেদের জন্য যে সকল বই আছে তাহা স্কুলে পড়িবার বই ; তাহাতে স্নেহের বা সৌন্দর্যের লেশমাত্র নাই, তাহাতে যে পরিমাণ উৎপীড়ন হয় সে পরিমাণে উপকার হয় না।'

বাস্তবিকই 'হাসি ও খেলা'-য় পাঠ্যপুস্তকের বিন্দুমাত্র শাসন বা আতঙ্ক ছিল না, তার জায়গায় শিশুরা আবিষ্কার করেছিল অনাবিল হাসি আর আনন্দ। সাফল্যে অনুপ্রাণিত হলে এর পর যোগীন্দ্রনাথের একের পর এক 'রাঙাছবি' (১৮৯৬) 'হাসিখুসি' (১৮৯০) এবং 'খেলার সাথী' (১৮৯৮) গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এছাড়াও 'খুকুমণির ছড়া' (১৮৯৯) নামে বাঙলা ছড়ার একটা সংকলনও তিনি প্রকাশ করেন।

'রাঙাছবির গল্প, পদ্য, ছবি সমস্তই শিশুর উপযোগী। এই বইয়ের সমস্ত রচনাই যোগীন্দ্রনাথ রচিত।

'হাসিখুসি' বইটার প্রাথমিক উদ্দেশ্য যদিও বর্ণশিক্ষা, তবু তার ভেতরও অনেক জায়গায় যোগীন্দ্রনাথের কৌতুকবোধ প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীবুদ্ধদেব বসু তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন : (তাঁর যোগীন্দ্রনাথ সরকার) বর্ণমালার উদাহরণে বিশেষ্য ছাড়া কিছু নেই, আর সেই বস্তুগুলিও অধিকাংশই সজীব, যথাসম্ভব পশুপাখি থেকে গৃহীত—যেখানে শিশুর মন তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়—।'

যোগীন্দ্রনাথ তাঁর 'হাসিখুসি'-তে ছোটদের যে অক্ষর

পরিচয় করিয়েছেন তার অনেকগুলোই আজগুবী কবিতা যেমন :

য-ফলা উঁচিয়ে লাঠি
হাঁকে মার-মার
র-ফলা আসছে তেড়ে
বাগিয়ে তলোয়ার
ল-ফলা ডিগবাজী খায়
মাটির 'পরে লুটি'
ব-ফলা নাচতে এসে
হেসেই কুটি কুটি।

যোগীন্দ্রনাথের একটি মহৎ কর্ম 'খুকুমণির ছড়া' নামে বাঙ্গালার ছড়া সংগ্রহ। এই সংকলনে চারশ দশটা ছড়া আছে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী গ্রন্থভূমিকায় লিখেছে: বাঙ্গালাতে এইরূপ গ্রন্থের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। ...তিনিই বাঙ্গালীর মধ্যে এই ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পথপ্রদর্শক ...।'

এইভাবে এক একখানা মজাদার বই ও অপূর্ব সংকলনের মাধ্যমে যোগীন্দ্রনাথ শিশুরাজ্য জয় করেন। পূর্বে তাঁর যে গ্রন্থগুলোর নাম উল্লেখ করেছি সেগুলোর পর ছবির বই (১৯০২,) 'হাসিরাশি' (১৯০২) এবং 'নূতন ছবি' (১৯০৩) বইগুলো প্রকাশিত হয়। প্রকৃতই ছ-সাত বছরের নিচেকার শিশুদের আদর্শ লেখক ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ। 'হাসিখুসি, 'হাসিরাশি' ইত্যাদি তার প্রমাণ।

যোগীন্দ্রনাথ ছোটদের জন্যে অনেক মজার মজার গল্পও লিখেছিলেন। তাঁর গল্প গ্রন্থগুলোর ভেতর 'মজার গল্প' 'ছবি ও গল্প' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যোগীন্দ্রনাথের আরো বই আছে। 'ছোটদের রামায়ণ' 'ছোটদের মহাভারত' 'পশুপক্ষী' 'ছোটদের চিড়িয়াখানা' 'বনে-জঙ্গলে' 'আষাঢ়ে স্বপ্ন' 'হিজিবিজি' ইত্যাদি বইয়ের নাম কে না জানে, কে না এই বইগুলো বাল্যে অথবা কৈশোরে পড়েছে।

পাঁচ থেকে আট-দশ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের মনোরাজ্যে যোগীন্দ্রনাথ সরকার একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে বসে আছেন। শিশুর মন সহজেই তিনি বুঝতেন। তাই তাঁর প্রত্যেকটা সাহিত্যসৃষ্টি আগাগোড়া শৈশবের রসে সবুজ, কিশলয়ের মতো কাঁচা।

শিশু সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার

শঙ্কর মিত্র

মানুষ প্রথম পৃথিবী যখন দেখে তার চোখে অপরিসীম বিস্ময় এবং কৌতুহল থাকে। আকাশের আলো আর মায়ের মুখের বিচিত্র শব্দ সে অবাক হয়ে শোনে। একদিন বিস্ময় শেষে পরিণত বয়সে জীবন জিজ্ঞাসা হয়। এই জীবন জিজ্ঞাসার শুরুতেই মানুষ প্রচণ্ড ভাবে ভালোবাসে দেশকে আর দেশের ভাষাকে। কিন্তু শৈশবে থাকে বিস্ময়ের কল্পনা আর জল্পনার রং। শৈশবে সিঁড়ি দিয়ে টলতে টলতে উপরে উঠে, নিচে নামে। অসংখ্যবার তার পতন হয়, রক্তপাত হয়, অবশেষে এই শিশু পরিণত যুবক হয়, শক্ত কাঁধের অধিকারী হয়, দুঃসাহসিক হয়—বার বার এরাই সোজা চলতি পথে না যেয়ে বেহিসাবী কাণ্ড কারখানা করে বসে: বিদ্যাসাগরের দুষ্টু গোপালের মত তারা এমন সব দুরন্তপনা করে বসে, যার ধাক্কায় ইতিহাসের চাকা অনেকটা ঘুরে যায়।

কিন্তু শৈশব থেকেই মন তৈরী করার পালা। কল্পনা-প্রিয় হতে ভালোবাসে অসংখ্য প্রশ্ন মনের আনাচে-কানাচে ভিড় করে—তখন থেকে চরিত্র সৃষ্টি হতে সুরু করে; সেই চরিত্রের প্রতিচ্ছায়া একটি জাতের মানস দর্পনে ধরা পড়ে। একটি জাতির অপমৃত্যু ঘটে যদি শিশুদের যারা জাতির ভবিষ্যৎ মানস-সন্তান, চারিত্রিক সংগঠন অবহেলিত হয়—ভিটামিন ট্যাবলেটের অভাবে নয়।

শিশুদের কল্পনা-জল্পনা অসংখ্য প্রশ্ন, গভীর কৌতুহল বোধকে রং-রসে-যুক্তি দিয়ে শিক্ষাবিদরাই বৈজ্ঞানিক পথে চালিত করেন। শিশু সাহিত্যিকরাই অন্যতম শিক্ষাবিদ এবং শিশুর মানস গঠনকারী বললে অত্যুক্তি হ'বে না।

বাংলা দেশে বিদ্যাসাগরই নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে যত রাজ্যের আগাছা দুই হাতে পরিষ্কার করে শিশুদের জন্য ভাবনার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে শিশুদের অভিভাবকদের মস্ত বড় ভাবনার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। "জল পড়ে, পাতা নড়ে-"র মধ্যে শিশুর কল্পনার চোখ বিস্তৃততর হলো। শিশু সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শাখা হলেও তথাকথিত সমালোচকেরা উন্নাসিক ছিলেন এই শাখাটিকে স্বীকার করে নিতে। রবীন্দ্রনাথ শিশু-সাহিত্যকে আরো গভীরতর করে তুললেন এবং আভিজাত্য দিলেন। যোগীন্দ্রনাথ সরকার বুঝলেন, নিছক সাহিত্য রসের জন্য অভিভাবকেরা কিছু ব্যয় করতে কিঞ্চিত কৃপণ। পাঠ্য পুস্তক রচনার মাধ্যমেই শিশুদের জন্য মানসিক খাদ্য দেওয়ার প্রয়োজন। যোগীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা এবং শুভেচ্ছা পেয়ে মিশনারিদের মত উৎসাহ নিয়ে শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনায় ব্রতী হলেন। অর্দ্ধশতকের পূর্বে যে কোন মানুষ সহজেই স্মরণে আনতে পারেন, তাঁদের শৈশবে যোগীন্দ্রনাথ কি ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন।

সেদিক থেকে হ্যান্স এ্যাণ্ডারসনের সংগে যোগীন্দ্রনাথকে এক আসনে বসানো যায়। যদিও রূপকথার যাদুকর হ্যান্স এ্যাণ্ডারসন কোপেনহেগেনে আঠারোশ পঁচাত্তর সালের আগষ্ট মাসের চার তারিখে মারা গিয়েছিলেন। ড্যানিস গল্পকারের মৃত্যুর নয় বৎসর পূর্বে যোগীন্দ্রনাথ আঠারোশ ছেষট্টি সালে চব্বিশ পরগণার জয়নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পৃথিবীর দুই প্রান্তেই ভৌগোলিক দূরত্ব এবং সময়ের ব্যবধান সত্ত্বেও দুজনেরই জীবনের বিভিন্ন দিকে সমতুলতা খুঁজে পাওয়া যায়।

দু'জনেই সারাজীবন শিশুদের কথা ভেবেছেন ভালোবেসেছেন আর তাদের জন্য অফুরন্ত লিখেছেন। উভয়েই রোগাক্রান্ত হয়ে বার্দ্ধক্যের দিনগুলি অতিবাহিত করেছেন।

যোগীন্দ্রনাথের সাহিত্য কর্মের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য শিশুপাঠ্য ছড়ার বই, কবিতা এবং গল্পগুচ্ছ, ভারতীয় মহাকাব্যের কাহিনী, লোকগাথা, প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক রচনা, বিদেশী লেখকদের অনুবাদ, হাল্কা হাসির নক্সা, ধাঁধা, বিভিন্ন লেখকদের রচনার সংকলন প্রভৃতি।

যোগীন্দ্রনাথের গল্প সঞ্চয়ের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, বিভিন্ন লেখকদের সংকলন করে যোগীন্দ্রনাথ শিশু সাহিত্যের দুর্ভিক্ষ রোধ করেছে। তিনি সখেদে বলেছিলেন ঠাকুরমা-দিদিমারাই শিশুদের কল্পনার জগতে টেনে নিয়ে যান; কিন্তু ঠাকুরমা-দিদিমারা গল্প বলতে ক্রমশ: ভুলে যাচ্ছেন। আক্ষেপ আমাদেরও করে লাভ নেই। স্পেস্ জয় যেদিন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে সেদিন চাঁদ বুড়ীর গল্প বলার মানুষ থাকবে না, শোনার শিশুও থাকবে না। জানি না, টেকনোক্র্যাসীর আক্রমণে কৌতূহল বিস্ময় একদিন কোথাও হারিয়ে যাবে কিনা। যোগীন্দ্রনাথ শিশু-সাহিতের রত্ন-সম্ভার সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি উনিশশো আট সালে সুনির্বাচিত সংগীত মালা প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ এই সংগীতমালার খণ্ডকে প্রশংসা করেন।

যোগীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হলো, সহজ সরল শব্দ চয়ন, শিশু মনঃস্তত্ত্বে অভিজ্ঞতা। শিশুদের গল্প শোনাবার মত করে গল্প লিখেছেন যোগীন্দ্রনাথ—কলমের তুলি দিয়ে জলরংয়ের ছবি এঁকে গেছেন তার সাহিত্য কর্মে। হাসি ও খেলা (প্রথম প্রকাশ আঠারোশ একানব্বুই) তাঁর প্রাণময় সৃষ্টির অন্যতম উদাহরণ।

যোগীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যের আরেকজন পৃষ্টপোষকতা করতেন। তিনি হলেন, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী। যোগীন্দ্রনাথ অনেক পরিশ্রমে এবং আয়াসে পুরাতন বাংলার ছড়া, ঘুমপাড়ানী গান প্রভৃতি সংগ্রহ করে "খুকুমনির ছড়া" প্রকাশ করেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী খুকুমনির ছড়ার ভূমিকায় লিখেছিলেন: যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সংগৃহীত ছড়া থেকে অনেক ঘটনা এবং তথ্য বাংলাদেশের ভবিষ্যত ম্যাক্স মুলারের গবেষণার কাজে যথেষ্ট সাহায্য পাবে।

শিশুপাঠ্য অভিজ্ঞ ইংরাজ সমালোচকেরা যোগীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যে অবদান অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর অনেক রচনাই মৌলিক অবস্থায় নার্সারী স্কুলগুলিতে তাদের পাঠ্য পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যোগীন্দ্রনাথের খ্যাতি এবং প্রতিভা সুদুর জেনেভায় স্বীকৃত হয়েছিল। উনিশশো ছব্বিশ সালে জেনেভাতে আন্তর্জাতিক শিশু পাঠাগার উন্মোচিত হয়েছিল এবং সেখানে যোগীন্দ্রনাথের পুস্তকাবলী প্রদর্শিত হয়েছিল। যোগীন্দ্রনাথের অন্যতম বিখ্যাত শিশুপাঠ্য "হাসি খুশী" শিশুকালে পাঠ করেন নি, এমন কোন বাঙ্গালী এই শতকে জন্মেছেন কিনা সন্দেহ। এই শিশুপাঠ্য পুস্তকটির ১০৪ সংস্করণ চলছে। বইটির জনপ্রিয়তা নি:সন্দেহে প্রমাণিত হয়।

উনবিংশ শতকে বাংলাদেশে লোক শিক্ষার সূচনা হয়েছিল। বিদ্যাসাগর শিক্ষাবিস্তারের বিরাট কর্মকাণ্ড শুরু করেছিলেন, বিবেকানন্দ চরম পরিণতি দিয়েছিলেন লোক শিক্ষার প্রয়াসে, রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করলেন, লেখকেরা বিলাসী শিল্পের আত্মমগ্ন চর্চায় নিজেদের নিয়োজিত না করে, সাহিত্য কর্মী হলেন। গজদন্ত মিনার থেকে নেমে এলেন সাহিত্যিকরা জনসাধারণের মনকে সাহিত্য রসে মাজ্জিত করে তুলতে সচেষ্ট হলেন যোগীন্দ্রনাথ। লোক শিক্ষার জন্য তিনি সস্তাদামের বই প্রকাশ করেছিলেন।

শুধু লোকশিক্ষাই নয়, শিক্ষার সমস্ত ব্যাপারেই তিনি এমন আত্মস্থ ছিলেন শিশুদের জন্য অংকের যোগ বিয়োগ খুব সহজ, সরল ভংগীতে বুঝিয়েছিলেন। বিভীষিকার মত যে অংক শিশুদের মাথায় দাপাদাপি করে, 'হারাধনের দশটি ছেলে', ছড়ার মধ্যে অনেকে মজার খেলার মত বুঝিয়েছেন। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই ছড়াটি মেয়েদের বাঁচিয়েছে অংক সেখানোর মত বিশ্রী ব্যাপারে বিব্রত হওয়া থেকে।

পারিবারিক জীবনে তিনি পিতামাতার অষ্টম সন্তান এবং ডাক্তার (স্যার) নীলরতন সরকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। কিছু দিনের জন্য যোগীন্দ্রনাথ সিটি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন। শিক্ষক হিসাবেও তিনি ছাত্রদের প্রিয়জন ছিলেন। নিয়ম কানুনের নাগ পাশে বন্দী কিশোরেরা যখন ক্লান্ত হয়ে উঠত, শিক্ষক যোগীন্দ্রনাথ তাদের মজার মজার গল্প শুনিয়ে বিমর্ষ মুখে হাসি ফোটাতেন। ছাত্ররা একাগ্র-মনে শিক্ষকের গল্প শুনতো; শুনতে শুনতে ছাত্ররা কল্পনার ফানুসে চেপে রূপকথার রংগীন রাজত্বে চলে যেত।

শিক্ষকতার জালে জড়িয়ে পড়ার বাসনা ছিলনা যোগীন্দ্রনাথের। সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ সময় শিশুসাহিত্য রচনায় নিজেকে নিমগ্ন করেছিলেন। প্রথম দিকে প্রচণ্ড বাধাবিপত্তির মুখোমুখী তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। শিশুসাহিত্য প্রকাশের প্রকাশক পাননি। যোগীন্দ্রনাথ নিজেই প্রকাশনার দায়িত্ব নিলেন। নিজের এবং অপর লেখকদের বই প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। শিশুদের ভালোবেসেই এই বিরাট দায়িত্বভার তিনি নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন। তিনি যে ঘরে সত্তর বছর পুর্বে তাঁর প্রকাশন শুরু করে-ছিলেন সেই ঘরে আজও তার স্বপ্নের কাজ চলছে। সেদিনের শিশুরা যাদের যোগীন্দ্রনাথ আঙ্গুল ধরে রূপকথার পথে হাঁটিয়েছেন, তাঁরা আজ বয়স্ক নাগরিক হয়েছেন—তাঁরা আগামী কালের শিশুদের জন্য সেই ঘরকে পবিত্র মিউজিয়াম করতে পারেন না?

যোগীন্দ্রনাথের কর্মজীবনের সম্ভবতঃ স্মরণীয় মুহূর্ত হলো পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত মুকুলের সহকারী সম্পাদকের দায়িত্বের দিনগুলো। বাইশ বৎসর বয়সে তার বিকাশ এবং দীপ্তি দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের সংগে সংগে তিনি তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি পান এবং বর্তমানে কাব্যগ্রন্থ দুটি মুদ্রিত নেই।

প্রচণ্ড পরিশ্রমে, ভাবনা চিন্তায় ক্লান্ত হয়ে পড়তেন যোগীন্দ্রনাথ; বছরের কয়েক মাস গিরিডির বাড়ী গোল কুঠিতে দিন কাটাতেন। অবসর যাপন করতে এসেও তিনি নিঃসঙ্গ হতেন না কখনো। তাঁর গোল কুঠির বাড়ীতে গুণীজনের সমাবেশ ঘটত। পুর্ণিমা-র রাত্রে তিনি পুর্ণিমা সম্মেলন ডাকতেন; এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন রুচিবান প্রবাসী বাঙ্গালীরা।

আস্তে আস্তে যোগীন্দ্রনাথ নিঃশেষ হয়ে আস-ছিলেন। উনিশশো তেইশ সালে তার ডান অংশ পক্ষা-ঘাতে আক্রান্ত হয়ে পড়লে, অদম্য উৎসাহ নিয়ে বাম হাতে লিখলেন 'বনে জংগলে।' এই সময় তার সহকারিণী ছিলেন তাঁর স্ত্রী। যোগীন্দ্রনাথের দীর্ঘ দিনের কর্ম সহচরী আজও জীবিতা আছেন।

যোগীন্দ্রনাথের জীবনে দেশপ্রেমের উত্তাল তরংগ এসেছিলো। বংগভংগ আন্দোলনে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশপ্রেমের সংগীত এবং কবিতার সংকলন 'বন্দেমাতম' প্রকাশ করে ছিলেন। এই কাব্যগ্রন্থটির পনেরো দিনের মধ্যে তিনটি সংস্করণ প্রকাশ করতে হয়েছিল।

রূপকথার যাদুকর যোগীন্দ্রনাথ সব বলা শেষ করে, সব কাজ বন্ধ করে, সব ভাবনা চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত করে, শিশুদের প্রিয় সঙ্গী হওয়ার বাসনা সত্বেও একদিন ক্লান্তির শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন। রূপকথার কল্পনার নানা রংয়ের ফানুস সাজিয়ে নিজেই একদিন কোথায় হারিয়ে গেলেন।

শিশুদের কাছে দুর্যোগের মত কোলকাতার একটি দিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে ছাব্বিশে জুন, উনিশশো সাঁইত্রিশ সাল।
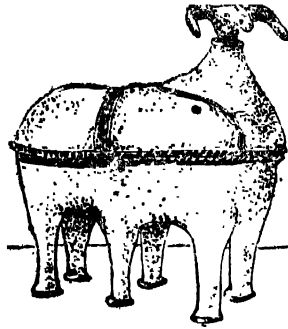
ভগীরথ যোগীন্দ্রনাথ

শ্রীসত্যব্রত বসু

"এক যে আছে মজার দেশ,
সব রকমে ভালো,
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ
দিনে চাঁদের আলো।"

শুধু কি তাই। সে দেশে—'ডাঙ্গায় চরে রুই কাতলা, জলের মাঝে চিল।' যদি সেই দেশটা সত্যিই দেখতে পাওয়া যেত, তবে কি মজাই না হত। কিন্তু খুব সাবধান, তোমরা যখন সেই দেশটার মজার মজার ঘটনা দেখবে বলে ভাবছ, তখন যদি দেখতে পাও—

"জিলিপি সে তেড়ে এসে
কামড় দিতে চায়
কচুরি আর রসগোল্লা
ছেলে ধরে খায়।"

—তাহলে ?

ভয় নেই—ভয় নেই! চোখ খুললেই আর সে দেশ দেখতে পাওয়া যায় না।

আচ্ছা বাঘ দেখলে ত ভয় পাও। শুয়োর দেখলে ভয় ত পাওই, আবার গা ঘিনঘিনও করে। কিন্তু—

বাঘের মুখে ঝুলত যদি
রাম ছাগলের দাড়ি,
শুয়োর যদি পাখীর মত
উড়তো ডানা নাড়ি;

—তাহলে!

তোমরা কি কেউ ভয় পেতে ? মোটেই না। অবাক হয়ে যেতে ঐ সব মজার চেহারার জানোয়ার দেখে। মজার দেশ, মজার জানোয়ারদের কথা তোমরা ভাবলে।

এই রকম সব মজার দেশের খবর। মজার মজার জন্তু-জানোয়ারের কথা আর মজার মজার ছেলেমেয়েদের কথা শুনতে সত্যিই তোমাদের মজা লাগে জানি। আমাদের ছোটবেলায়ও এই রকম মজার ছড়া, গল্প, কবিতা, ধাঁধা আমরা পড়তাম। কিন্তু এখন তোমরা নানা রকম রংচং করা, ছবি-ভরা গল্প-ছড়ার বই পড়তে পাচ্ছো, আমাদের ছোটবেলায় কিন্তু তা ছিল না। সেই কবে পড়েছি—'অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাবো পেড়ে।' পড়েছি—'হারাধনের দশটি ছেলে ঘোরে পাড়াময়,' সত্যি বলতে কি—অনেক রকমের, অনেক রঙের ছবি-ছড়ায় ভরা প্রথমভাগ বই অনেক বেরিয়েছে, কিন্তু 'হাসিখুসি'র মত একখানাও কি মনকে ভরিয়ে তুলতে পেরেছে ?

ভাবতে অবাক লাগে প্রায় ৭৫ বৎসর আগে যখন ছোটদের পাঠ্যবই ছাড়া আর কোন বই ছিল না, যা পড়ে তারা আনন্দ পেত, তখন একজন শিশু-দরদী শিক্ষক ছোটদের সাহিত্য রচনায় এগিয়ে এলেন। তিনিই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে, ছোটদের কচিকাঁচা মনের নানান জিনিসকে জানাবার ইচ্ছা শুধু পাঠ্য বই পড়েই মেটে না। তাই বাংলা ভাষায় প্রথম শিশু-সাহিত্য সংকলন প্রকাশ করলেন তিনি "হাসি ও খেলা" নাম দিয়ে। ১৮৯১ সালের জানুয়ারী মাসে। নানারকমের গল্প, ছড়া, ধাঁধায় ভরা এই অভিনব সংকলন ছোট বড় সকলকে খুশী করেছিল। খুলে দিয়েছিল বাংলা সাহিত্যের নতুন দিগন্ত। এই পথের দিশারী

হলেন মনীষী যোগীন্দ্রনাথ সরকার। তাঁর প্রকাশিত 'হাসি ও খেলা' "ছবি ও গল্প', 'রাঙাছবি', 'হাসিখুসি', যে পথের সন্ধান দিয়েছিল, সেই পথে এগিয়ে এলেন উপেন্দ্রকিশোর, দ্বিজেন্দ্রনাথ, কুলদারঞ্জন, সুকুমার, নবকৃষ্ণ, দক্ষিণারঞ্জন এবং আরও যশস্বী শিশু-সাহিত্যিক, যাঁদের প্রতিভার ছোঁয়ায় ভরে উঠল বাংলার শিশু-সাহিত্যের ভাণ্ডার নতুন নতুন ভাবধারার মণিমানিকে।

এই মনীষী জন্মেছিলেন আজ থেকে প্রায় ৯৯ বছর আগে ১২৭৩ সালের ১২ই কার্তিক। ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর গ্রামে তাঁর মামার বাড়িতে। ছোটবেলা সেখানে এবং তারপর দেওঘরে পড়াশুনা করে দেওঘর থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। তারপর কলকাতার সিটি কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু নানা অসুবিধায় পড়া ছেড়ে দিয়ে সিটি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা আনন্দমোহন বসু এবং প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন।

যোগীন্দ্রনাথ শিশুদের জন্য বই লিখে তাদের যেমন খুশী করার চেষ্টা করতেন, তেমনি তাদের ভালোও বাসতেন তিনি খুব। যোগীন্দ্রনাথ ছোটদের কোনদিন ছোট করে দেখেননি, তাই 'প্রার্থনা' কবিতায় তিনি বলেছেন—

'ছোট তারা হাসে আকাশের গায়ে
ছোট ফুল ফোটে গাছে
ছোট বটে তবু তোমার জগতে
আমাদেরো কাজ আছে।'

বাংলা সাহিত্যে যিনি নতুন স্রোত নিয়ে এলেন তাঁর শতবার্ষিকী এগিয়ে আসছে। তাঁর কাছে ভারতবর্ষ, বিশেষ করে বাংলা দেশ যে কত ঋণী তা বুঝবার এবং সে ঋণ স্বীকার করার সুযোগ আসছে।

পশ্চিমের রূপকথার যাদুকর হান্স অ্যাণ্ডারসনের স্মৃতিরক্ষার মত স্মৃতিকীর্তির আশা না করলেও এমন কিছু ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আশা করা অনুচিত হবে না, যা সগর্বে সকলে স্মরণ করতে পারবে, বলতে পারবে—আমরা শিশু সাহিত্যে ভগীরথকে ভুলিনি। (আনন্দমেলা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫শে অক্টোবর ১৯৬৫)
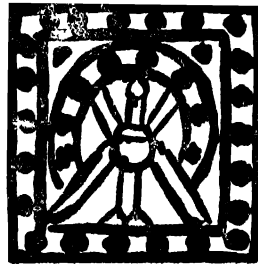
হাসিখুসি যোগীন্দ্রনাথ

প্রভাত শীল

আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর, বাংলা ১২ই কার্তিক ১২৭৩ সালে জয়নগরে মামাদের ঘরে তাঁর জন্ম হয়। সাত ভাই-বোনেদের কোলে ছোট ছেলে, আদুরে ছেলে হয়ে তিনি জন্মালেন মা-বাবা, দাদা-দিদি, মাসী-পিসীদের বুকভরা ভালবাসা আদর প্রাণভরে পেলেন। একশো বছর আগে অমন একটী ছেলেই তো শুধু নয়, অমন লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েই তো জন্মেছিল মায়ের কোলে—আদর ভালোবাসা সবাই পেয়েছিল। কিন্তু ঐ একটি ছেলে যোগীন্দ্রনাথকে বেছে নিয়ে, তাঁর কথাই শোনাতে বসলাম কেন আজ একশো বছর পরে। এ কথার জবাবে বলবো—লক্ষ লক্ষ কেন গত একশো বছরে যে কোটী কোটী ছেলেমেয়ে জন্মেছিলেন বাংলা দেশের ঘরে ঘরে, তাঁদের মধ্যে ক'জন বেঁচে আছেন আজও লক্ষ কোটী মায়ের মুখের ছড়ায় কিংবা লক্ষ লক্ষ শিশু হাতেখড়ি হওয়ার পর, পড়া শেখার পড়ায়? আর সর্বজনের গর্ব আদরের ভালোবাসায়।

এমন অমর সৃষ্টি তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল তার কারণ ছোটদের ভাল বাসার, আদর করে তাদের দুঃখ ঘোচাবার চোখের জল মোছাবার আগ্রহ আর উৎসাহে ভরা ছিল যোগীন্দ্রনাথের সমস্ত মন সারাটী জীবন। তাই একশো বছর পরে যোগীন্দ্রনাথকে স্মরণ ও প্রণাম করার জন্যে সারা দেশ জুড়ে হতে চলেছে যোগীন্দ্রনাথ জন্ম শতবার্ষিকীর বিরাট আয়োজন। সে আয়োজন সে উৎসবে ছোটবড় সবাইকেই সাড়া দিতে হবে, সবাইকেই এগিয়ে আসতে হবে। বিশেষ করে যাদের বয়স আজ ছয় থেকে ষাটের কোটায়—যোগীন্দ্রনাথই ছিলেন তাদের অক্ষর পরিচয়ের প্রথম গুরুমশাই। তাঁদের হাতে খড়ির পর অক্ষর চিনতে বর্ণপরিচয় করতে হাতে নিতে হয়ে ছিল "হাসিখুশি" বই।

এমন সহজ করে গল্প বলার ভাষায়—ছোটদের জন্যই শুধু নয়, বড়দের জন্যেও বই লেখার ব্যবস্থা যোগীন্দ্রনাথই সর্ব প্রথম করেন। অমন করে মিষ্টি ভাষায় সে যুগেই শুধু নয় এ যুগেই বা ক'জন ছোটদের জন্যে অমন বই লিখতে পেরেছেন? অধিকাংশ ছোটদের বইই এখনও খটোমটো ভাষা আর ভাবে ভরা। যোগীন্দ্রনাথই প্রথম শেখান—ছোট ছোট খোকা-খুকুদের বইগুলো হওয়া চাই—ভালোবাসা মিষ্টিকথা আর স্পষ্ট ছবিতে ঠাসা, অক্ষরগুলো হবে বড় বড় আর খুব সহজ হবে তার ভাষা তাঁর প্রতিটি বই-ই তাই বড় অক্ষরে ছাপানো। পড়াটাই যে ছড়া, আর ছড়াই যে পড়া হওয়া উচিত এই ব্যবস্থা এখন চালু হয়েছে অনেকেরই ইস্কুলে—ছোটদের বন্ধু যোগীন্দ্রনাথ সরকারই সে ব্যবস্থার মূলে—তিনিই পথটা প্রথম দেখান প্রথম শেখান—ছোটদের জন্যে 'ছড়া ও পড়া' নাম দিয়ে একখানি বই বার করে। হেসে আনন্দ বাড়াতে—আর ভয় না পেয়ে সাহস বাড়াতে সাধ জাগে ছোট বেলাতেই।

সে সব গল্পও তিনি লিখে গেছেন 'নতুন ছবি', 'ছোটদের চিড়িয়াখানা' 'জানোয়ারের কাণ্ড' 'বনে-জঙ্গলে—এইরকম কখানা বইতে। তাঁর লেখা বই গুণতিতে হবে প্রায় পঁচিশখানা। যারা পারবো সবগুলোই খুঁজে পেতে নিয়ে সেগুলো পড়বো। আর একশো বছর আগে যিনি জন্মেছিলেন—ছোটদের বন্ধু হয়ে—আজ যোগীন্দ্রনাথ সরকার শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে হাসিমুখে আনন্দে তাঁকে সবাই স্মরণ করে প্রণাম জানাবো।

* (নৈবেদ্য, বার্ষিক পুজা স্মারক পত্রিকা। সাম্মলিত নিমতলা আদি সার্বজনীন কালীপুজা। ১৩৭৩।)

যোগীন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী স্মরণে

(নিজস্ব প্রতিনিধি, যুগান্তর)

'হাসিখুশি' আগাগোড়া মুখস্থ বলে যেতে পারেন বাংলা দেশে আবাল-বৃদ্ধ বনিতা এমন খুব কম নেই, কিন্তু হাসিখুশির লেখকটি কে, তিনি কেমন লোকটি ছিলেন—তা বলতে পারেন এমন লোকের সংখ্যা যে যথেষ্ট নয় এ কথা দুঃখের হলেও স্বীকার না করে উপায় নেই।

পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এমন একটি বাঙ্গালীকেও খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ যিনি 'হাসিখুশি' না পড়ে শিক্ষার প্রথম পাঠ নিয়েছেন। অনেকের মতে বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয়ের চেয়েও শিশুদের কাছে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুশি'র কদর অনেক বেশী। 'অ-য়ে অজগর আসছে তেড়ে' দিয়ে স্বরবর্ণ চেনার সঙ্গে সেই যে ছন্দ আর মিলের দোল সুরু হয়ে যায় শিশুর মনে—তা ছড়ার মধ্যে দিয়ে পড়ার প্রতি তার অধিকতর আকর্ষণ জাগায়। শিশুদের কাছে পড়ার আকর্ষণ জোগাবার মত এমন খোরাক যোগীন্দ্রনাথের মত এদেশে তার আগে আর কেউই দিতে পারেন নি। তার পরে যাঁরা শিশুদের জন্য মধুর স্বাদের আমদানী করেন সাহিত্যে; তারা হলেন উপেন্দ্রকিশোর, কুলদারঞ্জন, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সুকুমার, নবকৃষ্ণ, দক্ষিণারঞ্জন প্রমুখ লেখকরা।

১৮৯৩ সালে প্রকাশিত 'হাসিখুশি'ই যোগীন্দ্রনাথের প্রথম বই নয়, তারও আগে ১৮৯১ সালে কচি কাচা মনগুলোর কথা ভেবে পঁচিশ বছরের যুবক, শিশু দরদী শিক্ষক যোগীন্দ্রনাথ গল্প, ছড়া ও ধাঁধায় ভরা যে অপূর্ব এক সঙ্কলন শিশুদের হাতে তুলে দিলেন, সেই 'হাসি ও খেলা' লেখায় এবং রেখায় শিশুসাহিত্যে এক নব-দিগন্ত উন্মোচিত করল।

ইংরেজীতে যা হল নন্‌সেন্স ভার্স, বাংলায় তাকে বলা হয় ছেলে ভুলোন, আজগুবি ছড়া। এই নন্‌সেন্স বা আজগুবি ছড়ার প্রতি শিশুর টান বুঝি বা চিরকালের ইংরেজী ভাষায় শত শত বছর যাবৎ এমন কত ছড়া লেখা হয়েছে তার হিসেব নেই। বাংলাতেও এমন অসংখ্য ছড়া লোকের মুখে মুখে ফিরে আসছে কোন্ অতীত কাল থেকে। সেসব ছড়া-রচনার ইতিহাস এমন কি অনেক ক্ষেত্রে রচয়িতার নাম পর্যন্ত আমাদের জানার উপায় নেই। এমন অনেক ছড়া র'য়েছে যার অর্থ একান্ত অবাস্তব, অযৌক্তিক—কিন্তু শিশু আধো আধো বুলিতেও তা কণ্ঠস্থ করেছে অর্থ দুরুহ হ'লেও তার কল্পনা দিয়ে তাকে একান্ত নিজের করে নিয়েছে। এইভাবে ঘুম পাড়ানী মাসীর গান গেয়ে বাংলা দেশের মায়েরা কত শত বছর ছেলেমেয়েকে ঘুমের দেশে, স্বপ্নের জগতে পৌঁছে দিয়েছে তারও হিসেব নেই।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের কিছু কিছু ছড়া সংগ্রহ ক'রে মেয়েলি ছড়া নামে এ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও এ ধরনের কিছু কিছু ছড়া প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু শিশুদের হাতে যোগীন্দ্রনাথ ১৩০৬ সালে যখন 'খুকুমণির ছড়া' নামে তাঁর সংগৃহীত ছড়ার একটি সঙ্কলন বই তুলে দিলেন তখন তা শুধু খুকুমণিদের নয়, বড়োদেরও সন্ধান আকৃষ্ট করেছিল। এতে ছিল ৪১০টি ছড়া, ছেলেভুলোন আজগুবি ছড়াও ছিল বেশ কিছু।

যোগীন্দ্রনাথ আজগুবি ছড়া এ ছাড়াও প্রচুর লিখেছেন। 'হিজিবিজি' নাম দিয়ে পরে তা সঙ্কলন গ্রন্থ হয়ে বের হ'য়। যোগীন্দ্রনাথের 'মজার মুল্লুক' নামে একটি বিখ্যাত আজগুবি ছড়ার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করছি —এটা রয়েছে তার 'হাসিরাশি'তে—

'এক যে আছে মজার দেশ
সব রকমে ভালো,
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ
দিনের চাঁদের আলো।
আকাশ সেথা সবুজ বরণ
গাছের পাতা নীল
ডাঙ্গায় চড়ে রুই কাতলা,
জলের মাঝে চিল্।'

অতি সহজ ভাষায় রহস্য করে সত্যকে মিথ্যা, নিয়মকে অনিয়মে এনে সরস বর্ণনাময় এমন একটি নিখুঁত ছবি আর একটি পাওয়া যাবে? কিন্তু শুধু এইটুকু মাত্র নয়। সেই দেশের আরো উল্টোপাল্টা নিয়ম আছে, যা শিশুদের মনে রীতিমতো চমক সৃষ্টি করে কল্পনায় সে দেশের তারা আর এক ছবি রচনা করে, যখন দেখে—

'সেই দেশেতে বেড়াল পালায়
নেংটি ইঁদুর দেখে;
ছেলেরা খায় ক্যাষ্টর-অয়েল
রসগোল্লা রেখে।'

শুধু কি বর্ণনা। ছড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবি, অসংখ্য এবং কত মজাদর।

যোগীন্দ্রনাথের আর একখানি মজার এবং উপভোগ্য ছড়ার একটি অংশ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ছড়াটির নাম 'তখন আর এখন'—সঙ্গে একটি পালোয়ানের ছবি ঘাড়ের ওপর লম্বা লোহার বাঁকানো রড—তার ওপর সে তুলেছে তিনটে হাতী—

ছড়ার সব শেষে রয়েছে—
হাতী নিয়ে লোফালুফি
ছিল আমার কাজ
সবাই আমায় ডাকত সেদিন
মল্ল মহারাজ।
সেদিন আর নাইকো রে ভাই.
সেদিন আর নাই—
তিনটি হাতীর ভারেই এখন
হাঁপিয়ে মারা যাই।'

এ ধরণেরই মজার আরও কয়েকটি ছড়া যেমন 'চ্যাপ্টা নাকে চশমা আঁটা গুরুমহাশয়' কিংবা 'দাদ্খানি চাল মুসুরির ডাল' ইত্যাদি ছড়ার পংক্তিগুলো তো সর্বজনবিদিত।

ছোটদের জন্য ছড়া, ছবি, গল্প ও কাহিনীমূলক বই এবং সঙ্কলন মিলিয়ে তাঁর বই মোট ত্রিশটি। এ ছাড়া পৌরাণিক কতকগুলো চরিত্র ছোটদের জন্য বাছাই ক'রে প্রথমে সংক্ষেপে তার কাহিনীটুকু বিবৃত ক'রেছেন তারপর পৌরাণিক গ্রন্থ থেকে ঐ অংশ তুলে ছোট ছোট বই আকারে তা প্রকাশ করা হয়েছে এমন বই-এর সংখ্যা তাঁর ২১ টি। নানা শ্রেনীর উপযোগী তাঁর লেখা পাঠ্য বই রয়েছে ১৬।১৭ টি। হাসিখুশির হিন্দী ও অসমীয়া এ দুটি ভাষায় অনুবাদও হয়েছে।

যোগীন্দ্রনাথের কর্ম কৃতিত্বের সঙ্গে সকলেরই অল্প বিস্তর পরিচয় আছে, কিন্তু তার জীবনীর সঙ্গে হয়ত নেই। বাংলার ১২৭৩ সালের ১২ই কার্তিক ২৪-পরগণার জয়নগর গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা নন্দলাল সরকার ও মা থাকোমণি দেবী। অত্যন্ত কৃতী ও যশস্বী পরিবার হিসেবে তাঁদের পরিবারের খ্যাতি ছিল। শোনা যায়

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব এই একই বংশের বিভিন্ন শাখার। যোগীন্দ্রনাথ তাঁর মা'র অষ্টম গর্ভের সন্তান। তাঁর তিন দাদা অবিনাশচন্দ্র, নীলরতন ও উপেন্দ্রনাথের মধ্যে মধ্যম ডঃ নীলরতন চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। যোগীন্দ্রনাথের জন্ম মাতুলালয়ে। বাল্যে আর্থিক অসচ্ছল অবস্থার মধ্যে কাটলেও জয়নগরে মুক্ত প্রকৃতির উদার অঙ্গনে একান্ত সহজ, আবহাওয়ায় খোলা ও অন্তরঙ্গ মন নিয়েই তিনি বড় হ'তে পেরেছিলেন। হাসিখুশি মেজাজের এই মানুষের হাতেই তাই হাসিখুশির অমৃত বিতরণ সম্ভব হ'য়েছে।

দেওঘর থেকে প্রবেশিকা পাশের পর সিটি কলেজে এলেন পড়তে—নানা কারণে পড়া আর শেষ হয়ে ওঠেনি—। এই সময় তাকে রেঙ্গুণে পাঠাবার কথা হয়ে ছিল—কিন্তু মত ছিল না যোগীন্দ্রনাথের। অবশেষে অনুরোধে পড়ে যখন জাহাজঘাটায় এলেন তখন জাহাজ কুল ছেড়ে গেছে। স্বস্তি পেলেন তিনি। এরপর যোগ দিলেন সিটি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতার কাজে--সুরু হল শিশু মনের খোরাক জোগানো তাদের উপযোগী বই রচনা। রেঙ্গুণে গেলে বাংলা দেশের শিশুদের জন্য এ ভাবনা তাঁর মনে আসত কিনা কে জানে!

বড় মনের মানুষ ছিলেন বলেই ভালবাসতে পারেননি বড় শহরকে, যেখানে মানুষকে নানাভাবে নিষ্পিষ্ট করে রাখা হয়। কলকাতার আবহাওয়া শেষের দিকে অতিষ্ঠ করতে তাঁকে, তার চেয়ে ভাল লাগত গিরিডিতে। বাগান পুকুর আর মাছ ধরা নিয়ে সময় কাটাতে ভালো লাগত সেখানকার উন্মুক্ত প্রকৃতি আর সকল মানুষগুলোকে। ১১৩০ থেকে ৬ বছর একটানা সেখানেই কাটালেন। নদীর ওপরে প্রায় সাড়ে চারশো বিঘে জমি নিয়ে করেছিলেন বাগান আর চাষবাস। সকালে সেখানে হেঁটে যেতেন ফিরতেন দুপুরের দিকে।

তাঁর গিরিডির গোলকুঠিতে আর এক বৈশিষ্ট্য ছিল তখনকার বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর ঘরোয়া মজলিশে আচার্য ও লেডি বসু থেকে সুরু করে উপেন্দ্রকিশোর, সারদারঞ্জন, ফণিভূষণ অধিকারী, সুধীন ঠাকুর, সুবোধ মহলানবীশ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি সেকালের প্রখ্যাত ব্যক্তিরা প্রায়ই গোলকুঠিতে গিয়ে যোগীন্দ্রনাথের মধুর সঙ্গ উপভোগ করতেন।

নিজে রসিক না হলে অপরকে আনন্দ রস বিতরণ করা যায় না, যোগীন্দ্রনাথ তার দৃষ্টান্ত। তিনি যে কী রকম সুরসিক ছিলেন তার একটুখানি পরিচয় এখানে দিচ্ছি: তার বন্ধু অধ্যক্ষ সারদারঞ্জনের একটি দোকানে মাছ ধরবার চার বিক্রী হত—তার এক মজার নাম 'ইধার আও'! যোগীন্দ্রনাথ নিজে মাথা খাটিয়ে চার তৈরী করলেন—নাম দিলেন 'উধার মৎ যাও'।

এমনি নির্মল প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা মানুষটি ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ। শ্রদ্ধেয় সজনীকান্ত দাস তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে একবার লিখে ছিলেন—যোগীন্দ্রনাথ সরকারের কাছে আমরা তথা সেকালের ছেলেমেয়েদের ঋণের পরিমাণের কথা লিখিয়া শেষ করিতে পারিব না। শিশু সমাজে রস ভগীরথ হইলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার।

এই সদানন্দ, অমায়িক, রসের ভাণ্ডারীর কথা বলতে গিয়ে একটি অতি মূল্যবান প্রশ্ন তুলে ছিলেন জনপ্রিয় শিশু সাহিত্যিক স্বর্গত সুনির্মল বসু—হাসি খুসির লেখক লোকটি যে কী রকম হাসিখুশি প্রকৃতির ছিলেন, দুঃখের বিষয় তার খোঁজ অনেকেই রাখেন না।

(গ্রন্থবার্তা, যুগান্তর ২৭শে অক্টোবর ১৯৬৬)

যোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্বন্ধে

শ্রীরবীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত ও চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

এই বৎসরেই বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক যোগীন্দ্রনাথ সরকারের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হইবে। শিশুসাহিত্যে বাঙ্গালী লেখকগণ বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে যোগীন্দ্রনাথ এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। অথচ তাঁহার জীবন কথা সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের ঔৎসুক্য মিটাইবার মত গ্রন্থ বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীআশা গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার "বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ" গ্রন্থে (১৯৬১) লিখিয়াছেন: 'মৌলিক রচনা ও সম্পাদনা-সংকলন ইত্যাদি ধরিয়া বর্তমানে তাঁহার চুয়াল্লিশ খানি বই-এর সন্ধান পাইতেছি।' (পৃ ১৭৮) এই চুয়াল্লিশ-খানি গ্রন্থের নামের তালিকা বোধ হয় কোথাও মুদ্রিত হয় নাই। (ইতিমধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত সাহিত্য সাধক চরিতমালায় যোগীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পুস্তিকা বাহির হইয়াছে কি না জানি না) শ্রীআশা গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—যোগীন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থ "জ্ঞানমুকুল" (১ম সং ১৮৯০; ২য় সং ১৮৯৩) বর্তমানে বিলুপ্ত, দেখিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। (পৃঃ ১৯৯) অতএব দেখা যাইতেছে তাঁহার সমস্ত রচনা এখন একত্র করা অসম্ভব।

যোগীন্দ্রনাথ খুকুমণির ছড়া (১৮৯৯) সেকালে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল। এই গ্রন্থের ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিয়াছেন: এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি বঙ্গসাহিত্যে বোধ করি একটি নূতন উদ্যম। ......আশা করি, বর্তমান ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রচারের সহিত বাঙ্গালীর অনাদৃত অবজ্ঞাত গ্রাম্য সাহিত্যের আলোচনা বঙ্গের সুধী সমাজ কর্তৃক যথোচিতভাবে আরব্ধ হইবে। ("রামেন্দ্র রচনাবলী, ৬ষ্ঠঃ, ১৯৫৬, ২৪২০, ৪২৮) এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার প্রায় ছয় বৎসর পুর্বে রবীন্দ্রনাথের 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধ 'সাধনা' পত্রিকায় (আশ্বিন, কার্ত্তিক ১৩০১) এবং ছেলেভুলান ছড়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (মাঘ ও কার্তিক ১৩০১) ছাপা হয়। (এই দুইটি প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের লোক সাহিত্য গ্রন্থের ১৯০৭) প্রথমে স্থান পাইয়াছে।) অতএব লোক-সাহিত্যের চর্চার ক্ষেত্রেও যোগীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখযোগ্য।

যোগীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনেরও একটি সম্পর্ক রহিয়াছে বলিতে পারি। ১৯০৫ সালের ৫ই সেপ্টেম্বরে (৭ই ভাদ্র ১৩১২) তিনি বন্দেমাতরম নামে একখানি জাতীয় সংগীত সংগ্রহ বাহির করেন। এই সঙ্কলনের ভূমিকায় সখারাম গণেশ দেউস্কর লেখেন; দেশের বর্তমান অবস্থায় এইরূপ একখানি সঙ্গীত সংগ্রহের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার এই সময়ে এই অভাবের পুরণে অগ্রসর হইয়া সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। অধিকতর সুখের বিষয় তিনি এই পুস্তকখানি স্বদেশী কাগজেই মুদ্রিত করিয়াছেন। সংগ্রহটি প্রকাশিত হইবার এক মাসের মধ্যে তৃতীয় সংগ্রহ ছাপিতে হয়। British Museum-এ ইহার যে ষষ্ঠ সংস্করণ রক্ষিত আছে তাহার প্রকাশ সাল ১৯০৮। ১৯৪৮ সালে (২রা আষাঢ় ১৩৫৫) যোগীন্দ্রনাথের পুত্র সুধীন্দ্রনাথ সিটি বুক সোসাইটি হইতে এই বইখানির এক পরিবর্ধিত সংস্করণ বাহির করেন। কিন্তু এই সংস্করণ ঠিক কত নম্বরের সংস্করণ জানি না।

ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর ক্যাটালগ-এ (১৯২০) যোগীন্দ্রনাথ সরকার-কৃত কমলিনী (১৯১৩) নামে ২৮৫ পৃষ্ঠার একখানি সামাজিক উপন্যাসের উল্লেখ রহিয়াছে। গ্রন্থখানি কখনও দেখি নাই। ঐ ক্যাটালগ-এ বিদ্যাসাগর নামেও তাহার একখানি গ্রন্থের (১৯০৮) সংবাদ পাইতেছি। এই বইখানি দেখি নাই।

রবীন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত
দিল্লী।

১লা অক্টোবর তারিখের দেশ পত্রিকায় যোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্বন্ধে শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাসগুপ্তর আলোচনা পড়ে এই চিঠি লেখার প্রয়োজন বোধ করছি। রবীন্দ্রবাবু লিখেছিলেন যে যোগীন্দ্রনাথ যে বন্দেমাতরম নামক জাতীয়-সংগীত-সংগ্রহ সংকলন করেছিলেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে তা নেই। এর ষষ্ঠ সংস্করণ (১৯০৮) রক্ষিত আছে। তিনি কোথাও জাতীয় গ্রন্থাগারের নাম উল্লেখ করেন নি। এর ফলে পাঠকদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হতে পারে যে জাতীয় গ্রন্থাগারে 'বন্দেমাতরম' নেই। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় গ্রন্থগারে প্রথম সংস্করণের বন্দেমাতরম আছে। প্রথম সংস্করণ দুটি খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়েছে। যোগীন্দ্রনাথের দুটি খণ্ড প্রকাশের কোন পরিকল্পনা প্রথমে ছিল না। এই জন্যেই প্রথম প্রকশিত ভাগটিকে অনুরূপ ভাবে চিহ্নিত করা হয়নি। সঙ্কলনটির জনপ্রিয়তায় উৎসাহিত হয়ে অল্প দিন পরেই যোগীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন। এই খণ্ডের নিবেদনে তিনি বলেছেন: বর্তমান স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া অনেক স্বদেশভক্ত সুকবি সম্প্রতি অনেকগুলি উচ্ছ্বাসপূর্ণ সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল সংগীতের অধিকাংশ এই খণ্ডে প্রকাশিত হইল।

এছাড়া জাতীয় গ্রন্থাগারে বন্দে মাতরমের চতুর্থ এবং পঞ্চম সংস্করণ (দুটিই ১৯০৬) আছে। যোগীন্দ্রনাথের পুত্র আষাঢ় ১৩৫৫ সালে এই সংকলনের একটি পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। সখারাম গণেশ দেউস্কর ছাড়া শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত একটি ভূমিকাও এই সংস্করণে যোগ করা হয়েছে। এটিও জাতীয় গ্রন্থাগারে পাওয়া যাবে।

শ্রী দাসগুপ্ত ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর ক্যাটালগে যোগীন্দ্রনাথের কমলিনী ও বিদ্যাসাগর—এই দুটি গ্রন্থের উল্লেখ পেয়েছেন। জাতীয় গ্রন্থাগারেও এই বই দুটি আছে। তবে কমলিনীর লেখক শিশু-সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বিদ্যাসাগর বইটি ভারত-গৌরব গ্রন্থাবলী সিরিজের অন্তর্গত। নামপত্রে লেখক হিসেবে যোগীন্দ্রনাথের নাম নেই, আছে প্রকাশক হিসাবে। সুতরাং এ বই যে তাঁরই লেখা এ বিষয়ে নিঃসংশয়ে কিছু বলা চলে না। কারণ লেখক হিসাবে বইয়ের সঙ্গে তার নাম যুক্ত না করার বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না। এই সিরিজের আরও কতকগুলি বই প্রকাশিত হয়েছিল।

জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীমতী বাণী বসু বাংলা শিশু-সাহিত্যের যে বিস্তৃত পঞ্জী সংকলন করেছেন তাতে যোগীন্দ্রনাথ কর্তৃক লিখিত এবং সংকলিত গ্রন্থের একটি তালিকা পাওয়া যায়।

যোগীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত দেশ-এর পাঠক-পাঠিকারা শ্রী দাশগুপ্তর আলোচনা পড়ে জাতীয় গ্রন্থাগারে তাঁর লেখা বই নেই এমন ধারণা করতে পারেন। আশা করি তেমন ধারণা যাতে না হয় তার জন্য এই পত্রটি দেশ-এর পরবর্তী কোন সংখ্যায় প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করবেন।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
উপ-গ্রন্থাগারিক, জাতীয় গ্রন্থাগার।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

শিশু সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকারের জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হল। এই উপলক্ষে বাংলা দেশে কিছু তৎপরতাও লক্ষ করা গেল। লক্ষণ শুভ, সন্দেহ নেই।

শিশু-মনোরাজ্যে একদা যিনি একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন এবং আজকে যাঁর অধিকাংশ বই-ই অপ্রাপ্য তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে আমরা যৎকিঞ্চিত কর্তব্য পালন করেছি এ আত্মপ্রসাদটুকুই আমরা নিশ্চয় উপভোগ করতে পারি। কিন্তু এ প্রসঙ্গে সিটি স্কুলের আর একজন শিক্ষা প্রমদাচরণ সেনকে আমাদের মনে পড়বে—যিনি ভিত্তি রচনা না করলে যোগীন্দ্র নাথের আবির্ভাব ঘটত কিনা সন্দেহ; মনে পড়বে না 'মুকুল' পত্রিকার সম্পাদক আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীকে—যোগীন্দ্রনাথকে বিকশিত করে তোলাবার কাজে যাঁর অনেকখানি ভূমিকা ছিল; মনে পড়বে না সমকালীন ব্রহ্ম-সমাজকে—যে প্রতিষ্ঠান সেদিন জাতীয় কল্যাণের সর্বাঙ্গীন সাধনায় সৎ এবং সুন্দর শিশু-সাহিত্য রচনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। আমরা অনেক কিছুই ভুলে যাই এবং সেই বিস্মরণ ঘটে অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে।

আসলে বাংলা দেশে শিশু-সাহিত্যের সাধনা তো নিষ্কাম কর্মযোগে। এখনো বাঙালী শিশু-সাহিত্যিক একশো-দেড়শো টাকায় কপিরাইট বিক্রি করতে পারলে চরিতার্থ হয়ে যান, ফাইভ পার্সেন্ট রয়্যালটি যিনি পান তিনি পরম ভাগ্যবান, নিতান্ত ইন্দ্র-চন্দ্র হতে পারলে দশ পার্সেন্টের সুখস্বর্গে জায়গা পাওয়া যায়, (যদিও পঞ্চম মুদ্রণের পরেও প্রথম মুদ্রণের পুরো টাকাটা হাতে আসে না) এবং প্রায় ক্ষেত্রেই বই ছেপে এবং চা খাইয়েই প্রকাশক লেখককে চরিতার্থ করেন। মারা গিয়ে ক্লাসিক হতে পারলে তবেই কিঞ্চিৎ কৌলান্য আসে—যেমন কুলীন হয়েছেন উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমার-দক্ষিণারঞ্জন এবং যোগীন্দ্রনাথ—নইলে শিশু-সাহিত্যিককে কেউ সাহিত্যিক বলেই মনে করেন না। বিশ্ব সাহিত্য যে-সব মনীষীর নখ-দর্পণে তাঁদের ক'জন পড়েছেন রুশ লেখক সামুয়েল মারশাকের আশ্চর্য বই 'বারো মাস' আধুনিকতম ফরাসী সাহিত্য নিয়ে যারা মশগুল, তাঁদের কজন খবর রাখেন স্যাৎ একজুপেরীর অসাধারণ বইগুলির।

অতএব হাতে কলম থাকলে এবং কলমে কিছু জোর থাকলে বড়োদের লাইনে 'সুইচ ওভার' করাই ভালো তাতে খ্যাতি এবং অর্থ দুই-ই আসে। বড়োদের জন্য জমিয়ে রূপকথা লিখতে পারলে চলচ্চিত্রের স্বর্ণ দ্বারও সঙ্গে সঙ্গেই খুলে যায়। তা সত্ত্বেও যাঁরা শিশু-সাহিত্যকে আঁকড়ে বসে থাকেন—তাঁরা নিতান্তই শহীদত্ব কামনা করেন আর শহীদ তো চিরকাল মৃত্যুর পরেই বরমাল্যটি লাভ করে থাকেন। আমার সন্দেহ হচ্ছে, যোগীন্দ্রনাথ-দক্ষিণারঞ্জন-উপেন্দ্রকিশোর এ যুগের বাংলা দেশে জন্মনিলে শিশু-সাহিত্যসৃষ্টির পণ্ডশ্রম না করে মোটা মোটা ঐতিহাসিক এবং ইতিহাস-রচনাকারী উপন্যাস লিখতেন—তাতে তাঁদের অর্থ আর পরমার্থ দুই-ই অর্জিত হত।

তাঁদের সৌভাগ্য, কিংবা দুর্ভাগ্য বলব কিনা জানি না, তারা বাংলাদেশের একটা অসাধারণ যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের সামনে দুটি

সুনিশ্চিত লক্ষ্য ছিল। একটি আত্ম-সংগঠন আর একটি জাতীয় চেতনার উদ্বোধন। বাইরে যখন দেশ জুড়ে বিভিন্নমুখী আন্দোলন চলেছে, তখন নেতারা নিশ্চিতভাবে অনুভব করেছিলেন যে এই সব আন্দোলন এবং আত্মবোধনকে যদি স্থায়িত্ব দিতে হয়—তা হলে একেবারে মূলে শক্তি-সঞ্চার করতে হবে। এই মূল হচ্ছে দেশের শিশুর দল—সৎ এবং সুন্দর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যদি তাদের মনোগঠন করতে পারা যায়, তা হলেই এই মুহূর্তের সমস্ত সূচনা ভবিষ্যতে তার পরিপূর্ণতায় গিয়ে পৌঁছুতে পারবে। তা যদি না হত, তা হলে আদর্শ শিশু-সাহিতের প্রতিষ্ঠা করতে কি দুঃখ আর অকাল মৃত্যুকে বরণ করতেন প্রমদাচরণ সেন? ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কি তা না হলে অমন সুন্দর একটি শিশু-পত্রিকা প্রচার করতেন? তা যদি না হত, তা হলে কি আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী 'মুকুলের' সম্পাদনার ভার নিতেন, দেখা দিতেন উপেন্দ্রকিশোর যোগীন্দ্রনাথ সরকার-যোগীন্দ্রনাথ বসু? সখারাম গণেশ দেউস্কর-বিপিনচন্দ্র পাল কি ছোটদের জন্যে প্রবন্ধ-কবিতা লিখতেন? আর 'বালকে'র জন্যে এমন করে প্রাণমন ঢেলে দিতেন রবীন্দ্রনাথ—লিখতেন পাঞ্জাব-মারাঠা ইতিহাসের কাহিনী, হৃদয়-ভরানো শিশু-কবিতা, রাজর্ষির মতো উপন্যাস?

দক্ষিণারঞ্জন এসেছিলেন আরো কিছু পরে। কিন্তু সে-ও শুধু রূপকথার ডালি সাজাবার জন্যেই নয়। সেদিন বাঙালীর সামনে স্বদেশ তার সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে দেখা দিয়েছেঃ আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে যখন আপনি—"। দক্ষিণারঞ্জনের ঠাকুরমার ঝুলি-ঠাকুরদাদার ঝুলি বাঙালীর ঐতিহ্য-সাধনার আর একদিক বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের আত্মদীপনে কটি কল্যাণ-প্রদীপ।

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের জন্মশতবার্ষিকীতে আমরা তাঁকে একটি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিরূপেই স্মরণ করেছি; আমরা ভুলে গেছি, তাঁর সাহিত্য-সাধনা মাত্র একটি একক মননেরই সম্ভার নয়—তার অন্তরালে একটি বিশাল যুগের বিপুল প্রাণ প্রেরণা সক্রিয় হয়ে আছে। আনন্দময় নির্মল শিশু সাহিত্যের মাধ্যমে সর্বতোমুখী সুশিক্ষা সঞ্চারকে কতখানি সার্থক করে তোলা যায়—যোগীন্দ্রনাথের বইগুলি তার উদাহরণ; কিন্তু তাঁর এই সফলতার পশ্চাৎপটে যে যুগচেতনা, যে কর্মোদ্যম, বিভিন্ন অনন্য ব্যাক্তিত্বের যে সব প্রভাব নিহিত হয়ে আছে—সেগুলি সম্বন্ধে অবহিত না হলে তাঁর শতবার্ষিকী স্মরণ সম্পূর্ণ অর্থহীন।

আর এই ট্র্যাডিশনের কথা ভুলে গিয়ে আজকের বাংলা শিশু-সাহিত্যও অর্থহীন হতে চলেছে। অভাবে উপেক্ষায় প্রকাশকের শোষণ—বাঙালী শিশু-সাহিত্তিকেরা ক্রমশই প্রেরণা হারিয়ে ফেলেছেন—নিষ্কাম কর্মযোগে আর কতক্ষণ পর্যন্ত উৎসাহ থাকে! তার চাইতে বয়স্কদের জন্যে 'সিউডো-রিয়্যালিস্টিক্' রূপকথা লেখাই ভালো—তার সম্ভাবনা বিবিধ এবং সমুজ্জ্বল। আজ বাংলা দেশে ছোটদের জন্যে রূপকথা আর কেউ লিখতে চান না—তার প্রয়োজনও আর নেই, কারণ বড়োরাই যে আজ চুষিকাঠি মুখে পুরে হামা দিতে শুরু করেছেন—এ সত্যটি বুদ্ধিমান লেখকদের অধিগত।

না—সন্দেহ নেই যোগীন্দ্রনাথ সরকার এ যুগে জন্ম নিলে ঐতিহাসিক উপন্যাসই লিখতেন।

(সুনন্দর জার্ণাল, দেশ)

মৌমাছির চিঠি ও চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগারের স্মরণী থেকে

আগামী ২৯শে অক্টোবর দিন হাসিখুসি, হাসি ও খেলা প্রভৃতি শিশু-সাহিত্যের সেরা স্থষ্টিগুলির স্রষ্টা—শিশু-সাহিত্য ভগীরথ যোগীন্দ্রনাথ সরকারের জন্মোৎসব। যোগীন্দ্রনাথকে আর সবাই ভুললেও তোমরা ছোটরা যে ভোলনি সে কথা আমি জানি। আমিও তাঁকে ভুলতে পারি না। কারণ তাঁর লেখা হাসি-খুসি, হাসি ও খেলা, খুকুমণির ছড়া প্রভৃতি বই পড়েই তোমাদের ভালবাসবার, তোমাদের জন্যে সহজ করে, মিষ্টি করে লেখবার প্রেরণা পেয়েছি। ছোটদের জন্যে মিষ্টি করে সহজ করে চলতি ভাষায় লেখবার পথ তিনিই সব প্রথম দেখান ও শেখান, কাজেই যোগীন্দ্রনাথ সরকার শিশু-সাহিত্যের প্রথম গঙ্গা-প্রবাহ আনেন বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে—তাই তিনি শিশু-সাহিত্য ভগীরথ। তাঁকে আমরা ভুলতে পারি না, আগামী বছর তাঁর জন্মশতবার্ষিকী, সেটি সার্থকভাবে পালন করার আয়োজন তাঁর নিরানব্বই বছরের এই জন্মদিনেই শুরু হোক—এই প্রার্থনা করে তাঁর উদ্দেশ্যে ও ভগিনী নিবেদিতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা ও প্রনাম জানাই। তোমরাও জানাও শ্রদ্ধা ও প্রণাম ঐ দুটি দিনে।

(মৌমাছির চিঠি, আনন্দমেলা, আনন্দবাজার পত্রিকা ২৫শে অক্টোবন ১৯৬৫)

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

বাংলা ভাষার অক্ষর-বর্ণ ও বানান বিন্যাসে, বিদ্যাসাগর যেমন ভগীরথ, বাঙ্গালী শিশুর মনে সাহিত্য প্রবাহ সঞ্চারে 'হাসিখুসীর' যোগীন সরকার হলেন তেমনি বাল্মীকি।

শিশু মন থেকে অজগর ভীতি দূর করে তার হাতে সুরসাল অমৃত ফল তুলে দেওয়া থেকে আরম্ভ করে হারাধনের দশটি ছেলের দশ দশার মধ্য দিয়ে ৺শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার বাংলার ঘরে ঘরে বালক ঠাকুরদের যে নতুন সাহিত্য নৈবদ্য এগিয়ে দিলেন, বাংলাদেশের হৃদয় তাকে সশ্রদ্ধায় আপনার করে নিয়েছে।

এ দেশে শিশু গোপাল ও কিশোর কৃষ্ণের পুজা এক কালে ঠাকুরঘরের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। শিশু-মনকে উপলব্ধি করে তাকেও স্বীকৃতি দেওয়ার সত্য প্রথম প্রচার করেন এই মহৎ চিন্তাবিদ। হাসিখুসীর লেখকের অবদান গ্রহণ করেই বাংলার মা বাবারা নিজ নিজ সন্তানদের নতুন করে চিনলেন।

উনবিংশ শতকের দশাসয়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে যোগীন সরকারের স্থানও এই সঙ্গেই চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। বাক্‌স্ফুর্তির সঙ্গে সঙ্গেই সুমধুর আধস্ফুট ভাষার অবোধ শিশু যখন বলে, অয় অজগল আছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেলে, তখন বিনম্র শ্রদ্ধায় বাংলার মা বাবার মনে যে নামটি উদ্ভাসিত হয় তা ব্যাস কালিদাস বাল্মীকি নয়—এমন কি রবীন্দ্রনাথও নয় যোগীন সরকার।

(চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার স্মরণী ১৩৭২)

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

ইতিপুর্বে আমরা 'গুরুঋণ' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি কিন্তু বোধকরি তাহার যথার্থ প্রয়োগ সেখানে হয় নাই। এই বছর আরও যে একজনের আবির্ভাব শতবার্ষিকী পালন করিতেছি—আমাদের অর্থাৎ সাহিত্যপাঠক ও সাহিত্যসেবীদের গুরুঋণ তাঁহার কাছেই! আজকে যাহারা শিশু বা কিশোর তাহারা অনেক চকচকে ঝকঝকে বই দিয়া শিক্ষা শুরু করিয়াছে হয়ত—কিন্তু আমাদের বাল্যের বা শৈশবের সেই মজার কণামাত্র তাহারা পায় নাই। "অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে" এবং হারাধনের দশটি ছেলের কাহিনী দিয়া যে শিক্ষার শুরু, আর উপেন্দ্রকিশোরের 'ছেলেদের রামায়ণ' 'ছেলেদের মহাভারত' 'টুনটুনির বই' সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোল দক্ষিণারঞ্জনের ঠাকুরমার ঝুলি ঠাকুরদাদার ঝুলি এবং সীতা দেবী শান্তা দেবী হিন্দুস্থানী উপকথা বা নিরেটগুরুর কাহিনী, কি সুখলতা রাওর গল্পের বই আরো গল্পে যে শিক্ষার পুষ্টি বা উন্মেষ সে শিক্ষার আনন্দ আজিকার শিশুদের অনেকের কাছেই অনাস্বাদিত থাকিয়া যাইবে। আজ যেসব শিক্ষক ও অভিভাবকদের হাতে আগামী যুগের নাগরিকদের শিক্ষার ভার—তাঁহারা নুতন লেখকের নুতন ধরনের বই পড়াইবার চেষ্টায় (তাহাতে অনেকের ব্যাক্তিগত স্বার্থের প্রশ্নও আছে—একযোগে অর্থ ও পরমার্থ লাভ।) এক মহান উত্তরাধিকার হইতে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী শিশুকে বঞ্চিত করিতেছেন। এখনও বলি, হাসিখুশিতে যাহারা পড়া শুরু করিয়াছে, তাহারা সৌভাগ্যবান যাহারা সে আনন্দে বঞ্চিত রহিল তাহাদের মতো দুর্ভাগ্য আর নাই। জনৈক লেখকবন্ধু লিখিয়াছেন যে এযুগে জন্মগ্রহন করিলে ইঁহারা ছোটদের বই না লিখিয়া মোটা মোটা ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিতেন তাহাতে নাকি অর্থ ও পরমার্থ দুইই লাভ হইত! যোগীন্দ্রনাথ সরকার কি উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী অথবা দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের অর্থ বা পরমার্থ লাভ হয় নাই—এমন কথা তাঁহাকে কে বলিল তাহা জানি না। উপেন্দ্রকিশোরের বই প্রকাশকের অবজ্ঞার হয়ত যতটা বিক্রী হইতে পারিত ততটা হয় নাই, তবুও—আজিকার দিনের মোটা মোটা উপন্যাসের চেয়ে খুব কম অর্থ দেয় নাই। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের কোন কোন বই লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রী হইয়াছে। দক্ষিণারঞ্জনও তাঁহার প্রধান দুটি বই হইতে যে টাকা পাইয়াছেন—তাহা আমাদের কালের ঔপন্যাসিকদের কাছে অবিশ্বাস্য। আসল কথা লেখক যদি নিজের কাছে খাঁটি থাকেন, লিখিতে বসিয়া যদি লেখার দিকেই দৃষ্টি থাকে, যদি নিতান্ত ব্যবসা করার কলম না ধরেন—তবে সে লেখা তাঁহার সমাদৃত হইবেই তা তিনি শিশুসাহিত্যই রচনা করুন অথবা মোটা মোটা ঐতিহাসিক উপন্যাসই লিখুন। (অবশ্য শক্তির প্রশ্ন তো আছেই। কিন্তু লেখক বলিতে আমরা যথার্থ লেখকের কথাই বলিতেছি।) যোগীন্দ্রনাথও সেই খাঁটি লেখকদের একজন। শিশুদের জন্য লেখার সময় তাহাদের উজ্জ্বল কচি মুখগুলিই তাঁহার মনে ছিল, তাহাদের কল্যাণের কথা, খুশির কথাই তিনি চিন্তা করিয়াছেন। লিখিতে বসিয়া আগে লক্ষ্মীর কথা চিন্তা করেন নাই বলিয়াই লক্ষ্মীও তাঁহাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়াছেন, সিদ্ধি ও সার্থকতা তাঁহার কণ্ঠে বিজয়মাল্য পরাইতে দ্বিধা করে নাই, তাই অগণিত লেখক-সঙ্কুল বাংলাদেশে আজ আমরা শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সহিত তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা উত্থাপন আশাকরি অবান্তর হইবে না। আজকালকার যে সব চকচকে ঝকঝকে বইয়ের কথা বলিয়াছি তাহাদের সাহিত্যিক মূল্য যা-ই থাক, আকৃতি ছেলেমেয়েদের কাছে বিশেষ লোভনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যোগীনবাবুর বইগুলি সেকালের ব্লক ও ছাপার ধরণ লইয়া আজ আর উহাদের চোখের তৃষ্ণা মিটাইতে পারে না। অথচ চোখের তৃপ্তি ঘটাইতে গিয়া মানসিক একটা বড় ভোজে বঞ্চিত হয় এখনকার ছেলেমেয়েরা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ কি ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারেন না? তাহাদের তো প্রয়োজনীয় বই ছাপাইবার একটা তহবিল আছেই। সেখান হইতে কিছু 'সাবসিডি' দিয়া তাহারা যদি যোগীনবাবুর উত্তরাধিকারীগণকে এই বই নূতন ছবিতে অফসেট প্রোসেসে ছাপিতে সাহায্য করেন তো দেশের তথা দেশবাসীর একটি প্রকৃত উপকার করাই হইবে।

(কথাসাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩৭৩)

যোগীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে

আশা দেবী

এ সম্পর্কে বেশী দৃষ্টান্ত দেবার প্রয়োজন নেই। এক রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই এর সব চাইতে ভাল নিদর্শন পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথের হাতে কিছু আশ্চর্য উজ্জ্বল শিশু সাহিত্য নিশ্চয়ই গড়ে উঠেছে কিন্তু শিশু ভোলানাথ, 'সে', অথবা খাপছাড়ার লেখাগুলো পড়তে পড়তে এ কথা মনে না হয়েই উপায় নেই যে বিরাট প্রতিভার স্পর্শে অনেক ধুলোমুঠি সোনামুঠি হয়ে গেলেও মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যের সাফল্য তাঁর অন্যদিনের তুলনায় অনেকটা পরিমাণে অনুজ্জ্বল। কখনও কখনও মাত্রাতিরিক্ত গাম্ভীর্য বা বক্রতা ছোটদের পক্ষে দুর্বোধ্য, কখনও কখনও অতিতারল্যে খানিকটা কৃত্রিমতার আভাস।

বাংলা সাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোর **যোগীন্দ্রনাথ সরকার**, সুকুমার রায়, অবনীন্দ্রনাথ, দক্ষিণারঞ্জন, হেমন্তকুমার রায় বা সুনির্মল বসু ছোটদের জন্যে বহু সার্থক ভাল লেখা রেখে গেছেন। যে সমন্বয়ের কথা বলছিলাম এঁদের অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

(চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার স্মরণী ১৩৭২)

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

অন্নদাশঙ্কর রায়

ছেলেবেলায় "হাসিখুসী" প্রথমভাগ হাতে পাওয়া একটি স্মরণীয় ঘটনা। তারপরে তার দ্বিতীয়ভাগ। ছড়াগুলি সব মুখস্থ হয়ে যায়। এখনো, এই তেষট্টি বছর বয়সেও, বেশ মনে পড়ে হারাধনের দশটি ছেলের বিয়োগফল ও যোগফল। তখন খেয়াল হয়নি যে ছড়া ছলে অঙ্ক শিখছি। আর সে ছবিগুলি কী চমৎকার।

পরে যোগীন্দ্রনাথের আরো ছড়ার বই পড়ি। ছড়ার সঙ্গে সঙ্গে গল্প রচনাও। প্রায় সব ক' খানাই ভালো লাগে। আর মুখস্থ হয়ে যায় বিস্তর পংক্তি।

জানিনে আমার নিজের লেখকজীবনের উপর ছেলেবেলার সে পড়াশুনা কোন ছাপ রেখে গেছে কি না। কিন্তু প্রভাব একভাবে না একভাবে পড়া সম্ভব। অন্তত ছড়ার গঠন যে কেমন ও রস যে কোনখানে এর জন্যে আমি "খুকুরাণীর ছড়া" বইখানির কাছে ঋণী। সেই সূত্রে যোগীন্দ্রনাথের কাছে।

ছেলেমেয়েদের জন্যে লেখা কত বই এল আর গেল। যোগীন্দ্রনাথের বইগুলি এখনো বেঁচে আছে। এখনো জনপ্রিয়। উপেন্দ্র কিশোরের মতো তিনিও চিরকিশোর।

মানুষ তার কীর্তির ভিতর দিয়ে জীবিত থাকে। যোগীন্দ্রনাথও সেই অর্থে জীবিত। তাঁর বই হাতে নিলে একটি রসিক, আমুদে, অধ্যবসায়ী গুরু মশায়কে পাই, যাঁর কাছে শিক্ষাদান ও আনন্দদান এই ব্রতের দুই দিক।

শিক্ষার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও আনন্দের প্রয়োজন ফুরোয় না। শিশু যখন বড়ো হয় তখনো সে যোগীন্দ্রনাথের ছড়া আওড়ায় আনন্দ দিতে ও পেতে। এই যেমন—

আমি তুলতে যখন চাই,
ঘোষ পাড়াতে যাই,
ঠেংটা উঁচু করে দাঁড়ায়
বংশী মুদীর ভাই।
এই ঘাড়ে যাহার চাপ
এ নন্দ ঘোষের বাপ !

বাকীটুকু মনে পড়ে না। পাঠকরা পুরণ করবেন যদি স্মরণ থাকে।

———

হারাধনের দশটি ছেলে

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের শতবার্ষিকী উৎসব এই কিছুদিন পূর্ব্বে উদ্‌যাপিত হয়ে গেল। বিশুদ্ধ শিশুসাহিত্যিক হিসেবে এই শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন এই কথাটিই আমাদের কাছে সমকালিন অস্পষ্টতা ও অস্বস্তুতা ভেদ করে স্পষ্ট করে দিয়ে গেল যে যোগীন্দ্রনাথ শিশুসাহিত্যিক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছেন এবং বাংলা ভাষাভাষী শিশুদের চিরকালের সঙ্গী হয়ে বিরাজ করবেন।

যোগীন্দ্রনাথ শিশুসাহিত্যিক হিসেবে কোন্ প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত অথবা তাঁর সমসাময়িক আরও যাঁরা শিশু-সাহিত্য রচনা করেছেন তাঁদের সঙ্গে তুলনায় তাঁর আসন কোথায়, এ আলোচনার স্থানও এ নয় অথবা আমিও সে কর্ম্মের যোগ্য ব্যক্তি নই; সে পারঙ্গমতাও আমার নাই। এ কর্ম্মে তাঁরই সমসাময়িক রবীন্দ্রনাথ ও সুকুমার রায়ের মত কীর্ত্তিমান পুরুষ রয়েছেন। যোগীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে গিয়ে তাঁর কীর্ত্তির সঙ্গে এই দুই কীর্ত্তিমান পুরুষকেও স্মরণ করছি।

যোগীন্দ্রনাথের সামগ্রিক সাহিত্য কীর্ত্তির পরিচয় দেবার জন্যে আমার এ রচনা নয়। আমরা যখন শিশু তখন যোগীন্দ্রনাথের বয়স ত্রিশ পার হচ্ছে। কাজেই আমাদের বালককালেই তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল। আজ থেকে ষাট পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ব্বে একটি বাংলা ভাষাভাষী শিশুর চিত্তে যোগীন্দ্রনাথের রচনার কি প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল সেই ছবি টুকুই এখানে তুলে ধরবার অভিপ্রায়ে এই সামান্য রচনা।

রবীন্দ্রনাথ নিজের অক্ষর পরিচয়ের কথা লিখতে গিয়ে জীবনস্মৃতিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয়' থেকে অক্ষর পরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'জল পড়ে পাতা নড়ে' এই তাঁর জীবনে আদি কবির প্রথম কবিতা।

আমি পল্লীগ্রামের ছেলে। আর সে এমন পল্লীগ্রাম যেখানে জীবন তখন প্রত্যক্ষভাবে রেললাইনের মেল-বন্ধনে বাঁধা পড়েনি। হাইস্কুল সেখানে সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাঠশালা ও মাইনর ইস্কুল অবশ্য সেখানে ছিল।

সেখানে সেইকালে অন্য পাঁচটি শিশুর মত আমার বর্ণপরিচয় শিক্ষা ঘটেছিল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণ-পরিচয় প্রথম ভাগের মারফতে। যোগীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় ঘটল তারপর। হাতে এসে পড়ল 'হাসিখুসি।'

এই প্রথম এমন একখানি বই পেলাম যা শুধু চিত্তরঞ্জক নয়, নয়নরঞ্জক। শিশুচিত্ত রঞ্জনের জন্য সর্ব্বাগ্রে নয়নরঞ্জক সামগ্রী হওয়া প্রয়োজন বইয়ের তা বুঝলাম। বলাটা একটু ভুল হল বোধ হয়। কারণ এ তত্ত্ব অবশ্যই। কিন্তু বইখানি, কালো অক্ষরের রাজত্বে অকস্মাৎ সাদা ধবধবে বকের পালকের মত কাগজের উপর উজ্জ্বল বেগুণী কালিতে ছাপা বইখানি যেন মুখ-ভার-ভার মানুষের মাঝখানে এক মুখ হাসিওয়ালা মানুষের মত এসে হাজির হয়েছিল।

এ এক রীতিমত আবির্ভাব বলতে পারি। শুধু তাই নয়। তার পাতায় পাতায় বিস্ময়! কি অপরূপ সে ছড়াগুলি!

আয়রে আয় টিয়ে।
নায়ে ভরা দিয়ে
না' নিয়ে গেল বোয়াল মাছে
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা
খোকার নাচন দেখে যা!

কি আশ্চর্য্য মাধুর্য্যে গাঁথা রয়েছে খোকন আর ভোঁদড় এক মিহি মধুর কল্পনার সুতোয়!

এই শেষ নয়। এ বলতে গেলে আরম্ভ মাত্র। তারপর—

'মামাদের দরজার বাঘা থাকে এক
তেড়ে নাহি আসে নাহি করে ভেক ভেক।'

এক থেকে দশ পর্য্যন্ত, একের সঙ্গে এক যোগ করে দশ পর্য্যন্ত পৌঁছানোর মধ্যে মামার বাড়ীর যে আশ্চর্য্য সমৃদ্ধ রূপটি ফুটে উঠল তার তুলনা কোথায়!

কিন্তু তারপর।

তারপর হল সেই বিখ্যাত কথা-কাহিনী—'হারাধনের দশটি ছেলে।'

দশ থেকে এক এক বিয়োগ করে শূন্য পর্য্যন্ত পৌঁছবার জন্য যে ছড়ার বুনোন তৈরী করলেন কবি যোগীন্দ্রনাথ তা কোন্ আশ্চর্য্য গুণে আমাদের এক স্থায়ী সম্পদ হয়ে রইল।

হারাধনের দশটি ছেলের মধ্যে একটি একটি করে কোন না কোন অপঘাতে যেতে যেতে শেষে থাকল দুটি ছেলে। তাদের একজন গেল সাপের বিষে। তারপর বাকী রইল একজন। সে তার ভাইদের হারিয়ে একা আর থাকতে পারল না। না পেরে সে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে বনে চলে গেল। 'রইল না আর কেউ'।

আজও স্মরণ করতে পারি সেই আশ্চর্য্য বেদনার আবিষ্টতাকে। তার আগে 'রামায়ণ' 'মহাভাতের' গল্প কিছু কিছু শোনা আরম্ভ করেছি মায়ের কাছে। বৃহৎ মহৎ লোকোত্তর জীবনের কাহিনীর আস্বাদ কিছু পেতে আরম্ভ করেছি কিন্তু এই প্রতিদিনের মর্ত্তভূমিতে সঙ্গীহীন বান্ধবহীন হয়ে থাকার যে কি বেদনা এবং লৌকিক জীবনে মৃত্যুর গভীর, সকাতর যন্ত্রনা যে কেমন তা যেন সেদিন প্রথম আস্বাদ করেছিলাম। যে মৃত্যু ও স্বজন-হীনতাকে জীবনের পরবর্তীকালে মনুষ্য জীবনের অমোঘ অভিজ্ঞার অংশ রূপে আস্বাদ করতে হয়েছে তারই প্রথম স্পর্শ যেন পেয়েছিলাম ওই ছড়ার মধ্যে। এই ছড়াগুলি তাই যেন আজও অশ্রুজলসিক্ত, দীর্ঘনিশ্বাসময় শ্লোকরূপে অন্তরে আসন নিয়ে আছে। 'হাসিখুসি, হাসি ও আনন্দের আড়ালে যে দীর্ঘনিশ্বাস ওই ছড়ার মধ্যে স্থায়ী করে রাখা আছে তারই মধ্যে বংলাভাষা-ভাষী শিশুরা কালে কালে এই লৌকিক পৃথিবীর প্রথম বেদনার অশ্রুর আস্বাদ পাবে।

———

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

যোগীন্দ্রনাথ সরকার বাংলা সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত। তাঁর লিখিত কোন কোন পুস্তক ভারতবর্ষের অপরাপর ভাষাতেও তর্জ্জমা করা হইয়াছে। শিশু-সাহিত্য ক্ষেত্রে যোগীন্দ্রনাথ বাংলায় বহুকাল রাজাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন ও তাঁহার লিখিত পুস্তকগুলির লক্ষ লক্ষ খণ্ড বাংলার শিশুমহলে প্রচারিত হইয়াছে। এখনও তাঁহার রচিত কয়েকটি পুস্তক বিশেষভাবে আদৃত ও সুপ্রচলিত আছে। শিশুসাহিত্য রচনার যে আদর্শ ও পন্থা যোগীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, এখন অবধি তাহা হইতে আরও সহজ সরল ও উপভোগ্য নূতন কিছু তাঁহার পরবর্ত্তী লেখকেরা বাংলার শিশুদিগকে দিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। এই কারণে তাঁহার লেখার সমাদর বাংলার সাধারণের মধ্যে প্রায় বংশানুক্রমিকভাবে চলিত রহিয়াছে।

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের জন্ম হয় ১২৭৩ সালের ১২ই কার্ত্তিক। তিনি মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। মাতুলালয় ছিল ২৪ পরগণার জয়নগর গ্রামে। তাঁহার পিতা নন্দলাল দেব-সরকার ঝড়ে ঘরবাড়ী উড়িয়া যাওয়ায় নিজ গ্রাম ন্যাতড়া (ডায়মণ্ড হারবারের নিকটে) ত্যাগ করিয়া জয়নগরে শ্যালকের গৃহে গমন করেন। সেইখানেই যোগীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁহার তিন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্র, নীলরতন ও উপেন্দ্রনাথের তখন বয়স ক্রমান্বয়ে ৭, ৩, ও ১ বছর। দেব-সরকার পরিবারের ইহার বহু পুর্ব্বে যশোহরে নিবাস ছিল।

এই পরিবারের অনেক শাখা-প্রশাখা। উত্তর কলিকাতার দেবেরাও ঐ পরিবারের ও ঐ বংশের। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের পিতা নন্দলাল নামে শুধু সরকার লিখতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্র প্রথম ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। তৎসঙ্গে অপর ভ্রাতাগণও ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

যোগীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সেই কলকাতায় চলিয়া আসেন ও তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা কলিকাতাতেই হইয়াছিল। তিনি সুলেখক, সুরসিক ও স্বভাবকবি ছিলেন। শিশুদিগের প্রতি বন্ধুভাব ও মমতা তাঁহার চরিত্রে বিশেষভাবে জাগ্রত ছিল। আমাদিগের যত দিনের কথা মনে পড়ে আমরা তাঁহাকে শিশু ও বালক-বালিকা পরিবেষ্টিতই দেখিয়া আসিয়াছি। তিনি গল্প বলিতে পারিতেন অসাধারণ কল্পনা ও বর্ণনা শক্তি দেখাইয়া। তাঁহার ভাষা সুললিত ও সহজবোধ্য ছিল। মাঝে মাঝে ছড়া কাটিয়া অথবা উচ্চাঙ্গের কাব্য রচনা করিয়া তিনি গল্পের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিতেন। শিশুপাঠ্য বহু পুস্তক রচনা করিয়া তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন যে, নিছক কল্পনা গদ্যে ও পদ্যে ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি শিক্ষার বিষয় লইয়া গতিশীল হইয়া উঠিতে পারে এবং শিশুরা গল্পচ্ছলে নানাভাবে জ্ঞান আহরণ করিতে পারে। সুনীতি ও উচ্চ আদর্শের কথাও শিশুদিগের মনে গল্প ও কবিতার সাহায্যে স্থির নিশ্চয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। তিনি পুরাতন পদ্ধতিতে ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া ভূত, প্রেত, রাক্ষস ইত্যাদির গল্প করেন নাই। তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া শিশু ও বালক-বালিকাগণ চিন্তা ও ভালমন্দ বিচার ক্ষেত্রে আধুনিক আদর্শবাদ ও পুরাতন নীতিবোধের সমন্বয় করিতে সক্ষম হয়—দুর্ব্বোধ্য উপদেশের সাহায্য কিছুমাত্র না লইয়া ; যথা ঃ

ভাল ছেলে পাঠশালে
সোজা চলে যায়,
দাঁড়ায়ে না কথা কয়,
পথে না খেলায়।

মন্দ ছেলে পথে দেরী
করে খেলা গিয়ে,
পুকুরে ভাষায় জুতা
পাল তুলে দিয়া।

ভাল ছেলে বড় আশা
হৃদয়েতে পোষে,
এক মনে আপনার
পড়া করে বসে।

মন্দ ছেলে সারাদিন
ঘোরে হেসে খেলে,
না চায় ছুঁইতে বই,
পায়ে ছুঁড়ে ফেলে।

ভাল ছেলে
পড়া দিতে
নাহি করে ডর,
জিজ্ঞাস' যা
দেয় তার
তখনি উত্তর।

মন্দ ছেলে—
মাথা তার
চুলকান সার
"চিক্কন"
বানান করে
'চ'য়েতে আকার।

ভাল ছেলে পড়া তার
ভাবে শুধু বসে,
অঙ্কটি না দিতে দিতে
দেয় তাই ক'সে।

মন্দ ছেলে শ্লেট ধরে
কাটিয়া আঁচড়,
মুখ লুকাইয়া দেয়
সন্দেশে কামড়।

ভাল ছেলে ধেয়ে চলে
পুলকিত মন,
পাইয়াছে পুরস্কার
মনের মতন।

মন্দ ছেলে দাঁড়াইয়া
যেন জানোয়ার
মাথায় গাধার টুপি—
খাসা পুরস্কার!

ইহার সহিত উপযুক্ত চিত্রাবলী থাকায় মন্দ ছেলের শিশুসভায় উচ্চ স্থান গ্রহণের কোন আশাই থাকে না।

"আষাঢ়ে স্বপ্ন" পুস্তকের একটি স্বপ্নে যোগীন্দ্রনাথ পশু দিগের মধ্যে মানুষের সহিত শান্তিপুর্ণভাবে একত্র একত্র বাসের কথা স্বপ্নে শুনিয়াছিলেন। কুমির সজলনেত্রে বলিল,

"বড় সুখী হইলাম সুপ্রস্তাব শুনে,
দিবানিশি জ্বলিতেছি মনের আগুনে।
"শত অসহায় নরে করেছি ভক্ষন,
বিবেক দংশনে তাই আসিছে ক্রন্দন।"

কিন্তু হস্তীর মানব চরিত্রে বিশ্বাস নাই। "মানুষের নীচ ত্রিভুবনে নাহি।

সন্ধিতে স্বাক্ষর তার কতক্ষণ লাগে,
সর্ত্ত কিন্তু ভাঙ্গিবে সে সকলের আগে।
... ...

অন্তরের বিদ্বেষ, সদা বিষবান হানে
আপনার স্বার্থ ছাড়া কিছু নাহি জানে।
যে যত কপট আর যত বেশী খল।
রাজনীতি ক্ষেত্রে সে ততই প্রবল।
বুড়ো সুড়ো হইয়াছি বুঝিয়াছি সাড়;
প্রবলের ক্রীতদাস নর কুলাঙ্গার।" ইত্যাদ।

অঙ্ক শাস্ত্র লইয়া খেলার সাহায্যে জ্ঞান সঞ্চার করা যায়। যথা."সন্দেশের হিসাবে" দেখা যায়

"একটি হাতে তিনটি আছে
আরেক হাতে ছয়;
যোগ করিয়া খাই যদি
'নয়টি' শুধু হয়।

বিয়োগ যদি করি' মোটে
'তিনটি' হবে খাওয়া,
ভাগ করিলে 'দু'য়ের বেশী
যাবে না ক পাওয়া,

এখন থেকে দুইটি হাতে
যতগুলি পাবো,
সবার আগে গুণ করিয়া
তার পরেতে খাবো।

একটু মাথা ঘামিয়ে যদি
'আঠারটি' পাই,
বোকার মত কেন তবে
অন্ন খেতে যাই।'

সময়ের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে "কাকাতুয়া" বলিতেছে—

বলিতেছে সোনার ঘড়ি 'টিক্ টিক্ টিক্,
যা কিছু করিতে আছে, করে ফেল ঠিক।
সময় চলিয়া যায়
নদীর স্রোতের প্রায়,
যে জন না বুঝে, তারে ধিক্ শতধিক্।
বলিছে সোনার ঘড়ি, 'টিক টিক টিক।'

গদ্য গল্প ও কাহিনীর মধ্যে অনেক গল্পই তাঁহার স্বরচিত ছিল। কিছু কিছু তিনি নিজের ভাষায় উপাখ্যান, পুরাণ বিদেশী কাহিনী প্রভৃতি হইতে লইয়া লিখিয়াছিলেন। ছোটদের জন্য রামায়ণ ও মহাভারত রচনা করিয়া তিনি ঐ দুই গ্রন্থের প্রচার শিশু-মহলেও করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। পশুপক্ষী সম্বন্ধে পুস্তকে লিখিয়া তিনি শিশুদিগের জীবজন্তু সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভের পথ খুলিয়া দিয়াছেন। দেশ ভক্তি ও জাতীয়তা শিক্ষার জন্য তিনি সখারাম গণেশ দেউস্কর লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত 'বন্দে মাতরম' গ্রন্থ সংকলন করিয়াছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে এক বৎসরে এই পুস্তকের তিনটি সংস্করণ হয়। "গল্প সঞ্চয়" পুস্তকে তিনি শিশু-মহলে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের পরিচয় দিয়াছেন। অর্থাৎ শিশু ও বালক বালিকাদিগের পাঠের উপযুক্ত সকল প্রকার গ্রন্থই তিনি লিখিয়া বা সংকলন করিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে নির্দ্দোষ আনন্দ লাভের ব্যবস্থাই অধিক ছিল। তাঁহার কল্পনাশক্তি অনন্যসাধারণ ছিল। প্রায় ৬০।৭০ বৎসর বাংলা দেশের শিশু ও বালক-বালিকাগণ যোগীন্দ্রনাথ সরকারকে নিজেদের পরম বন্ধু বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে। তাঁহার জন্ম শতবার্ষিকী বাংলার শিশুদিগের মহোৎসবের বিষয়। উদ্ভট কল্পনাকে সরস রূপ দান করিয়া শিশু-দিগকে আনন্দ দান করা ও তাহাদিগের চিন্তাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলার কার্য্যে যোগীন্দ্রনাথের সমকক্ষ লোক আধুনিক ভারতে কেহ জন্ম গ্রহণ করে নাই।

"এক যে আছে মজার দেশ
সব রকমে ভালো,
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ
দিনে চাঁদের আলো।
আকাশ সেথা সবুজ বরণ,
গাছের পাতা নীল;
ডাঙ্গায় চরে রুই কাত্‌লা
জলের মাঝে চিল।

* *

"ছেলেরা সব খেলা ফেলে
বই' নে বসে পড়ে;
মুখে লাগাম দিয়ে ঘোড়া
লোকের পিঠে চড়ে।

* *

"জিলিপী সে তেড়ে এসে,
কামড় দিতে চায়.
কচুরি আর রসাগোল্লা
ছেলে ধরে খায়।

* *

"মজার দেশের মজার কথা
বলবো কত আর;
চোখ খুললে যায় না দেখা
মুদ্‌লে পরিষ্কার।"

শিশু ও বালক-বালিকাদিগের পরম বন্ধু যোগীন্দ্র-নাথের নিজের সমবয়স্ক বন্ধুরও অভাব ছিল না। তাঁহার গিরিডির বাসভবন গোলকুঠিতে প্রতি বৎসর পূর্ণিমা সম্মেলন হইত পূজার ছুটির কাছাকাছি লক্ষ্মী পূর্ণিমার

দিনে। তাহাতে গান গাহিতেন প্রসিদ্ধ ক্রিকেট খেলোয়াড় কুলদারঞ্জন রায়, "দেলখোস" উদ্ভাবক হেমেন্দ্রমোহন বসু ও অন্যান্য বহু গুণী ব্যক্তি। গিরিডি তখন বাংলার গুণীজনের ছুটির সময়ের আবাস-কেন্দ্র ছিল। স্যার নীলরতন সরকার, সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, ডাঃ ডি, এন, মৈত্র, গগনচন্দ্র হোম, প্রভৃতি বহু কলিকাতাবাসী ব্যক্তি গিরিডিতে গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। গিরিডিকে কেন্দ্র করিয়া কোডার্ম্মার জঙ্গলে মৃগয়া করিতেও অনেকে যাইতেন। যোগীন্দ্রনাথের নিজের বড় পুকুরে মাছ ধরিতে বসিতেন বহু স্বনামধন্য ব্যক্তি। বাংলার কৃষ্টি যেমন সে যুগে বাংলার বাহিরে বহুস্থলে গড়িয়া উঠিয়াছিল; বারগণ্ডা, গিরি.ডতেও সেইরূপ একটি বিশেষ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। শরীর অসুস্থ হওয়ায় যোগীন্দ্রনাথ পরে কলিকাতায় চলিয়া আসেন। কিন্তু তাঁহার মনপ্রাণ সর্ব্বদাই সেই দীর্ঘ ইউক্যালিপ্টাস বৃক্ষশোভিত গোলকুঠিতেই পড়িয়া থাকিত।

(প্রবাসী। সম্পাদকীয়। পৌষ ১৩৭৩।)

শতবর্ষে যোগীন্দ্রনাথ

'অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে' এ ছড়া আজ বাংলাদেশের সব ছেলেমেয়েরই মুখস্থ। ছড়াটি 'হাসিখুশি' বইয়ে। অল্প লেখাপড়া-জানা ছেলে-মেয়েদের কাছেই শুধু নয়, অনেকের কাছেই এ বইটি বড় আদরের। বাংলাদেশে এমন লোক কমই পাওয়া যাবে যাঁরা এই 'হাসিখুশি'র কিছু-না-কিছু ছড়া মুখস্থ না বলতে পারেন। অথচ এর লেখক যোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্পর্কে আমরা যেন তেমনভাবে আজও সচেতন হতে পারি নি। নিজের লেখার পিছনে নিজেকে তিনি আশ্চর্যরকম প্রচ্ছন্ন রেখে গেছেন। আমরাও এই মহৎ লেখককে যেন পুরোপুরি আবিষ্কার করতে পারি নি।

সত্যি বলতে কি, শিশুদের কাছে লেখাপড়ার আকর্ষণ জোগাবার এমন যাদুকর এদেশে আর দ্বিতীয় কেউ আছেন কিনা সন্দেহ। 'হাসিখুশি'র দুটি ভাগ ছাড়াও যোগীন্দ্রনাথ যে ছড়া ও ছবি, ছবির বই, নূতন ছবি, আষাঢ়ে স্বপ্ন, খেলার সাথী, হিজিবিজি, শিশু চয়নিকা, পশুপক্ষী, ছোটদের মহাভারত, ছোটদের রামায়ণ প্রভৃতি লিখেছিলেন তা আজও শিশুসাহিত্যের সম্পদ। এ বছর হল তাঁর জন্ম শতবর্ষ। এই উপলক্ষে শতবর্ষের সূচনায় 'অমৃতে'র গত ৫ম বর্ষ, ১৮ সংখ্যায়, যোগীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী লিখিত একটি মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। যোগীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার জন্যে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত।

(অমৃত, ৬ষ্ঠ বর্ষ ২৬ সংখ্যা)

যোগীন্দ্রনাথ স্মরণে

যে "অ-এ অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে" ইত্যাদির মাধ্যমে অতীত ও আমাদের কালের বহু কোটি বঙ্গশিশুর মত আমাদেরও বাঙলা ভাষার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল এবং অনাগত ভবিষ্যৎ কালের আরও যেসব বহু কোটি কোটি বঙ্গশিশুর অক্ষর পরিচয় হবে তার স্রষ্টা যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁকে আমাদের প্রাণের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। যোগীন্দ্রনাথের হাসি-খুশির (দুই ভাগ) পর বহুকাল গত এবং এর মধ্যে প্রথম অক্ষর পরিচয় ও ভাষাজ্ঞানের উদ্দেশ্যে শত শত পুস্তক লিখিত হয়েছে কিন্তু "কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি ও খেঁকশিয়ালী পালায় ছুটির" মত অক্ষর পরিচয়ের ছড়া আর হয় নি। আর বিভিন্ন দুর্ঘটনায় মৃত বা নিরুদ্দেশ হারাধনের দশটি ছেলের কাহিনী ও পরবর্তীকালে তাদের পুন:প্রত্যাবর্তনের কাহিনী শিশুমন প্রথম গল্পপাঠের যে কৌতুহল ও আনন্দ সৃষ্টি করে তার তুলনাই বা কোথায় ? এছাড়া ছবির বই, মজার বই, হাশিরাশি, হিজিবিজি, জানোয়ারের কাণ্ড, ছোটদের চিড়িয়াখানা ইত্যাদি বিবিধ রসের শিশুসাহিত্য এবং ভারতের চিরায়ত পুরাণ রামায়ণ ও মহাভারতের যোগীন্দ্রনাথকৃত শিশু সংস্করণও যোগীন্দ্রনাথের অতুলনীয় কীর্তি। এমন একটা যুগে যোগীন্দ্রনাথ শিশুদের জন্য লেখনী ধারণ করেন যখন বাঙলাদেশে শিশুসাহিত্য বিশেষ মর্যাদা লাভ করেনি এবং শিশুসাহিত্যিকও তেমন স্বীকৃতি পাননি সমাজে। মনের শিশুসুলভ সারল্য ও অকৃত্রিম শিশুপ্রেম সেকালে এই পথের বিরলসংখ্যক পথিকের মত যোগীন্দ্রনাথকেও এই কর্মে ব্রতী করে। নিরলস সাধনা ও অকৃত্রিম নিষ্ঠার জন্য যোগীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশাতেই সাফল্যের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন—এটা সাহিত্যিক বিশেষ করে শিশুসাহিত্যিকদের পক্ষে বিরল সৌভাগ্য। অবশ্য জীবনের সেই সাফল্যের তুলনায় বহুগুণ অধিক সাফল্য তিনি অর্জন করেন পরবর্তীকালে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের কোটি কোটি বঙ্গশিশুর হৃদয়-সম্রাট হয়ে।

শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যোগীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আশা করব যে ভবিষ্যৎ কালের শিশুদের কাছে তাঁর রচনাবলী স্বল্পতর মূল্যে পৌঁছে দেবার জন্য স্বাধীন দেশের সরকার তার কর্তব্য পালন করবেন। ভাল কাগজে ভাল ছবিসহ ছাপা যোগীন্দ্রনাথের বইগুলি শিশুদের কেবল আনন্দবর্ধনই করবে না, ভবিষ্যৎ জাতিগঠনেরও সহায়ক হবে।

(সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, 'উত্তরা', বেনারস)

বিষ্ণুশর্মার চিঠি

এই বছরটি ছোটদের সাহিত্য-স্রষ্টা অবিস্মরনীয় পুরুষ যোগীন্দ্রনাথ সরকারের জন্ম-শতবার্ষিকী বৎসর। শিশু-সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম যুগেই তাঁর অনবদ্য অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন. ছোটদের জন্য যে বিস্ময়, কৌতুক ও জ্ঞানের ভাঁড়ার খুলে দিয়ে গেছেন, তার তুলনা হয় না। তোমরা তাঁর অসংখ্য বইয়ের মধ্যে একটি বইয়ের কথা শুনলেই আশ্চর্য হবে। সে বইখানি হচ্ছে 'হাসিখুশী'। এর দু'টি ভাগ আছে। বই দু'টি ভাগের মধ্যে প্রথম ভাগটির ও জন্ম শতবার্ষিকী হবে. গ্রন্থকারের নিজের জন্ম-শতবার্ষিকীর মত। এই 'হাসিখুসির জন্ম থেকে ১০০টি সংস্করণ পুর্ণ হবে এই বৎসর। অক্ষর পরিচয়ের অনেক বই বেরিয়েছে আজ, কিন্তু এর তুলনা নেই। ১৮৬৬ সালের ২৮শে অক্টোবর তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৩৭ সালে। আমরা তাঁর সম্পর্কে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করবার আয়োজন করছি।

আমার আদরের ভাই-বোনেরা,

গত সপ্তাহে শিশু-সাহিত্যের অমর স্রষ্টা যোগীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি বিশেষ সংখ্যা আমরা প্রকাশ করেছি। ইতিমধ্যেই এই বিশেষ সংখ্যা সম্বন্ধে অসংখ্য চিঠি এসেছে আমাদের হাতে নানা ধরণের সুখ্যাতি ও সাধুবাদে ভরা সেই চিঠিগুলি। সত্যিকার ছোটদের বন্ধু যোগীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলার বিষয় আছে অনন্ত। তাঁর প্রত্যেকটি বই শিশু-মনোরাজ্যের অমূল্য সম্পদ। তিনি তাদের জন্যে যা করে গিয়েছেন, তা তাঁর একার পক্ষে যেমন বিস্ময়কর, তেমনি অনবদ্য ও অনুচিকীর্ষার বিষয়। অবশ্য সেই সময়কার কিছু আগে-পরে আরও কয়েকজন শিশু-সাহিত্যের স্রষ্টা, যেমন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কুলদা রঞ্জন রায় নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রমদাচরণ রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সুকুমার রায়, সুখলতা রাও প্রভৃতিদের দান শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হলেও, যোগীন্দ্রনাথ ছোটদের অক্ষর পরিচয় থেকে সাহিত্যরস পরিবেশনের যে আকর্ষণীয় ও অভিনব কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, তার তুলনায় তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্। তাছাড়া ছোটদের লেখার সঙ্গে তাদের মনোহরনের অপুর্ব সহযোগিতা করত তাঁর বইয়ের ছবিগুলি।

তখনকার সময়ে শিশু-সাহিত্যের জন্য কোন পুরস্কার ছিল না, শিশু-সাহিত্যিকরা সংবর্ধিতও হতেন না আজকের মত, তবুও তিনি সে সময়কার পত্রিকাসমুহ ও মান্যগণ্য মণীষীদের কাছ থেকে প্রভুত প্রশংসালাভ করেন।

বিষ্ণুশর্মার চিঠি, ছোটদের পাতা,
দৈনিক বসুমতী—৬ই পৌষ, ১৩৭৩)

যোগীন্দ্রনাথ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বাংলা দেশের উনিশ শতক একটা আশ্চর্য যুগ। ভাবতে ইচ্ছে করে যে তখনকার মাটি জল হাওয়ায় এমন কিছু বিরল রহস্যময় উপাদান আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ভাবে মিশে গিয়েছিল যাতে অগণন অসামান্য বিরাট প্রতিভাধর সব মানুষের এই দেশে হঠাৎ আবির্ভাব সম্ভব করে তুলেছে।

এই শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করে বাংলা দেশকে যাঁরা ধন্য করেছেন, তাঁদের নামের দীর্ঘ তালিকা দেবার নিশ্চয় এখানে প্রয়োজন নেই। বাঙালী হিসাবে নিজের পরিচয় দিলে সে যুগের অবিস্মরণীয় সমস্ত নাম সম্বন্ধে অজ্ঞতা অমার্জনীয়। আজকের দিনে তাঁদের কাছে পাওয়া উত্তরাধিকার-ই আমাদের সব চেয়ে বড় সম্পদ। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজ চিন্তা, জীবনের এমন কোন দিক নেই, যাতে তাঁরা বাংলার নব-জাগরণের সূচনা করে যান নি।

এই অসামান্য দিক্‌-পালদের মাঝখানে যোগীন্দ্রনাথ সরকারও একটি একান্ত কৃতজ্ঞ চিত্তে মনে রাখবার নাম। তিনি বাংলা দেশের জন্যে যা করে গেছেন, প্রথমেই তা চোখে পড়বার মত না হলেও তার মূল্য আর কোনো কীর্ত্তির চেয়ে কম নয়।

শিশু বাংলার মুখে প্রথম ভাষা ছোটাতে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তিনি তাঁদের মধ্যেও পথিকৃৎ হিসেবে অদ্বিতীয়।

বর্ত্তমান কালের যে সহজ বলিষ্ঠ বাংলা ভাষা বিশ্বের সব চেয়ে অগ্রসর ভাষাগুলির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলবার যোগ্যতা অর্জন করেছে, তার পরমায়ু খুব দীর্ঘ নয়। একশ বছর আগে সে বাংলা ভাষা শৈশবের দুর্বল আড়ষ্টতা সবে পরিহার করে তার যাত্রা সুরু করেছে।

যোগীন্দ্রনাথ সেই যুগে জন্ম গ্রহণ করে দেশের ভবিষ্যতের ভার যাদের ওপর বর্ত্তাবে তাদেরই সার্থক ভাবে সাক্ষর করবার ব্রত নিয়েছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় আর প্রতিভায় অক্ষর পরিচয়ের পদ্ধতিতেই যুগান্তর এসেছে। শিশুদের পক্ষে যা ছিল চোখের জলের ভেতর দিয়ে গ্রহণ করবার অপরিহার্য শাস্তি, তাকেই তিনি আনন্দ-মধুর করে তুলেছেন। আগের যুগের হাতে খড়ির নীরস কঠোরতা দূর হয়ে হাসিখুশির পালা সুরু হয়েছে।

যোগীন্দ্রনাথের হাসিখুশি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন শিশু হিসাবে যাঁদের তা পড়বার সৌভাগ্য হয়েছিল, তাঁদের পুত্র পৌত্র নয় প্রপৌত্রদের হাতে এখনও সমানভাবে হাসিখুশি এবং যোগীন্দ্রনাথের আরো বহু বই ফিরছে। কয়েক পুরুষের বাঙালীর শৈশব সরস ও সমৃদ্ধ করে তোলার পর এখনও যে সে সব বইএর আকর্ষণ কিছুমাত্র কমেনি তার কারণ শুধু এই যে শিশুদের মনের দরোজা খোলবার বিরল আশ্চর্য্য চাবিকাঠিটি তাঁর হাতে ছিল।

আর যাঁকেই ভুলুক, যাঁর কাছে আনন্দের পাঠ নিয়ে এত কাল মানুষ হয়ে এসেছে শিশু মনের স্থপতি সেই যোগীন্দ্রনাথকে বাংলা দেশ কখনো ভুলবে না।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার স্মরণে

পরিমল গোস্বামী

অজগর প্রথমে তেড়ে এসেছিল, মন ভুলিয়েছিল, সেই ষাট বছর আগে। আজও হাসিখুশির সেই অজগর, সেই আম, সেই ইঁদুরছানা, সেই ঈগল মনের মধ্যে মহা সুখে সহ-অবস্থান করছে। কিন্তু আরও কিছুদিন বাদে 'হাসিরাশি' বইখানা যখন হাতে এলো, তখন সমস্ত মন কেড়ে নিল এই বইখানা। এর প্রত্যেকটি পাতা আমাকে কি পরিমাণ আকর্ষণ করেছিল, তার প্রমাণ আজও রয়েছে আমার স্মৃতিতে। এখনও, সেই এতদিন পরেও হাসিরাশির অনেকগুলি কাহিনীই মুখস্থ আছে। শত শত বার পড়েও পড়া শেষ হয় নি যা, তার স্মৃতি আজ আরও মধুর মনে হচ্ছে। কারণ এতদিন পরে আবার যোগীন্দ্রনাথ সরকারের কথা আলোচিত হচ্ছে তাঁর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে।

সমস্ত বাংলার শিশুচিত্তে একই ছন্দ একই আনন্দের হিল্লোল বইয়ে দিয়েছিলেন তিনি। তখন দূর পল্লীতে থাকি। তখন মনকে বিক্ষিপ্ত করতে পারত একমাত্র পল্লী প্রকৃতি। খোলা মাঠ, প্রশস্ত পদ্মানদী, স্বাধীন ভাবে যতদূর ইচ্ছা ছুটে বেড়াই। সে উন্মাদনাকে সংহত করে, সুস্থির করে, ঘরে বসিয়ে, রাখতে পারত ঐ একখানা বই—হাসিরাশি। ওর মধ্যে যে কাহিনী-গুলিতে কাহিনী ও ছন্দ একত্র মিলে ছোট ছোট গল্পের চেহারা পেয়েছে সেইগুলি আমাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করত। বীর শিশু, সাপ নয় তো যম, পেটুক দামু, দুষ্টু তিনু প্রভৃতি। এবং অন্যগুলিও যে কিছুমাত্র কম ভাল লাগত তা মনে হয় না। অনেকের জন্যই মনে একটু দুঃখ জাগত। মেহের আলী, কোলম্যান, বোকা সিংহ, যে টমাস সাহেবকে খেতে পারল না, এদের জন্য মন খারাপ হত। 'কাজের ছেলে' নামক কাহিনীটি সবচেয়ে মজার মনে হত তখন। একটি ছেলে বাজারে যেতে যেতে কি কি আনতে হবে সব গুলিয়ে ফেলল, তখন তার চেয়েও ছোট আমরা, তাকে নিয়ে কত হেসেছি, বার বার পড়ে শুনিয়েছি সমবয়সীদের।

যোগীন্দ্রনাথ প্রকৃত শিশুপ্রেমিক ছিলেন এখন তা ভাল বুঝতে পারি। আমাদের ঠিক কোন্ জিনিসটি ভাল লাগবে, তা নানা স্থান থেকে আহরণ করে এনে আমাদের ঠিক মনের মতো করে পরিবেশন করেছেন। ছন্দ রচনায় তাঁর সহজাত ক্ষমতা ছিল এবং বিদেশী কাহিনীকে তিনি যেভাবে সম্পূর্ণ স্বদেশী করে তুলেছেন তা ভাবলে তাঁর পরিকল্পনা, কল্পনা এবং ক্ষমতায় অবাক্ হতে হয়।

তিনি যা রচনা করেছেন ও যেসব ছড়া সংগ্রহ করেছেন তার প্রেরণা ছিল তাঁর অন্তরেই। তাঁর রচনার অনেক সক্ষম অনুকরণ হয়েছে এবং অসাধু ব্যবসায়ী প্রকাশক তাঁর লেখা কিছু কিছু বিকৃত করে, তাঁর বইয়ের নাম পর্যন্ত অপহরণ করে অপাঠ্য, অযোগ্য এবং অক্ষম সব বিকার বাজারে ছেড়েছে। একদিন হঠাৎ এমন একখানা বই হাতে পড়েছিল, দেখে দুঃখ হল।

ছোটদের জন্যে এখন অনেকেই লেখেন, কিন্তু তার মধ্যে তাদের প্রতি প্রকৃত মমত্ব-বোধের পরিচয় অল্প ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। ছোটদের ভাল না বাসলে শুধু ব্যবসার জন্য শিশু সাহিত্য রচনা করা চলে না। শুধু ভালবাসার অভাব নয়, দায়িত্ববোধের অভাবই সবচেয়ে বেশি পীড়িত করে।

যোগীন্দ্রনাথ আমাদের অভাব কোথায়, আমরা কি

পেলে খুশি হব, তার জন্য প্রধানতঃ ইংরেজী শিশু সাহিত্য মন্থন করে, যেসব কাহিনীকে বাংলা করা যায়, তা বেছে নিয়েছেন। এই বাংলা করা—অনুবাদ করা নয়; 'অ্যাসিমিলেশন' বা আত্তীকরণ যাকে বলে, তাই। তার ইংরেজী চেহারা আর নেই। ইংরেজকে ধুতি চাদর পরানো নয়, ইংরেজকে বাঙ্গালী ধর্মে রূপান্তরিত করা, দীক্ষা দেওয়া। হঠাৎ শুনলে মনে হবে এ কাজ বুঝি খুব সহজ। কিন্তু আমি প্রথমে একটি রচনা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি, 'ইংরেজ' ও 'বাঙালী'কে পাশাপাশি রাখছি আমার কথার সমর্থনে। এতে দেখা যাবে ইংরেজ কি ভাবে চেহারায় পোশাকে এবং চালচলনে সম্পূর্ণ বাঙালী হয়ে গেছে।

'কাজের ছেলে' নামক কবিতার কথা উল্লেখ করেছি। সেটি এই—

"দাদ্‌খানি চাল মুসুরির ডাল
চিনি-পাতা দৈ,
দু'টা পাকা বেল, সরিষার তেল,
ডিম-ভরা কৈ।"

"পথে হেঁটে চলি, মনে মনে বলি
পাছে হয় ভুল,
ভুল যদি হয়, মা তবে নিশ্চয়
ছিঁড়ে দেবে চুল।

"দাদ্‌খানি চাল মুসুরির ডাল
চিনি-পাতা দৈ,
দু'টা পাকা বেল, সরিষার তেল,
ডিম-ভরা কৈ।"

"বাহবা বাহবা ভোলা, ভুতো, হাবা
খেলিছে ত বেশ!
দেখিব খেলাতে কে হারে কে জেতে
কেনা হলে শেষ।"

"দাদ্‌খানি চাল মুসুরির ডাল
চিনি-পাতা দৈ,
ডিম-ভরা বেল, দুটো পাকা তেল
সরিষার কৈ।"

"ওই ত ওখানে ঘুড়ি ধরে টানে
ঘোষেদের ননী;
আমি যদি পাই তা হলে উড়াই
আকাশে এক্ষনি।

"দাদ্‌খানি তেল ডিম-ভরা বেল
দু'টা পাকা দৈ,
সরিষার চাল চিনি-পাতা ডাল
মুসুরির কৈ!

এসেছি দোকানে কিনি এইখানে,
যত কিছু পাই;
মা যাহা বলেছে, সব মনে আছে,
তা'তে ভুল নাই।

দাদ্‌খানি বেল মুসুরির তেল
সরিষার কৈ,
চিনি-পাতা চাল, দু'টা পাকা ডাল,
ডিম-ভরা দৈ।"

মডেল ইংরেজী কবিতাটি এই—

"A pound of tea at one-and-three
And a pot of raspberry jam
Two new laid eggs, a dozen pegs
And a pound of rashers of ham."

I'll say it over all the way,
And then I'm sure not to forget,
For if I chance to bring things wrong,
My mother gets in such a pet.

"A pound of tea at one-and-three
A pot of raspberry jam,
Two new-laid eggs, a dozen pegs,
And a pound of rashers of ham."

There in the hay the children play
They're having such jolly fun ;
I'll go there, too, that's what I'll do,
As soon as my errands are done.

"A pound of tea at one-and-three
A pot of —er—new-laid jam,
Two raspberry eggs, with a dozen pegs,
And a pound of rashess of ham."

There's Teddy White a-fling his kite
He thinks himself grand, I declare ;
I'd like to try to fly it sky-high
Ever so much higher
Than the old church spire
And then—and then—but there—

A pound of three-and one at tea,
A pot of new-laid jam,
Two dozen eggs, some raspberry pegs,
And a pound of rashers of ham."

Now here's the shop,
outside I'll stop,
And run through
my orders again

I haven't forgot—no,
ne'er a jot—
It shows I'm pretty 'cute,
that's plain.

"A pound of three at one-and tea
A dozen raspberry ham,
A pot of eggs, with a dozen of pegs,
And rasher of new-laid jam."

ইংরেজীতে নয়টি স্তবক, বাংলাতেও তাই। ইংরেজী কবিতার ষষ্ঠ স্তবকে ছয়টি লাইন, কিন্তু দাদখানি চালের কবিতায় প্রতি স্তবকে সমান সংখ্যক চার লাইন। উদ্ধৃতি চিহ্ন দুটিতে ঠিক এক রকম। কিন্তু বিষয়, দুটিতে দু' রকম। একটিতে বিলেতের বাজার, অন্যটিতে বাংলা দেশের বাজার। কাজেই দাদখানি চালের কবিতা বাংলার শিশুদের জ্ঞানে ও চেতনায়, চিরদিনের জন্য গাঁথা হয়ে গেছে। যোগীন্দ্রনাথ তাঁর হাসিখুসি, হাসিরাশি, মজার গল্প, ছবির বই, ছড়া ও পড়া প্রভৃতি বইতে যে সব শিশু জনপ্রিয় বিষয় নানা ভাণ্ডার থেকে আহরণ করেছেন, তার ভিতর দিয়ে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্নেহশীল এবং আপন দায়িত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন মনের পরিচয় পাওয়া যায়। একই সঙ্গে আনন্দ, কৌতুক, শিক্ষা এবং শুচিতার মিলন তিনি তাঁর সমস্ত রচনায় ঘটিয়েছেন।

হাসিখুশি প্রথম ভাগে যোগ বিয়োগ শিক্ষার জন্য যে দুটি ছড়ার ব্যবহার করা হয়েছে, তার মধ্যে হারাধনের দশটি ছেলে সবচেয়ে বিখ্যাত এবং কোনো বাঙালী ছেলে—আমাদের কালের বা একালের হারাধনের ছেলেদের খবর জানে না, এ কথা কল্পনাই করা যায় না। যে ইংরেজী ছড়া থেকে এটি বাংলায় রূপান্তরিত করা হয়েছে, তার সঙ্গে এটিও একত্র উদ্ধৃত করে যোগীন্দ্রনাথের আত্তীকরণের আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছি।

দশটি ছেলে

হারাধনের দশটি ছেলে
ঘোরে পাড়াময়,
একটি কোথা হারিয়ে গেল
রইল বাকি নয়।

হারাধনের নয়টি ছেলে
কাটতে গেল কাঠ
একটি কেটে দুখান হ'ল
রইল বাকি আট।

হারাধনের আটটি ছেলে
ব'সলো খেতে ভাত,
একটির পেট ফেটে গেল,
রইল বাকি সাত।

হারাধনের সাতটি ছেলে
গেল জলাশয়,
একটি সেথা ডুবে ম'ল
রইল বাকি ছয়।

হারাধনের ছয়টি ছেলে
চ'ড়তে গেল গাছ,
একটি ম'ল পিছলে প'ড়ে
রইল বাকি পাঁচ।

হারাধনের পাঁচটি ছেলে
গেল বনের ধার,
একটি গেল বাঘের পেটে
রইল বাকি চার।

হারাধনের চারটি ছেলে
নাচে ধিন্ ধিন্,
একটি ম'ল আছাড় খেয়ে,
রইল বাকি তিন।

হারাধনের তিনটি ছেলে
ধরতে গেল রুই,
একটি খেলে বোয়াল মাছে
রইল বাকি দুই।

হারাধনের দুইটি ছেলে
মারতে গেল ভেক,
একটি গেল সাপের বিষে
রইল বাকি এক।

হারাধনের একটি ছেলে
কাঁদে ভেউ ভেউ,
মনের দুঃখে বনে গেল,
রইল না আর কেউ।

যে ইংরেজী নার্সারি রাইম্ থেকে এটির প্রেরণা, সেটাও এই সঙ্গে উপহার দিচ্ছি।

Ten little Nigger boys
went out to dine ?
One choked his little self
and then there were nine.

Nine little Nigger boys
sat up very late ;
One overslept himself
and then there were eight.

Eight little Nigger boys
travelling in Devon ;
One said he'd stay there
and then there were seven.

Seven little Nigger boys
chopping up sticks ;
One chopped himself in halves
and then there were six.

Six little Nigger boys
playing with a hive
A bumble bee stung one
and then there were five.

Five little Nigger boys
going in for law ;
One got in Chancery
and then there were four.

Four little Nigger boys
going out to sea ;
A red herring swallowed one
and then there were three.

Three little Nigger boys
walking in the zoo ;
A big bear hunged one
and then there were two.

Two little Nigger boys
sitting in the sun ;
One got frizzled up
and then there was one.

One little Nigger boy
left all alone
He went and hanged himself
and then there were none.

বাংলা ও ইংরেজী পাশাপাশি পড়লেই বোঝা যাবে ঐ ইংরেজী ছড়া বাংলায় এসে কেমন বাঙালী হয়ে গেছে। মূল ছড়ায় দশটি নিগার ছেলের পিতৃ-পরিচয় ছিল না, কিন্তু বাংলায় তারা হারাধনের দশটি ছেলে। এই হারাধন নামটি তস্য পুত্রদের ভাগের সম্পর্কে এমন সুন্দর ইঙ্গিতপূর্ণ হয়েছে যে, এ বিষয়ে যোগীন্দ্রনাথের উঁচু দরের কল্পনাশক্তির প্রশংসা না করে পারা যায় না। হারাধন নামটি যে তাঁর কি ভাবে মনে এসেছিল এবং মনে এসেছিল বলেই এটি যে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর মূল বাংলা কবিতার চেহারা পেয়েছে, সে কথা ভাবলে অবাক্ লাগে। ওরা হারাধনের ছেলে না হয়ে অন্য কারো ছেলে হলে এ কাহিনীর দাম কতখানি কমে যেত, এখন আর তা অনুমান করবার উপায় নেই।

(নিগার কথায় আপত্তি হওয়াতে পরে ওটি "টেন্ লিটল ইণ্ডিয়ান বয়েজ' করা হয়েছিল ইংরেজীতে।)

প্রথম জীবনে যোগীন্দ্রনাথ মাত্র পনেরো টাকা বেতনের স্কুল শিক্ষক ছিলেন এবং শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত (১৮৯৫ থেকে ১৯০০ খ্রীঃ পর্যন্ত সম্পাদক) 'মুকুল' নামক মাসিক পত্রের সঙ্গে কোন এক সময়ে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

সে যুগের বাংলা দেশের শিশুদের শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে যোগীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব বিচার করলে তবে তাঁর মূল্য বিচার যথার্থ হওয়া সম্ভব।

যোগীন্দ্রনাথ নিজে প্রকাশক হয়ে নিজের বই ছাপিয়েছিলেন এবং ১৯২৩ সালে অক্ষম হয়ে পড়া সত্ত্বেও ছোটদের জন্যে বই রচনা করা বন্ধ করেন নি। তিনি শিশুচিত্তের বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তাঁর সব বই ছোটদের জন্য, বয়স হিসাবে পর পর মাত্রা ভাগ করা আছে। উপেন্দ্র-কিশোর বা সুকুমার রায়ের লেখাও ছোটদের জন্য। কিন্তু যোগীন্দ্রনাথ একেবারে অজগর থেকে আরম্ভ করেছিলেন। তিনি নানা দেশের উপকথা সংগ্রহ করেছেন। ছবি ও গল্প নামক বইয়ের গোড়ায় লিখেছেন—

কুসুমিত-বন করিয়া চয়ন
ভরিয়া কুসুম-ডালা,
নবীন মুকুলে হাসিমাখা ফুলে
গাঁথিয়া এনেছি মালা।

এবং এই চয়নের জন্য শেষ পর্য্যন্ত তিনি "বনে-জঙ্গলেও" প্রবেশ করেছেন অর্থাৎ বনে-জঙ্গলে আমাদের যে সব প্রতিবেশী বাস করে, সেই সব জীবজন্তুদের নানাজনের রচনা এ বইতে সঙ্কলিত হয়েছে। চয়নের বৈচিত্র্য, চয়নকারীর শিশুপ্রীতির ছাপ এঁকেছে প্রতিটি পৃষ্ঠায়। এ সব বই হাতে স্পর্শ করা মাত্র সহসা শৈশবে ফিরে যাই, আবার নতুন করে পড়ি সেই বহুবার পড়া বই, নতুন করে চারিদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি—ক্ষণকালের জন্য হারাণো আনন্দের মধ্যে ডুবে যাই। চেয়ে চেয়ে দেখি সেই অজগর, সেই মেহের আলি, সেই দুষ্টু তিমু, সেই বীর ফটিকচাঁদ আবার জীবন্ত হয়ে চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়। যাঁর বহু রচনার ভিতর দিয়ে প্রথম শিক্ষা আরম্ভ করেছি, সেই আমাদের পরম প্রিয় চির কল্যাণাকাঙ্ক্ষী যোগীন্দ্রনাথের উদ্দেশে, তাঁর শত জন্মবর্ষে প্রণাম নিবেদন করি।

(সাপ্তাহিক বসুমতী, ৩রা কার্তিক, ১৩৭৩)

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

ওগো! কাল-ভোলা কীর্ত্তি তোমার অচপল,
কবি! মৃত্যুবিজয় তব কাব্য সকল;
ঝরে কণ্ঠে পীযূষ তব নিত্যকালে;
চির রাজ-টীকা ভায় তব দীপ্ত ভালে!

—রংমশাল

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাঙলা দেশের জীবনে উনবিংশ শতাব্দী আত্মিক ফসলের বিস্ময়কর প্রাচুর্য এনেছিলো। যাঁর অনন্য সাধারণ ব্যক্তি সত্তার প্রাণদায়িনী ধারায় বাঙলা দেশের মানস-মৃত্তিকার বন্ধ্যাত্ব ঘুচে গিয়েছিলো, তিনি হচ্ছেন রামমোহন রায়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন বটে, কিন্তু তাঁর সাধনার বীর্যবতী ধারায় সিক্ত বাঙালীর জাতীয় সত্তা অপূর্ব সৃষ্টির ফসল ফলিয়ে চল্‌লো প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে। মানবজীবনের প্রতিটি দিক আলোকিত হোলো সেই সৃষ্টির আলোকে। রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার, ভাষা-সংস্কার, সাহিত্য-রচনা—এক কথায় বাঙালীর সর্বতোবদ্ধ সাধনা অতীতের বিচারহীন জড়তার বন্ধন থেকে মুক্ত করে মানবতার পূর্ণ বিকাশের পথে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলো। এই ধারারই ফসল হলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। বহুমুখী ছিলো তাঁর প্রতিভা। কুড়ি একুশ বছর যখন তাঁর বয়েস তখন 'বিকাশ' ও 'দীপ্তি' নামক দুটি কবিতার বই রচনা করেন। এই বই দুটি রচিত হওয়ার পাঁচ বছর বাদে ছাপানো হয়। এই হোলো তাঁর রচনার প্রারম্ভ। 'বিকাশ'-এর 'বাসনা,' 'আঁখি, 'ডুবে যাই' কবিতাগুলি যোগীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভার নিদর্শন।

আশ্চর্য এই যে তিনি এই সময়েই, তরুণ বয়েসেই তাঁর সৃজনী-শক্তির সার্থক বিকাশ কোন পথে হবে সেটা সঠিক ভাবে ধরতে পেরেছিলেন।

শিশুদের পাঠোপযোগী বই বাঙলা ভাষায় ছিলো না বল্লেই হয়। যোগীন্দ্রনাথ শিশুদের জন্যে সাহিত্য রচনার কাজে নিজেকে ঢেলে দিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে 'হাসি ও খেলা' বইটি প্রকাশিত হোলো। এইটিই হোলো শিশুদের জন্যে লেখা সর্ব প্রথম বই বাঙলা ভাষায়। তারপর থেকে শিশু-সাহিত্য রচনার ধারা অবিরাম বইতে লাগলো। 'ছবি ও গল্প' (১৮৯২ খৃষ্টাব্দে), 'হাসিখুসি' (১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে), 'রাঙা ছবি' (১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে) ও 'খুকুমণির ছড়া, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে রচিত হোলো। বাংলা দেশের নানা জায়গায় যে সব গ্রাম্য ছড়া ছড়িয়ে ছিলো, সেই অফুরন্ত ছড়ার ভাণ্ডার থেকে যোগীন্দ্রনাথ চারশোর উপর ছড়া বাছাই করে নিয়ে ছড়ার সংকলন করলেন 'খুকুমণির ছড়া'-য়। চল্‌তি ছড়ার এই প্রথম সংকলন বাংলা ভাষায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই সব ছড়া সংগ্রহের কাজে লেগেছিলেন, যোগীন্দ্রনাথ এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন জেনে রবীন্দ্রনাথ ছড়া সংগ্রহের কাজ থেকে বিরত হন। শিশুদের জন্যে যোগীন্দ্রনাথ সাতাশটি বই রচনা করেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন শিশুদের জন্যে 'গল্প সঞ্চয়' নাম দিয়ে একটি গল্পের চয়নিকা প্রকাশ করেন, তখন সেই বইটির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"ছেলেদের যেমন চাই দুধ ভাত, তেমনি চাই গল্প। যে মা-মাসিরা তাদের খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছে, এতোকাল তারাই তাদের মিষ্টি গলায় গল্প যুগিয়ে এসেছে। ছেলেদের সেই সত্যযুগ আজ এসে ঠেকেছে কলিযুগে—আজকের দিনের মা-মাসিরা গেছেন গল্প ভুলে—কিন্তু ছেলেরা তাদের ফরমাস ভোলেনি। ছেলেরা আজো বলছে—গল্প বলো। কিন্তু তাদের ঘরের মধ্যে গল্প নেই। এই গল্পের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্যে যাঁরা কোমর বেঁধেছেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য যোগীন্দ্রনাথ। তিনি নিজের সম্বল থেকেও কিছু দিচ্ছেন, ভিক্ষে করেও কিছু সংগ্রহ করছেন। ছেলেরা তো আশীর্বাদ করতে জানে না, সেই আশীর্বাদ করবার ভার নিলেন তাদের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ।

পুরাণের গল্পগুলিকে ছেলেমেয়েদের উপযোগী করে করে সাজিয়ে গুছিয়ে আবিলতা-বর্জিত করে 'একলব্য', 'নলদময়ন্তী', 'শকুন্তলা', 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' প্রভৃতি একুশটি বই রচনা করেন যোগীন্দ্রনাথ।

শিশুদের জন্মে যোগীন্দ্রনাথ 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ'এর যে পরিমার্জিত সংস্করণ বের করেন সেটি নেড়ে চেড়ে দেখে ১৩৩৫ সালের ১লা কার্ত্তিক রবীন্দ্রনাথ লেখেন— "শিশুকালে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়েছি—বটতলায় ছাপা। তাই আমাদের যথেষ্ট ছিল। এখন ছেলেরা ছাপাখানা থেকে প্রচুর প্রশ্রয় পেয়েছে,—যোগীন্দ্রবাবুই তার প্রথম সুরু করেছেন। এখন ছেলেদের মানসিক ভোজে সাজ-সজ্জার আয়োজন অনেক বেশি দরকার হয়েছে, নইলে তাদের রুচি হয় না। তাই কৃত্তিবাসকে আধুনিক সাজে সাজিয়ে বের করতে হল—নইলে তাঁর নির্বাসন দণ্ড সইতে হত। ভালো কাগজ, মোটা অক্ষর, তার উপরে ছবি—বৃদ্ধকে বেশ নবীন দেখতে হয়েছে। আশা করা যায় ছেলেরা প্রথমটা বাইরের চেহারা দেখে ভুলবে, তারপরে ভিতরে রসের সন্ধান পাবে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ যদি বাঙালী ছেলেমেয়েরা না পড়ে তবে তার চেয়ে শোচনীয় আশঙ্কা তাদের পক্ষে আর কিছু হতে পারে না। সেই পড়বার পথ যোগীন্দ্রবাবু মনোরম করে দিয়েছেন—এটা একটা সৎকীর্তি।

এ সব ছাড়াও যোগীন্দ্রনাথ সতেরো অ ঠারোটি পাঠ্যপুস্তক লেখেন ছেলেমেয়েদের জন্মে। যোগীন্দ্রনাথ রচিত 'জ্ঞান-মুকুল' পাঠ্যপুস্তকটির খুব উচ্চ প্রশংসা করেন চন্দ্রনাথ বসু ও আনন্দমোহন বসু।

বঙ্গ সাহিত্যের পথে শিশুদের উপযোগী রচনার সম্ভার তৈরী করে যিনি প্রথম দেখা দিলেন তিনি হচ্ছেন যোগীন্দ্রনাথ। তিনি শিশু-সাহিত্যের পথিকৃৎ ও সার্থক স্রষ্টা। তাঁর দান অপরিসীম ও অপরিশোধ্যে।

তাঁর চরিত্রের আর একটি দিক ছিল যেটি জনসাধারণের দৃষ্টির অগোচরে থেকে গেছে। সেটি হচ্ছে তাঁর স্বাদেশিকতা। এই স্বাদেশিকতার মধ্যে উচ্ছ্বাস ছিল না, ছিল সংযত গভীরতা। শিশু-সাহিত্য রচনাও এই স্বাদেশিকতার অঙ্গ বলে আমি মনে করি।

১৯০৫ সাল স্বদেশী আন্দোলনের যুগ সুরু হয়েছে। বাঙলা দেশ তখন প্রজ্জ্বলিত দেশ-প্রেমের অগ্নি-শিখায়। সেই আগুন জ্বালাতে ও ছড়াতে গান কম সাহায্য করেনি। বক্তৃতা যা করতে পারেনি, গান অতি সহজে সেই কাজ সম্পন্ন করেছিল। 'বন্দেমাতরম' নাম দিয়ে স্বদেশী গানের একটি সংকলন ছাপান যোগীন্দ্রনাথ ১৯০৫ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই বইটির তিন সংস্করণ হয় ও ছ হাজার বই নিঃশেষে বিক্রী হয়ে যায়। এই স্বদেশী গানের বইটির ভূমিকা লিখে দেন পরম শ্রদ্ধেয় দেশভক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর। দেউস্কর মহাশয় ছিলেন যোগীন্দ্রনাথের সহপাঠী। দেওঘরের বিদ্যালয় থেকে এঁরা দুজনে এণ্ট্রেন্স্ পরীক্ষা পাশ করেন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, লিয়াকৎ হোসেন প্রভৃতি ছিলেন যোগীন্দ্রনাথের পরম বন্ধু। দাসাশ্রম মেডিকল হলে ছিলো এই বন্ধুদের নিয়মিত আড্ডা।

কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় যখন গ্রেপ্তার হয়ে বর্মায় নির্বাসিত হন, তখন তাঁর বহু বন্ধু-বান্ধব ভয় পেয়ে সরে পড়েন। কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের পুত্র সুকুমার মিত্রকে যোগীন্দ্রনাথ সেই বিপদের দিনে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি ও স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃবর্গ ও কর্মীদের প্রতি তাঁর ছিল সুগভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা।

আর একটি স্মরণীয় কাজ তিনি করেন ১৯০৮ সালে। রবীন্দ্রনাথের গানের একটি সংকলন তিনি বের করেন এই সময়ে। এই হল রবীন্দ্রনাথের গানের প্রথম সংকলন। রবীন্দ্রনাথ বইটি পেয়ে ১৩১৫ সালের অভ্র ৭ মাসে যোগীন্দ্রনাথকে লেখেন, "আপনি পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া বইখানি যে এমন সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন সেজন্ম আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন।"

এইভাবে যোগীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধরে বাঙলার ও বঙ্গ সাহিত্যের সেবা করে গেছেন। ১৯৩৭ সালে তাঁর জীবনের অবসান ঘটে।

গিরিডিতে যোগীন্দ্রনাথ

বিমলাংশু প্রকাশ রায়

গিরিডির উপকণ্ঠে উচ্ছৃংখল উশ্রী নদীর তীরে বারগণ্ডা আগেকার দিনে ছিল জনমানবশূন্য শালবনের শ্যামল অঞ্চলে আবৃত। কোন্ অজ্ঞাত খনি থেকে তাম্র-প্রস্তর আহরণ করে এক সাহেব কোম্পানী কিছুকালের জন্যে এই বারগণ্ডায় তিনটে চুল্লিতে সেই প্রস্তর গালিয়ে তাম্র নিষ্কাশন করে চালান দিত সুদূর পাশ্চাত্য দেশে। কারখানাটা উঠে যাবার পর পড়ে ছিল তিনটে উত্তুঙ্গ চিমনী, সাহেবদের পরিত্যক্ত বাসস্থান—তিনটি বাংলো ও একটি পাকা খিলানের গুদাম ঘর। বাংলো তিনটি তিন বন্ধুতে মিলে কিনে নেন। বড় সাহেবের এক পাশের বড় বাংলোটা কিনলেন শ্রদ্ধেয় সত্যানন্দ বসু, মাঝেরটা কিনলেন ডাক্তার নীলরতন সরকার, আর অপর পাশের বাংলোটা কিনলেন পূজনীয় শশীভূষণ বসু। এই শেষোক্ত বাংলোটাই 'বারগণ্ডা বাংলো' নামে খ্যাত এবং এটাকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠলো বারগণ্ডায় একটা ভদ্র উপনিবেশ যাকে 'ব্রাহ্ম কলোনি' বলা চলে।

শশীবাবু ও সত্যানন্দবাবু সপরিবারে বাস করতে লাগলেন নিজ নিজ বাড়ীতে। কিন্তু নীলরতনবাবুর বাড়ীটা প্রায়ই খালি পড়ে থাকতো বহুকাল অবধি। সেখানে যত রাজ্যের মুরগী বিচরণ করতো এবং বাসও করতো। আমরা মাঝে মাঝে গিয়ে ডিম সংগ্রহ করে নিয়ে আসতাম।

আর একটা কথা বলতে ভুলেছি—সেই পাকা খিলানের মজবুৎ গুদাম ঘরটা বিস্তৃত জমিসহ কিনে নিয়েছিলেন কুমারী সরলাবালা রক্ষিত। আর একটি পরিবার বারগণ্ডায় গোড়ার দিকেই থাকতেন—গোপালচন্দ্র দাস মহাশয়ের পরিবার। বোধ হয় শশীবাবুদের আসবার আগেই এসে বাড়ী তৈরী করে বাস করতে থাকেন সপরিবারে তিনি। এই কয়েকটি মাত্র পরিবারের বাস ছিল ঐ বিশাল শালবনের ফাঁকে ফাঁকে। রাতে শেয়াল হুণ্ডারের হুংকার। বেশ ভয়ে ভয়েই থাকতে হতো। কিছু দূরেই ঘন বনাবৃত খাণ্ডোলি পাহাড়ে ব্যাঘ্রের বসতি ছিল এবং বারগণ্ডা পর্যন্ত নৈশ বিচরণ তাঁদের অসম্ভব ছিল না।

তারপর ধীরে ধীরে বসতি বাড়তে থাকে। বন্ধুবৎসল শশীবাবুর এবং সদাসেবাব্রতা প্রসন্নমূর্তি তদীয় পত্নীর পরিচিত অপরিচিত অতিথির সমাগম হঠাৎ এক একদিন হতো তাঁদের বাড়ীতে। পরদিনই জমি দেখা এবং এক এক খণ্ড করে কিনে নেওয়া ও দু' চার মাসের মধ্যেই শশীবাবুরই ভ্রাতুষ্পুত্র বরেন্দ্রকুমার বসুর সাহায্যে বাড়ী তৈরী হয়ে যেতে লাগলো।

এমনি এক সময় এলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার। তিনি অবিশ্যি তাঁর মেজদাদা নীলরতনবাবুর বাড়ীতেই উঠলেন কিন্তু আড্ডাটা জমতো এসে শশীবাবুর বাড়ীতে। শশীবাবুর বাড়ীর ঠিক পাশেরই জমিটা ছিল চৌরাস্তার মোড়ে। খুব রোখের মাথায় সেইটে তিনি নিলেন কিনে এবং শশীবাবুর বাড়ীর চাতালে বসে তাঁর ভাবী বাড়ীর প্রকাণ্ড নক্সা-কাগজখানি বিস্তৃত করে যখন বসতেন আমরা তখন তন্ময় হয়ে সেইদিকে তাকিয়ে থাকতাম এবং যোগীনদার ভাবী বাড়ীর প্রাক্‌বিবরণ শুনতাম। বাড়ীর নাম হবে গোলকুঠি। মানুষের আগে হয় জন্মগ্রহণ, তারপর হয় নামকরণ। কিন্তু এখানে উল্টো ব্যাপার। আগেই হলো নাম, পরে হলো ধাম। বাল্মীকির রামায়ণ রচনার মতো। তার কারণ নক্সাতেই দেখা গেল—অপরূপ ভঙ্গিমায় বাড়ীটা তৈরী হবে, প্রত্যেকটা ঘর হবে গোল গোল। কাজেই সমগ্র বাড়িটাই হবে গোল। তাই নাম হবে গোলকুঠি। 'এখানে উল্টো

ব্যাপার' কথাটা লিখতে গিয়েই যোগীন্দ্রনাথের-ই একটা মজাদার কবিতা মনে পড়ে গেল :—

"এক যে আছে মজার দেশ
সবরকমে ভাল
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ
দিনে চাঁদের আলো

*　　*　　*

জিলিপী সে তেড়ে এসে
কামড় দিতে চায়
কচুরি আর রসগোল্লা
ছেলে ধরে খায়।"

কবে কোন্ ছেলেবেলায় পড়েছিলাম এই কবিতা, আজ বুড়ো বয়সেও ভুলতে পারিনি এ লেখা। এ ভুলবার নয়। বাস্তবিক যোগীন্দ্রনাথের কোন লেখাই ভুলবার নয়। তাইতো আজ যাঁরা ঠাকুরদাদা দাদামশাই হয়েছেন, তাঁরা নাতি-নাতনীদের হাতে অধুনা বাজার-চলতি রাজ্যের ডিটেক্‌টিভ গল্প না দিয়ে এখনও তুলে দেন "হাসিখুসি", "রাঙা ছবি", "হাসি ও খেলা", "ছবি ও গল্প" যা পড়ে ছেলেবেলায় নিজেরা মুগ্ধ হয়েছিলেন।

যাই হোক কয়েক মাসের মধ্যেই গোলকুঠি তৈরী হয়ে গেল যোগীনদার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে। সেই সকাল থেকে ছাতা মাথায় প্রচণ্ড গরমেও মিস্ত্রি-মজুর খাটাতেন। পেশার কি পরিবর্তন? কোথায় কলকাতায় পাখার তলায় বসে গল্পের বই লেখা বা প্রুফ দেখা, আর কোথায় এই বিহারের মরুপ্রায় প্রান্তরে বসে বা দাঁড়িয়ে বা ঘুরতে ঘুরতেও ঘূর্ণ্যমান মজুরদের চালিত করতে লেগে গেলেন।

গোলকুঠির আর একটা বিশেষত্ব হলো—বাড়ীর সংলগ্ন সামনে বিশাল চাতাল এবং সেটিও গোলাকার। এই গোল চওড়া চাতালে প্রতি সন্ধ্যায় বসতো রাউণ্ড টেবল্ কনফারেন্স। বহু লোক সমাগম হতো। কারণ তত দিনে দিকে দিকে বহুলোকের বাড়ী উঠে গেছে। ছুটিতে ছুটিতে বারগণ্ডা তখন সরগরম। আর সকলের আড্ডার জায়গা ছিল ঐ গোলকুঠির গোল চাতাল। সারা দিনমানের অভিজ্ঞতা যে যার মতো বর্ণনা করতেন এখানে এসে। যোগীনদা সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা করতেন এবং সকলের গল্পই জমে উঠতো।

ইউক্যালিপটাস্ তেলকেই আমরা জানতাম, ইউক্যালিপটাস্ গাছ কখনো দেখিনি আগে। যোগীনদা এনে বাড়ীর চারিধারে ইউক্যালিপটাস্ গাছ লাগিয়ে দিলেন অনেক। আমরা অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম সে গাছ ঐ শুকনো পাথুরে জমিতেও তর্ তর্ করে গজিয়ে উঠতে লাগলো। আরও অনেক রকম গাছও তিনি লাগিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু ইউক্যালিপটাস্ গাছগুলো হাই জাম্প সকলকে হারিয়ে দিয়ে হাওয়ায় দোদুল্যমান মস্তক সগর্বে বিরাজ করতে থাকতো। এই সঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল। যোগীন্দার কাছে তাঁর বাগানে গিয়ে একদিন আমি বিকালে ইউক্যালিপটাস্ গাছগুলোর তারিফ করছিলাম। যোগীনদা বললেন, "এই গাছ, জান বিমল, আজ সকালে আমার মান বাঁচিয়েছে"। আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকাতে তিনি বলতে লাগলেন, "আজ ভোরবেলায় হয়েছিল কি জান, এই গরমে আমিও খালি গায়ে গাছগুলো দেখতে লেগেছি, এমন সময়ে হঠাৎ পিছন থেকে মেয়েলি গলায় শুনলাম, 'ভোরবেলাই গাছের তদারক!' ফিরে দেখি মিস ঘোষ। আমি অমনি বললাম—হ্যাঁ, এই ইউক্যালিপটাস্ গাছটা কত উঁচু হয়েছে দেখুন ত। তিনি যেই উপরের দিকে তাকিয়েছেন অমনি আমি কোঁচার খুঁটটা খুলে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে দিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলাম তাঁর সঙ্গে।" মিস সুরবালা ঘোষ ছিলেন বেথুন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, ছুটিতে এসে ছন তাঁর বাড়ীতে।

হ্যাঁ, এক সন্ধ্যায় গোল চাতালে এসে গল্প জুড়ে দিলেন প্রকাশদা (প্রকাশ চন্দ্র বসু) জানো যোগীদা, আজ ভোরে উঠেই খুব ধমক্ খেয়েছি Dr. V. Raya* কাছে।

*Dr. V. Ray, D. L.—Calcutta Improvement Trust-এর ভূতপূর্ব্ব Chairman শ্রীকরুণাকেতন সেন ইঁহার দৌহিত্র।

যোগীদা উদ্‌গ্রীব হয়ে জিগেস করলেন, "কেন, কি ব্যাপার?" প্রকাশদা তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত কায়দায় মুখের এক প্রান্তে হাসি ফুটিয়ে বর্ণনা করতে লাগলেন "ভোর বেলা উঠেই সবে বারন্দায় পা বাড়িয়েছি, অমনি Dr. V. Rayর দর্শন আর তাঁর প্রথম কথাই হলো—

'দেখ, প্রকাশ। তোমার ওই চাকরটিকে এখুনি বিদায় করতে হবে।' আমি হাঁ করে তাঁর দিকে তাকাতে তিনি বলতে লাগলেন—রোজ রাতে আমার গাছের দু-চারটে পেয়ারা পেড়ে খায়। ও চোর চাকর রাখা চলবে না তোমার।' আমি মাথা চুলকিয়ে বল্লুম—কিন্তু মহর্ষি—চাকর পাই কোথা সেইত সমস্যা। বলতেই একেবারে তিনি অগ্নিশর্মা।" তখন চাতাল শুদ্ধ লোকের অট্টহাস্য।

আর একদিন প্রকাশদারই ছেলে প্রভাত এসে বললে আর এক কাহিনী। এই গোল চাতালে ছেলে বুড়ো সকলেরই আড্ডা জমতো। আর প্রভাত, একটু অকাল-পকই ছিল। বাক্যনবাবীটা তার পৈতৃক সম্পত্তি। তার কাহিনীও ঐ Dr. V.Roy কে নিয়েই এবং সেও খেয়েছে ধমক। বলতে লাগলে, "উপকার করতে গিয়ে খেলুম ধমক। ভোরবেলাই দেখছি Dr. Roy মর্ণিং ওয়াক্ করে ফিরছেন। আমি ভাবছি কত ভোরে উঠেই না জানি তিনি যান মর্ণিং ওয়াক্ করতে। শিশির ভেজা শুকনো পাতায় ঢাকা ছিল রাস্তাটা, হঠাৎ দেখি গেলেন পা পিছলে পড়ে। আমি অমনি দৌড়ে গিয়ে তাঁকে তুলে ধরতেই তিনি ধমক দিয়ে বললেন, ছেড়ে দাও, আগে ধরতে পার নি?' আমি বল্লুম, আগেত জানতুম না যে আপনি পড়ে যাবেন।' বলতেই লাঠিটা মাটিতে ঠুকে বললেন—"আবার জেঠামি হচ্ছে"। আমি তখন পালিয়ে বাঁচি।" Dr. V. Roya প্রকাণ্ড বাড়ীর কম্পউণ্ডে আউট্ হাউসটা ভাড়া নিয়ে থাকতেন প্রকাশদা সপরিবারে।

সবরকম মজলিসের কেন্দ্র ছিল ওই গোলকুঠি। কিন্তু ঐ মজলিসের আসরে সাহিত্যের মধুর স্পর্শ দিয়ে জমিয়ে তুলতেন বামনদাস মজুমদার মহাশয়। তিনি ছিলেন সুরসিক সদাহাস্য সাহিত্যানুরাগী। এমন সদাশিব লোক বড় একটা দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত সুপক্ক বোম্বাই আম সদৃশ শ্রীকণ্ঠ বাবুর দ্বিতীয় সংস্করণ যেন ছিলেন বামনদাস মজুমদার। রবীন্দ্রনাথের কাছে এঁরও যাতায়াত ছিল এবং এঁরও গুণমুগ্ধ ছিলেন।

মজার মজার গল্প বলতে পারতেন তিনি। সব গল্প সত্য ঘটনা মূলক সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে। আর গল্প বলার ভঙ্গী এমন রসপুর্ণ হত যে সকলেই প্রচুর আনন্দ উপভোগ করতো। পাঠ করতেও পারতেন অপুর্ব। গোলকুঠির চত্বরে বসে মাঝে মাঝে পাঠ করতেন। একদিন সন্ধ্যায় সেখানে বসে রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ'বই খানি আগাগোড়া পাঠ করে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। তাঁর পাঠের মধ্যে একটা সম্মোহনী শক্তি ছিল। সকলে তন্ময় হয়ে শুনতো এবং নিজেও যেন নিজেরই পাঠের গভীরে ডুবে যেতেন। হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ এবং অর্থানুযায়ী অ্যাকসেণ্ট তাঁর পড়ায় থাকতো নিখুঁত। বামনদাসের সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব ছিল মধুর।

প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের পর লক্ষ্মীপুর্ণিমার সন্ধ্যায় যোগীন্দ্রনাথ তাঁর গোলকুঠিতে পুর্ণিমা সম্মেলনের অনুষ্ঠান করতেন। তার একটা বর্ণনা শশীবাবুর কনিষ্ঠা কন্যা ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু 'অমৃত'সাপ্তাহিক পত্রে যা লিখেছেন তা উদ্ধৃত করে দিলাম— ২রা আষাঢ় ১৩৭৩)

"গোলকুঠিতে পুর্ণিমা সম্মেলন হলো। গোলকুঠিই "হাসিখুসি" লেখক যোগীন্দ্রনাথ সরকারের বাড়ী। এঁর ভাগ্নে প্রশান্ত মহলানবিশ তখন নবীন যুবক। তিনি বললেন 'ছোট মামা (যোগীন্দ্রনাথ), শশীমামা (আমার বাবা) সব বড় বুড়ো হয়ে পড়েছেন। এঁদের অকাল বার্দ্ধক্য ঘোচাতে হবে,। এই বলে তিনি একটি 'শো' দিলেন। উপরোক্ত প্রৌঢ়েরা সবাই অংশ গ্রহণ করলেন। পায়ে ঘুঙুর বেঁধে কেউ সতরঞ্চি গায়ে, কেউ কম্বল পরে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসে ধুপধাপ

নৃত্যের সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন—'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল' ইত্যাদি। কারো হাতে করতাল, কারো কাঁধে মাদল। গানের দলের নেতা শান্তি-নিকেতনের প্রাক্তন শিক্ষক জীবনময় রায়। নাচের দলের নেতা ঘুঙুর পায়ে যুবক শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র মহলানবিশ। এই পুর্ণিমা সম্মেলনের বিজ্ঞপ্তি বেরুত প্রথমে যোগীন্দ্র নাথ সরকারের নামে পরে আমার বাবা শশীভূষণ বসুর নামে। একবার কুলদা রঞ্জন রায় (আবোল তাবালের সুকুমার রায়ের খুল্লতাত) নাচের সঙ্গে গান গাহিলেন—

'আজ পুর্ণিমা সম্মেলন,
যোগীন বাবুর নিমন্ত্রণ
খুড়া শশীবাবুর নিমন্ত্রণ—,

হাসির তুফান উঠলো। শশীবাবু তাঁর বিরাট চাপ দাড়ির পিছনে হাসি চাপবার বৃথা চেষ্টা করলেন।

রবীন্দ্রনাথের সমঝদার লেখক শ্রীঅজিত কুমার চক্রবর্তী একবার কবিগুরুর 'প্রায়শ্চিত্ত' পরিবেশন করলেন। সমস্ত বারগণ্ডা রিহার্সেল দেখতেই মেতে উঠলো।"

আর আমার মনে আছে একবার শ্রী প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে বিসর্জন নাটক অভিনীত হয়েছিল এবং প্রশান্ত নিজেই সেজেছিলেন 'রঘুপতি'। সেবার আগেই বোঝা গিয়েছিল যে দর্শক হবে প্রচুর তাই সত্যানন্দ বাবুর বাড়ীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সে অভিনয় করা হয়েছিল ; খুব সুন্দর হয়েছিল।

যোগীন্দ্রনাথকে প্রশান্তরা 'ছোটমামা'বলে ডাকতেন। কিন্তু যোগীন্দ্র নাথের পরে একটি ভাই ছিলেন যাঁর নাম ছিল ললিত এবং তাঁর সঙ্গে আমার দাদা সুধাংশু বিকাশ রায়ের বন্ধুত্ব ছিল। তিনি যুবক বয়সেই মারা যান। যোগীনদা সেই জন্যও দাদাকে খুব ভালবাসতেন। তাঁরা দুই জনে মিলে প্রায়ই নতুন নতুন জমি দেখে বেড়াতেন। উশ্রী নদীর অপর পারে বিরাট জমি চাষ আবাদের জন্যে তাঁরা দু'জনেই কিনে নিয়েছিলেন।

যোগীন্দ্র নাথ কলকাতায় থাকতে নিজেও যেমন ছোটদের জন্য বই লিখতেন তেমনি আবার অন্যদেরও লিখতে উৎসাহ দিতেন এবং তাঁদের দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে বই ছাপতেন। এ অভ্যাস গিরিডিতে গিয়েও তাঁর ছিল। শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস তখন গিরিডি স্কুলের ছাত্র। ছাত্ররা মিলে "কল্পনা কুসুম"নামে একটা হস্তলিপি মাসিক পত্র চালাতো। সে খানি যোগীন্দ্রনাথ আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করে লক্ষ্য করলেন যে সুধাবিন্দুর লিখবার হাত আছে। সেইজন্যে পরবর্ত্তীকালে তাঁকে দিয়ে "টম কাকার কুটির" ও আর একখানি বই লিখিয়ে নিয়ে ছেপেছিলেন।

স্বদেশী যুগে "বন্দে মাতরম্" নামে একখানি জাতীয় সংগীত সংগ্রহ যোগীন্দ্রনাথ মুদ্রিত করেছিলেন। স্বদেশী ভাবের স্পর্শ স্বভাবতই লেগেছিল নিজের পরিবারেও। আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে একবার ৩০শে আশ্বিন—রাখীবন্ধনের দিনে ভোরবেলায় শচী, কচি, ঝুনুরা সবাই গোলকুটি থেকে দল বেঁধে গোছা গোছা হলদে রাখী হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল বাড়ী বাড়ী গিয়ে সকলের হাতে রাখী বাঁধবে। রাস্তায় নেমেই গান ধরলো—সে কচি কচি কণ্ঠের গান সারা বারগণ্ডাকে মাতিয়ে তুললো—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।"

———

যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের সচিত্র শিশুপাঠ্য পুস্তকাবলী

বর্ণানুক্রমিক নাম	১ম সংস্করণ	পৃঃ সংখ্যা
আগমনী (সংকলন)	1937	124
আষাঢ়ে স্বপ্ন	...	32
খুকুমণির ছড়া	1899	256
খেলার গান	...	44
খেলার সাথী	...	32
গল্প-সঞ্চয়	1936	216
ছড়া ও ছবি	...	24
ছড়া ও পড়া	...	48
ছবি ও গল্প	1892	128
ছবির বই	...	32
ছোটদের উপকথা (সংকলন)	1937	88
ছোটদের চিড়িয়াখানা	...	96
ছোটদের মহাভারত	1919	240
ছোটদের রামায়ণ	1918	88
জানোয়ারের কাণ্ড	...	96
নূতন ছবি	...	28

বর্ণানুক্রমিক নাম	১ম সংস্করণ	পৃঃ সংখ্যা
পশুপক্ষী	...	300
বনে-জঙ্গলে	1929	240
বন্দে মাতরম্ (জাতীয় সঙ্গীত সংগ্রহ)	5th Sept. 1905	108
মজার গল্প	...	32
রাঙাছবি	1894	40
শিশু চয়নিকা (নিজের কবিতা সংগ্রহ)	1964	64
হাসিখুসি (১ম ভাগ)	1893	32
ঐ ২য় „	...	32
হাসিখুসি (Hindi)	...	32
হাসিখুসি (Assamese)	...	32
হাসি ও খেলা	1891	64
হাসির গল্প (সংকলন)	...	104
হাসিরাশি	...	68
হিজিবিজি	1916	40

পৌরাণিক গ্রন্থাবলী

বর্ণানুক্রমিক নাম	পৃঃ সংখ্যা
অষ্টমুনি	20
অভিমন্যু	24
উশীনর	...
একলব্য	20
কুরুক্ষেত্র	...
গান্ধারী	24
দ্রৌপদী	40
ধ্রুব	24
নল-দময়ন্তী	28
প্রহ্লাদ	24
ভীষ্ম	...
রত্নাকর	20
লঙ্কাকাণ্ড	76
লব-কুশ	20
শকুন্তলা	24
শ্রীবৎস	32
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ	588
সাবিত্রী-সত্যবান	...
সীতা	56
সুভদ্রা	24
হরিশ্চন্দ্র	24

স্কুলপাঠ্য পুস্তকাবলী

	পৃঃ সংখ্যা
জ্ঞান-মুকুল : যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত ও যোগীন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত	112
চারুপাঠ	...
ছেলেদের কবিতা	64
সাহিত্য (গদ্য ও পদ্য)	208
সাথী : সুরেন্দ্রমোহন দত্ত ও যোগীন্দ্রনাথ সরকার	52
নূতন পাঠ, ১ম ভাগ	56
ঐ ২য় ভাগ	80
পঞ্চরত্ন	120
আদর্শ পাঠ, ১ম ভাগ	100
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	128
সুশিক্ষা	208
শিক্ষা-প্রবেশ, ১ম ভাগ	...
ঐ ২য় ভাগ	...
জ্ঞান-প্রবেশ, ১ম ভাগ	...
ঐ ২য় ভাগ	...
শিক্ষা-সঞ্চয়	128
সাহিত্য সঞ্চয়	160
শিক্ষা মুকুল	80
শিশুপাঠ	80

যোগীন্দ্রনাথ সহধর্মিণী
শ্রীযুক্তা গিরিবালা সরকার

কিরণ কুমার রায়

আঠারো বসন্তের স্বপ্ন নিয়ে গিরিবালা রায় ছাব্বিশ বছরের যুবক যোগীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী হয়ে ছিলেন; শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন বিবাহ বাসরের পুরোহিত। বিংশ শতাব্দী হাজির হতে তখনও সাত বছর বাকি। তখনও কলকাতায় ঘোড়াটানা ট্রাম; কটকে শিশু সুভাষচন্দ্রের বয়স মাত্র দেড় মাস। কলকাতার দক্ষিণ-অঞ্চল লেক গার্ডেনস তখনও কাঁটাবনে পরিপূর্ণ, বিষাক্ত সাপ আর শেয়ালের বাসভূমি। রায় থেকে সরকার, ইস্কুলের ছাত্রী থেকে বিদ্যালয়-শিক্ষকের পত্নী। গিরিবালা সরকারের জীবন একটি বিচিত্র মানুষের জীবন পটভূমিকায় চিরকালের জন্য জড়িয়ে গেল।

সেই স্মরণীয় দিন থেকে তেয়াত্তর বছর পর সম্প্রতি উঠতি অঞ্চল লেকগার্ডেন-এর একটি সুন্দর বাড়িতে গিরিবালা দেবীর পাশে একই সোফায় বসে কথা বলছিলাম। বিরানব্বই বছর বয়স হয়েছে তাঁর; সুগৌর বর্ণ বার্ধক্যের ভারে কিছুটা মলিন; মুখের চামড়ায় কিছু বলিরেখা। তথাপি মন এখনও সচেতন, দেহও বয়সের ছাপ অপেক্ষা সতেজ। দুপুরের বেলা গড়িয়ে যাচ্ছিল বলে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এত বেলা হল, কখন্ খাওয়াদাওয়া হবে, বাড়িতে বসে থাকবে না?

স্বামী যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন সদা প্রসন্ন হাসিখুশি মানুষ। কারোর উপরই রাগ করতে পারতেন না, ছেলেমেয়েদের দুষ্টুমি বা পড়াশোনা নিয়েও ভ্রূকুঞ্চিত হত না। গিরিডির বাড়িতে দুপুরে চান করতে যাওয়ার আগে তেল মাখাবার সময় দু তিন ঘণ্টা গল্পই করতেন কুলি সাঁওতাল বা জেলে জোগানদারের সঙ্গে।* সে গল্পের আদি-অন্ত নেই; নিছক গল্প আর গল্প। গিরিবালা দেবী তাড়া দিতেন স্বামীকে, স্বামী হাসতেন, সে হাসির মধ্যে এমন আত্মভোলা নির্মল আনন্দ থাকত, আর তাড়া দিতে মন সরত না গিরিবালা দেবীর, তিনি অপেক্ষা করে থাকতেন।

লাহোরে তার জন্ম, বিয়ের আগে দু' বছর কেটেছে সিমলায়। বিয়ের পর কলকাতার হ্যারিসন রোডে বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের ছোট বউ হয়ে এলেন। ভাসুর ডঃ নীলরতন সরকার (পরে স্যর) নামী ডাক্তার, অন্য ভাসুররাও কৃতী। স্বামী সিটি কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক। পেশায় শিক্ষক হলেও আসলে সাহিত্যিক। বিয়ের আগেই তাঁর সচিত্র 'হাসি ও খেলা' বেরিয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'মুকুল' পত্রিকার লেখক ও কর্মাধ্যক্ষও তিনি। স্কুলের মাইনে পান পনের টাকা, তাও মুকুলে কাজে ব্যস্ত থাকায় স্কুলে মাঝে মধ্যে গরহাজির থাকায় মাসে দু তিন টাকা কাটা যায়। বিরাট একান্নবর্তী পরিবারে ছোট ভাই-এর উপার্জনটা কিছু মূল্যবান নয়, গিরিবালা দেবী টাকার দামটা কিছু বুঝতেই পারেননি। স্কুলের কাজে ইস্তফা দিয়ে স্বামী পুরোপুরি সাহিত্যকে জীবিকা করলেন, সিটি বুক সোসাইটি নামে একটি বই-এর দোকান খুললেন; ছেলেমেয়ে হল, একান্নবর্তী পরিবার ক্রমশ বড় হয়ে পড়ায় আপনা থেকেই বিভক্ত হয়ে এল। ছেলেরা কলেজে পড়ল প্রেসিডেন্সি কলেজে, মেডিকেল কলেজে, মেয়েরা ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ে। বড় ছেলে ডাক্তারী পাশ করে বিলেতে পড়ল আরও পাঁচ বছর, মেয়েদের ভাল ঘরে বিয়ে হল, সাড়ে চারশ বিঘে চাষের জমি নিয়ে বিরাট বাড়ি উঠল গিরিডিতে, ছোট বড় আর খান বয়েক—সংসারের বৃহৎ কর্মযজ্ঞ

সমারোহের সঙ্গেই কেটে গেল, অর্থ নিয়ে অনর্থক ভাববার অবকাশ ঘটেনি গিরিবালা দেবীর।

(যোগীন্দ্রনাথ সরকার বাংলা শিশু-সাহিত্যে স্বর্ণযুগের আদিপুরুষ। তাঁর 'হাসিখুসি' দিয়ে বিস্তারন্ত হয়নি গত ষাট বছরে এমন মানুষ দুর্লভ। অ-অজগর আসছে তেড়ে, আ-আমটি আমি খাব পেড়ে, ই—ইঁদুরছানা ভয়ে মরে, ঈ—ঈগল পাখী পাছে ধরে ইত্যাদি দিয়ে যোগীন্দ্রনাথ বাঙালী শিশুকে অক্ষরজ্ঞান শিখিয়েছেন। 'হারাধনের দশটি ছেলের কাহিনী সমস্ত বাঙালীর মুখস্থ। প্রায় সব মা-ই শিশু কোলে নিয়ে গুনগুনিয়ে গান করেন: 'ধন ধন ধন, বাড়ীতে ফুলের বন। এ ধন যার ঘরে নাই, তার কিসের জীবন।') আমরা প্রায় ভুলেই গেছি এগুলি অদৃশ্যভাবে আবহমানকাল ধরে চলে আসছে না: একজন শিশু-প্রেমিক সদাখুশি মানুষ লিখেছিলেন; কোন প্রকাশক ছাপতে সাহস করেনি বলে পাতায় পাতায় অজস্র ছবি দিয়ে নিজেই ছেপেছিলেন। তাঁর রচনা জনপ্রিয়তার চূড়া ছাড়িয়ে গিয়ে বাঙালীর সংস্কারের মধ্যে একীভূত হয়ে গেছে।

১৯২৩ সালে যোগীন্দ্রনাথের ডানপার্শ্ব পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। আরো চোদ্দ বছর বেঁচেছিলেন তিনি। বাঁ হাতে লিখতেন, প্রুফ দেখতেন, সব কাজকর্ম করতেন। সে-সময়ে 'বনজঙ্গলে', 'সপ্তকাণ্ড রামায়ন' 'গল্প সঞ্চয়' বেরিয়েছে। অনেক সময় মুখে মুখে বলে গেছেন যোগীন্দ্রনাথ, স্ত্রী গিরিবালা লিখে নিয়েছেন কাগজে।

চার ছেলে চার মেয়ের মধ্যে গিরিবালা দেবীর এখন তিন ছেলে, এক মেয়ে জীবিত। বড় ছেলে ডাঃ শচীন্দ্রনাথের কিছুদিন আগে মৃত্যু হয়েছে। মেজ ছেলে সুধীন্দ্রনাথ ও দৌহিত্র সৌম্যেন্দ্রমোহন বসুর কাছে আছেন তিনি। দৌহিত্র সৌম্যেন্দ্রকে তিনি চার মাস বয়স থেকেই লালন করছেন। এখন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, নাতবৌ এসেছেন, নাতিরও সন্তান হয়েছে। বললেন, বাড়িটা ভাল, কিন্তু রাস্তাটা বিশ্রী। আসতে কষ্ট হয়নি তো বাবা?

আড়াই মাস পরে যোগীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হবে বাংলা দেশে। আমাদের সামনে আরেকটি সোফায় যোগীন্দ্রনাথের একটি বড় বাঁধানো ছবি। ছবির দিকে তাকিয়েছিলেন গিরিবালা দেবী; তাঁর কাছে ছবি শুধু ছবি হয়, আযৌবন জীবনদিশারী।

JOGINDRANATH SARKAR

CENTENARY SOUVENIR

ENGLISH SECTION
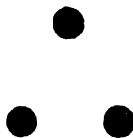
Mr. J. N. Sarkar's

Books for the Bairns of Bengal

Reviewed in

THE INDIAN MAGAZINE & REVIEW (*Of London*)

by MRS. M. S. KNIGHT

[Mrs. M. S. Knight, who translated "Bis Briksha" of Bankim Chandra Chatterjee in English. reviewed a few books of Jogindranath Sarkar in the 'Indian Magazine & Review of London. Relevant portions of her review are quoted below.]

"**Khukumanir Chhara**" is a delightful treasury of Lullabies and other Nursery Songs, collected from many village homes in Bengal. It is not Mr. Sarkar's first work. Several others from his pen lie before us, all meant for the little one's delectation ; but this one has another and more special object—that of rescuing from oblivion and distortion, a nursery lore, that, with the changing fashions of the day, may in great part fall out of use.

Mr. Trivedi, the writer of the Introduction, believes that Mr. Sarkar's collection, profusely illustrated, and intended, primarily, for the amusement of children, will bear fruit in far more widely extended fields. As geologists evoke a whole chapter of the world's past history from the study of a tooth or a bone, so, Mr. Trivedi thinks some future Max Muller may find in this ancient Nursery Lore, some name, some words that may throw light upon the past history of the Bengali race. At any rate, he feels that posterity will not forgive the present generation if it permits these landmarks of the past to be destroyed or distorted. Several of the fragments in this collection refer to almost forgotten histories, and cannot be fully explained ; the more essential is it that they should be collected and preserved.

Mr. Trivedi considers this collection a valuable contribution to the study of mental processes and social conditions. He asserts that while the character of adult man varies with different countries, different civilizations and different conditions, the character and intelligence of the newly-born infant is the same in all races and in all climes, and maintains that this is proved by this very nursery lore, as a comparison of *Khukumani's Beads* with an English Nursery Song Book will show the two to be marvellously alike. As additional evidence, Mr. Trivedi cites the fact that children of all races play the same games. This latter assertion may be admitted since, as our Wordsworth says of the child :—

See, at his feet, some little plan or chart,
Some fragment from his dream of human life,
Shaped by himself with newly learned art ;
  A wedding or a festival,
  A mourning or a funeral :
    And this hath now his heart,

And unto this he frames his song :
Then will he fit his tongue
To dialogues of business, love or strife ;
But it will not be long
Ere this be thrown aside,
And with new joy and pride
The little actor cons another part :
Filling from time to time his humorous stage
With all the persons down to palsied age
That life brings with her in her equipage,
As if his whole vocation
Were endless imitation.

This is as true of the Indian as of the English child. But we are less convinced that the similarity in Nursery Lore proves that the new born baby's brain is the same the world over, since the lore is not produced by the babies anywhere—and heredity probably counts for something even at that stage. It proves rather the universality of the conditions of human life, upon which the mother is drawing to frame her song for the little one—the result is the same everywhere, except for local peculiarities such as that of child marriage. This institution supplies quite a large proportion of the songs in *Khukumani's Beads*. Not only are the greater events related, as in "Khoka's Wedding" (page 55), in which is told the home bringing of the groom and bride in palanquins, attended by a body of musicians, and by all the lads and lasses of the village ; the arrival at the principal gate, the sprinkling of red powder on the spectators, the hurried opening of the house doors, the welcome given by Khoka's mother, who seating herself, takes bride and groom upon her lap, and makes them known to each other. Not only this, but every incident in the wedded life of these small people is wrought into song. Khoka pays a visit to his father-in law's house :—

Khoka will visit his father-in-law,
What shall he take along ?
A great big cake adorned with flowers,
Fine ghee in a vessel strong.
A *sheuli*-wreath around his neck,
And gay in scarlet shoon ;
Khoka will dance them a merry dance
If they will but play the tune.

Then there is the familiar Ogre or Bogie lying in wait for children who will cry or who will not be washed. He takes many forms, now a sort of Indian Jabberwock, with tusks like big white radishes, eyes like balls of fire, and horrid jaws—yet, monster as he is, he does not look ill-natured. His name, "Ekanoray" is more euphonious than that of Lewis Carroll's creation. He dwells in a palm tree ; wanders from house to house, and when he hears a child crying, puts it into his bag, takes it to the top of the tree, and throws it down to the ground. His portrait appears in silver on the dark blue cover. Another Ogre, more like a bear in appearance, contents himself with dancing as he dangles the crying child by the forelock. A third, "Kandunay" presents a face aged by ceaseless weeping, tears dropping as he squats—a sight that must convince the most peevish child of the folly of taking life sadly. Kandunay's way with screaming infants is to break their arms and legs, and carry them across the river.

The animal world plays a large part in Khukumani's domain. Birds are the prime favourites, but frogs and ants fill many offices. One Bead represents a husbandman ploughing

his ground by the aid of a team of ants, a tiger having seized his ox ; in another, the small son of the house is driving out in state, with a frog for coachman, the umbrella being held over his head by a big black ant. In another, Khoka has gone fishing, and stands aghast at finding that just as he has caught his fish, a kite, pouncing upon it, carries it into the air, and a frog bears away his fishing rod. We must not forget pussie, who in the house is no less a favourite than the birds in the air. When Khukumani visits her father-in-law she is attended by pussie, dressed up as a soldier. One might linger all day over these delightful Beads—but must hasten on.

* * * * *

We take leave, for the present, of Mr. Sarkar's book, a deeply interesting work—whether regarded as a series of pictures of a Hindu home of the old type, or as providing matter for that deeper inquiry to which Mr. Trivedi's Ramendra Sundar Trivedi suggestive pages invite us."

Mrs. Giribala Sarkar,
Wife of Late Jogindranath Sarkar

Lore For The Children

MRS. M. S. KNIGHT

In the January number of the Indian Magazine & Review for 1901, there appeared a notice of "Khukumani's Beads" by Mr. J. N. Sarkar. Six picture and prize books from the same writer's pen lie before us, beginning with **Hashi and Khela** (Laughter and play), November, 1894.

In the preface to this work, Mr. Sarkar says :—"Though illustrated reading book suitable for Indian boys and girls in schools are not entirely wanting, there is an entire absence of illustrated books for home reading and for prizes, and to supply this want in some measure this book *Hashi and Khela* (Laughter and play), was written; "and a second book was promised, should the first one prove acceptable to the public.

If the small public, thus caterd for, had not been pleased with this first book, it would have been a marvel. Even to the very few among them who had seen English book of the kind, it must have afforded immense delight—the greater for its being in their own language, and composed of subjects so well known in their daily life : a mixture of lessons in natural history, humorous stories, songs, riddles, games, familiar and otherwise. To those who saw such a book for the first time, it must have seemed truly a gift from the gods. On the blue cover is depicted in silver a plank balanced upon a round log, see-saw fashion, the half dozen players being most ingeniously twisted into the letters forming the title of the book.

In a very short time a second edition was called for, and the author was encouraged to produce his promised second work, intended for older children, **Chhobi and Golpo** (Pictures and Tales). This work, as it is the most advanced of the books before us, will give the best idea of the literature now being provided for young minds in Bengal. It would be easy and truthful to characterise all these little book as treasures of delight for young readers ; but it will be interesting to examine in detail this principal work.

The contributors have taken English Nursery Books as their model, reproducing the various features to be found in English books : in no case by translation ; in all cases by original and local adaptations. *Chhabi and Golpo* contains one story of some length, in four chapters—portraying the downward course of a youth to the very gates of destruction, when he is arrested and rescued by sheer gratitude for the generosity shown him by one whom he has all his life done his best to injure. The aim of the story is high ; though perhaps it was hardly needful to make the youth so excessively bad. Then we have two supremely funny folk-tales, the heroes of which—*Kaynaram* and *Ramdhon* will, we are sure, be personified by many a small lad in Bengal.

A brief, but effective description is given of the Games at Rome ; the causes which led

to so depraved a taste in the Roman citizens of both sexes, and the incident which is said to have brought about the discontinuance of the games.

There is a narrative of a journey to Burdwan by a traveller who, wishing to see the country, went on foot instead of by conveyance. At one spot on his way, he was warned not to pass through a small wood that lay before him, but rather to travel by rail. He asked if there were robbers in it; was told that there were hundreds of thousands of them, and was bid to listen to their voices filling the air. Listening, he understood that the robbers were mosquitoes, and, laughing to scorn the warning of the countryman who told him he would not escape with life, he persisted in going through the wood. The countryman's prediction had overshot the mark—the traveller lived ; but the results of encounter with the mosquito myriads rendered him prostrate for three days, and kept him on the sick list for two months.

There are papers on insect life, the ant and the spider ; on different snakes ; on the moon and on the balloon ; two graceful poems from the pen of Mr. Robindranath Thakur.

In **Ranga-Chhobi** (Coloured Pictures), **Hashi Rashi** (Abundant Laughter), **Hashi Khushi** (Laughter and Delight), and **Khelar Sathi** (the Playmate), Mr. Sarkar has provided for the needs of the very little ones. We find many old friends in an Indian dress, and a good deal for which we have no equivalent—purely local fun. In the former class, "Grannie Stale-Rice" (Pantha Buri) is an amusing variant upon "The Old Woman whose Pig would not get over the Stile," ending in a manner more entertaining than that monotonous repetition—though the very monotony of the English story has a charm of its own for infants. In this Indian version a thief daily manages to steal the stale-rice the poor old lady sets aside for early breakfast. She sets out to complain to the Raja, and on her way to the palace is accosted by a wood apple, a *shingi*-fish, a needle, a penknife and an alligator. She is increasingly snappish in her replies to their questions, but they all tell her to call for them on her return journey. She fails to see the Raja, and reaches home with her suite, who give her instructions where to place them, which having obeyed, she goes to sleep. The thief, coming as usual, went to the rice-pot, and was pierced in the hand by a thorn of the fish. Going to the fire the wood-apple burst, spurting its contents into his eyes. Blinded, he felt his way to the door, but slipped on the wet floor and fell. Grasping the wall to raise himself, the needle ran into his hand. Coming to wipe the mud from his feet and hands on the grass in the court, the penknife cut his toes ; and when, rendered giddy by all this pain, he went to the tank to wash his feet, the alligator seized him and screamed out, "Grannie, I have caught your thief." This woke up the old woman, who called in the neighbours and had him borne off to the Raja, who inflicted severe punishment—as if the poor wretch had not suffered enough already to put an end to his raids upon the rice.

In **Asaray Shopno** *athaba* **Janwarer Mela** (A Dream in July, or the Beast's Fair),

by Mr. Sarkar, the story-teller, in his dream, visits the Calcutta Zoo, where he finds the animal population *en fete*. They were all at liberty and at peace with one another, having, for the time, lost their relish for uncooked flesh. Yet the visitor thought it well to keep to the main road, not feeling secure as to their disposition towards mankind. His first acquaintance was a monkey named *Chaturbhuj*, who is described as being a very good fellow. They become friendly, and the owl acts as the visitors' guide in the new realm. The *fete* is being held in honour of the marriage of the King of the Beasts' eldest son. Space does not permit us to accompany the visitor and his guide. Most of the animals wear a caricature of men's clothing, and prove themselves adepts at cricket, football, tug-of-war, etc. The narrative is very funny, and the illustrations highly comical.

Heartily we congratulate the children of Bengal on the interest they have aroused in their gifted seniors, and on this admirable beginning of a literature for their special use.

Jogindranath Sarkar

Ramananda Chatterjee

Srijut Jogindranath Sarkar, author, compiler and publisher of some forty illustrated Bengali books for children, died last month at the age of 70. He was the youngest surviving brother of Dr. Sir Nilratan Sircar. He entered life as a teacher in the City School, Calcutta. Subsequently he began to write books for little children and established a publishing and book-selling firm named City Book Society. About 23 years ago he, along with the late Mrs. Labanyaprabha Sarkar and Ramananda Chatterjee, persuaded the late Pandit Sivanath Sastri to become the editor of a new Bengali monthly for children, named "Mukul." Srijut Sarkar contributed largely to its success.

During the Bengal anti-partition agitation he published a collection of Bengali patriotic songs, under the title "Bande Mataram." It was a very good compilation and had a phenomenal sale. It is no longer in the market, as owing to a strong, perhaps not unfounded, rumour that it would be proscribed, it was voluntarily withdrawn from the market.

Jogindranath Sarkar still remains unrivalled in the field of juvenile literature.

(*Modern Review—July, 1937*)

The Late Jogindranath Sarkar

Amal Home

Mr. Jogindra Nath Sarkar, who died last week-end in Calcutta at the age of seventy, could be described without any fear of exaggeration as a pioneer in the field of juvenile literature in Bengali. He had, of course, his predecessors in Pandit Sivanath Sastri and Pramada Charan Sen and contemporaries in Upendra Kisore Ray Chaudhuri and Dwijendra Nath Bose; but he had one advantage over all of them—in the richness of variety and a catholicity in the choice of his subjects and mode of treatment, *suiting almost all ages of children*. A continuous stream of books issued from his well-known publishing firm—City Book Society—which, at one time, had the monopoly of juvenile publications in Calcutta: and though ill-health incapacitated him for the last ten years, he never lost his interest in children who were his daily companions and whom he knew as few do how to entertain. A generous and warm-hearted friend, his urbanity and suavity were remarkable, and his memory will abide with those who knew him. We offer our sincerest condolences to his eldest brother, our esteemed fellow-citizen, Sir Nilratan Sarkar and other members of the bereaved family.

(*Calcutta Municipal Gazette—July, 1937*)

Jogindranath Sarkar

Pioneer in Bengalee Juvenile Literature

Karuna K. Nandi

To be able to assign the legitimate position that the late Jogindranath Sarkar is entitled to in the history of the development of modern Bengalee juvenile literature, it is necessary to hark back several decades when evidence of the earliest glimmerings of a developing awareness of the need to evolve appropriate and suitable literature for the very young both for filling curricular needs in schools as well as as to provide extra-curricular studies, is available. It must, in this context, be recognized that the first conscious effort to create appropriate reading materials for the very young came in the wake of the introduction of English education in this country during the early decades of the last century. During earlier periods all kinds of phantasies and similar other literary compositions, very little of them in print and handed down from generation to generation in the shape of memorized folk tales, verses and the like, can hardly claim to form part of any systematic juvenile literature with any educational content. Nor had they any intellectual or even emotional relation with the kind of juvenile literature which began to develop during the later and more modern periods.

Historically, of course, the appropriate environmental conditions for such development were then wholly absent. Society, generally, was steeped in mideavalism and was wholly priest-ridden. The conditions for the necessary freedom of thinking and expression which alone might have made the development of a body of wholesome juvenile literature possible, were also entirely absent. The Bengalee language also—especially Bengalee prose—was in its early infancy and its powers and area of expression were likewise wholly and severely circumscribed. The facilities of the printing press were also not then available and most of what we had which passed for a kind of juvenile literature had mainly to be handed down by word of mouth alone. There were professional provenders who used to entertain audiences from time to time which were the only means of providing whatever imaginative satisfaction to the very young that were available in those times.

It was really during the second decade of the last century, almost immediately following the formal inauguration of English education in this country (the Hindu College was established in 1817 A. D.) that we find evidence of the earliest modern attempt to provide printed literature for the delectation and education of the juveniles. This was intended to be a juvenile textbook called *Neetikatha* stated to have been jointly authored by Radhakanta Deb, Ramkamal Sen and Tarini

Charan Mitra. The book was published in 1818 A. D., by the School Book Society and was accepted as a text-book for the infant classes. Its language was necessarily very stiff, involved and without any entertaining or attractive qualities. Its subject matters were mostly culled from the popular and usually superstition-laden folk talkes of Bengal and it hardly contained any of the creative and imaginative qualities which are regarded, in accordance with modern standards, as essential ingredients of wholesome juvenile literature.

The same year saw the commencement of the publication, by the Baptist Mission in Serampore, of a monthly periodical under the editorship of John Clarke Marshman called *Dig-Darshan.* The title page of the publication used to contain the legend—"Collected parables for the benefit of the young." Those were the times when Bengalee prose was yet in its infancy and it was but natural that the language of the publication was comparatively poor, sketchy and without much entertaining quality. It could not however, be classed among periodicals for the juveniles—its appeal was to a higher age-group ; it lacked the qualities of naturalness and ease which were an essential part of juvenile literature, nor were there any facilities for illustrations,--there were neither artists available for the purpose, nor were there any facilities for reproduction of illustrations. The condition prevailed for a considerable time and it was only with progressive enrichment and powers of expression of Bengalee prose and improvements in the available facilities for printing and reproduction, the improvement in this field began correspondingly to be evinced.

The really earliest modern effort in this direction might be said to have been the publicaiton of the famous verse 'pakhi saab kare raab' by Pandit Madan Mohan Tarkalankar ; this might claim to have been the earliest original composition in the field of Bengalee juvenile literature and which continued to influence compositions in the field for a considerable period following its first publication. In course of time quite a considerable volume of juvenile text-books—both in prose and verse—began to be progressively published by a variety of educational authorities, religious missions and, sometimes, even by the effort of school students themselves, there have also been a few monthly, fortnightly and, even, weekly periodicals in the field from time to time. For very nearly half a century and even longer, however, most of these were mainly fed by translations or adaptations from other literatures and languages like English, Sanskrit, Persian, Arabic, French, etc; and included a variety of stories, narratives, and even poems. During this long period only one short story might claim to have been an original composition, a story under the legend 'One Must Never Steal (Kadacha Churi Kara Uchit Nahe) by Pundit Iswar Chandra Vidyasagar. Most of the fairly considerable volume of other compositions by the Vidyasagar were either translations from or adaptations of stories and verses from other languages and literatures ; but it is significant that even then under Vidyasagar's effort, Bengalee prose had already begun to acquire a boldness and ease of expression and a beauty of diction which might be claimed

to have been the earlier precursor of the phenomenal progress that the language and its literature achieved during the following half a century. The story was included in the second part of the Vidyasagar's book of alphabets all educated Bengalees, even to this with which day, must be intimately acquainted.

There is no room for controversy that the the progress so far achieved in our evolution of Bengalee juvenile literature wes a great deal to English education and the ideals which informed and sustained British juvenile literatures. The principal impetus for this progress, however, derives mainly from our sense of patriotism and the conscious effort for cultural renaissance. The juvenile literature of this period, although circumscribed within severely defined limits, were nevertheless modern enough to be completely divorced from the earlier folk literature of our country. This was both inevitable and inescapable. Our acquaintance with the progressive intellectual movements of the West through the medium of English education, the fundamental changes that were wrought in man's social outlook by reason of the changes brought about in the social economy by the Industrial Revolution in Europe, the gradual introduction, in this country, of power-driven industries, the railroads, the telegraph and the telephones which minimized distances considerably and made increasingly closer acquaintance with other races and climes not merely easy but even inevitable and the gradual extension of urban centres in the country, all combined to banish both the necessary environment and the outlook which alone were conductive to the growth of the folk literatures which did duty, in the earlier generations, for whatever juvenile literature society needed or could lay its hands upon.

The earlier period of English education, as already mentioned, encouraged and fostered the growth of a type of literature intended for the juveniles which were mainly circumscribed within the needs of the school curricula. Madan Mohan Tarkalankar and Iswar Chandra Vidyasagar, as already mentioned, were the pioneers in this rather comparatively narrow field of endeavour. But alongside of these what were mainly school text-books, also began to be published a number of periodicals devoted to the needs of the juveniles which held out the promise of a wider field of endeavour in compositions designed to meet the needs of our juvenile population. Notable among those pcriodicals were *Balak Bandhu* (The Child's Friend) edited by Acharya Keshub Chander Sen and first published in 1878 A. D., *Sakha* (The Friend) edited by Promada Charan Sen (1883) ; *Sakha O Sathi* editad by Bhuban Mohan Roy (1894), *Mukul* (The Bud) edited by Pundit Shibanath Shastri (1895)—there is evidence that it was mainly at the instance of the late Ramananda Chatterjee that Pundit Shivanath Shastri agreed to accept the editorial responsibilities of the *Mukul* and the bulk of the editorial work used to be done by the former ; and *Balak* (The Child) edited by Jnanadanandini Devi (1885). Those who are acquainted with those earlier days of our intellectual, moral and cultural renaissance would still recall the considerable influence that these periodicals used to exert on the minds of the educated sections of the community both young and old.

It was really left to Jogindranath Sarkar and his pioneering imagination, courage, zeal and, above all, to his creative abilities, that the work of fruition of the latent promise of these periodicals into the growth of a robust, wholesome and fully fledged body of juvenile literature for the very young of the Bengalee community found practical expression. Needless to say that Bengal and the Bengalee language had already passed through the hectic period of the age of Bankim Chandra and were well in the midst of the new age of Rabindranath and both the language and literature of the Bengalees had already acquired a resilence and richness which was quite unprecedented. This promise found its earliest expression, as far as it is possible to ascertain, in the publication in January 1891, of Jogindranath's famous book *Hasi O Khela* (Laughter and Play). In the preface to the first edition the Editor (it was really an anthology although there were some items included in the book which were the editor's own original contribution to the collection) states, "Although there may not be a great deal of lack in the supply of school text books in our country, there is hardly even one book available suitable for extra-curricular reading and for prize awards to infant school students. It is with a view to somewhat alleviating this serious lack that *Hasi O Khela* is being published. If there is adequate public encouragement, a further illustrated publication of this nature called *Chhabi O Galpa* (Pictures and Stories) would soon again be published."

His expectations in this behalf were amply fulfilled. Within a very short while the first edition consisting 2,000 copies were soon all sold out. Jogindranath was then a young man of 25 and was teaching at the City School. Rabindranath remarked about the book in his *Sadhana* (issue dated Falgun, 1301 B. S.) "The book is intended for the young. There was absolute poverty of such publications in Bengalee. Books which are available and intended for the young are all in the nature of text books. They mostly lack freshness and beauty. They were hardly ever beneficial to the young in the measure that they are oppressive upon their young minds.

"At present it has become urgently necessary to bring out books intended for home reading by the young. Otherwise there does not seem to be any other easily available method by which necessary mental pleasure and health and the imaginative and creative facultities of the Bengalee child can be appropriately fed and fostered. By publishing the book *Hasi O Khela* Jogindra Babu deserves grateful appreciation of all Bengalee parents."

Jogindranath is, therefore, the real pioneer in the field of creative Bengalee juvenile literature and his first publication, *Hasi O Khela* can claim to be the earliest known adventure in this, hitherto, uncharted sea of enterprise. In this book Jogindra Babu included contributions from Rajkrishna Ray. Nabakrishna Bhattacharyya, Upendra Kishore Roy Chowdhury (later founder and editor of *Sandesh*), Promada Charan Sen and Michael Madhusudan's biographer Jogindranath Basu and other eminent writers of those days, In those days juvenile compositions, like those intended for consumption by the adult, were couched in stiff formal language. It was Jogindranath Sarkar who, with what boldness and courage it would be difficult to adequately

apprehend in these days, made a complete departure from this stiff formalism and used ordinary spoken language in his book. In the ease of expression, beauty and sweetness of cadence, this new and bold experiment at once captured the imagination of his young clientale and was established permanently in their hearts. As already mentioned, the book was mainly a collection of pieces by other writers, but there were a few of the editor's own original contribution. Notable among them was the now famous story—Sat Bhai Champa. It has been earlier mentioned that during earlier periods what passed for juvenile literature was mainly allegorical in content, but they were seldom put down in permanent print and used. mostly, to travel from mouth to mouth. In Hasi O Khela two similar stories were included; one, Sat Bhai Champa by the editor himself, and the other by Upendra Kishore Roy Chowdhury, "Majantali."

As promised, Chhabi O Galpa made its appearance in the following year (1892). This also was a book of collections, but included a larger number of the edior's own compositions inboth prose and verse. The distinctive feature of Jogindranath's own writings were their freshness, their innate and indomitable sense of humour and their ease of expression. This was also more adequately and colourfully illustrated which was, certainly an important step forward in the progress of Bengalee juvenile literature. Copies of the first editions of neither of these books, unfortunately, are available these days.

A distinctive feature of modern Bengalee juvenile literature are its nonsense rhymes. There is a notion that the first pioneer of this kind of composstions was the late Sukumar Roy Chowdhury. This, however, is wrong. There is no doubt that Sukumar Roy Chowdhury has been unique and quite unrivalled by any one before or since in this particular field of composition. But it must be acknowledged in the interest of historical accuracy that the real and original pioneer in this field also was Jogindranath Sircar. In the issue of Mukul for the month of Falgun. 1303 B. S., we find Jogindranath contributing a delectable non-sense rhyme under the legend *Khala Hare Ki Dhala Hare.* Many among us of the older generation would still recall the immense pleasure and entertainment we had derived from the perusal of this piece. Eventually Jogindranath published a whole book of non-sense rhymes. all his own compositions, in the book *Hasi-Rashi* (A Bouquet of Laughter), first published in 1899, and copies of which are still extensively in demand wherever there is a Bengalee reading juvenile population. This established his claim to pioneering enterprise in this particular field of endeavour also without any room for controversy.

In another very vital field also Jogindranath evinced considerable creative genius and initiative. Folk verses, a great deal of them epigrammatic in content and commonly known as *chaddas*, reflect truly and faithfully the whole life of mideaval and rural Bengal. They also reflect the primary emotions and ideals of the simple Bengalee of the common classes. Rabindranath, Abanindranath and others have found them important enough emotionally, even historically and otherwise, to devote a considerable part of their time and energy in collecing and commenting upon

their significance in some part. Jogindranath with characteristic sensibility and sensitiveness early realised their significance in our communal and ideal life and devoted a considerable part of his energeies in collecting and collating them. His labours in this field were consummated by the publication of *Khuknmanir Chadda* in 1899, In course of a long foreword to the publication, the Late Ramendrasundar Trivedi commented, "there was complete lack of such a book in Bengalee. For several years the compiler of the present volume has been devoting himself to this work, although it called for a great measure of boldness and courage. He had already established himself as the author of several very popular and well presented illustrated books for the children. This shows him as the pioneer in a different field of adventure."

It is impossible to give a complete or even a moderately adequate account of all that the late Jogindranath Sarkar had achieved in the field of Bengalee juvenile literature, within the comparatively small space available in a periodical publication like this. But it would be leaving out of our consideration one of his most significant achievements if especial mention were not made of his unique and, so far, wholly unrivalled publication, *Hasi-Khusi* (Laughter and Pleasure), an illustrated book of alphabets. This was first published in 1897 and still remains the most popular and most useful book for the beginner to learn his Bengalee alphabets. The method used in this book was to present the alphabet to the child through humour laden verses related to animals, fruits, vegetables etc., with which he is intimately acquainted and which naturally yield instantaneous and wholesome results. There have been innumerable publications since *Hasi-Khusi* first made its appearance, but almost all of them without exception have been either imitations and, or variations of Jogindranath's style and manner of presentation. and lack the breadth of creative originality which made this book both so significant and so invariably useful.

Throughout his fairly long active life Jogindranath put out as many as twentyfive or twentysix original pubiications of his own, besides a number of anthologies and the like which he edited with' characteristic ability and imagination. Some of these, we understand, are unfortunately no longer in print, although their usefulness, despite the distance of time since their first publication, could not yet have been outlived ; their appeal was so universal and transcended the ordinary barriers of time and space. On this. the occasion of the centenary of his birth, we pay our respectful homage to his memory and acknowledge the debt thas every Bengalee who claims to be educated owes to his pioneering and bold effort and endeavour. In his particular field of endeavour, we feel, he will deserve to be with the immortals, deathless and effulgent

Children's Delight for over 70 Years

Birth Centenary of Jogindranath Sarkar

On August 4, 1875, Hans Christian Anderson died near Copenhagen. Nine years before the death of this famous Danish fabulist and poet, Jogindranath Sarkar (1866-1937), one of the pioneers in the field of Bengali jevenile literature, was born in Joynagore in the 24 Parganas.

In many ways, the lives of Anderson and Sarkar bear a striking resemblance. Both wrote profusely and cheerfully for the entertainment of children ; both passed through many vicissitudes of life and suffered from physical ailments in their later years.

Jogindranath's publications included nursery and nonsense rhymes, poems, short stories and tales from the Indian epics and folklore and elementry scientific topics, translations from works of foreign authors, humorous sketches, puzzles and compilations from different writers as well as some text-books.

Rabindranath, in a foreword to Jogindraanath's "Galpa-Sanchay" a collection of stories from different authors, congratulated him on his strenuous efforts to fight "the famine of children's stories" in Bengal. The grannies of this age, the poet regretted, had forgotten the art of story-telling. Jogindranath filied the void. Years earlier the poet had also expressed his admiration for the volume of Tagore's selected songs, which Jogindranath published in 1908.

Jogindranath's genius lay in introducing easy colloquial word in his writings. His first publication for children "Hashi O Khela" (1891) is an interesting example.

Ramendrasundar Trivedi, who was among the first few to introduce the use of Bengali in scientific and higher studies, in his preface to Jogindranath's "Khukumanir Chhara"—a delightful anthology of lullabies and nursery songs of old Bengal—wrote that the pieces might provide useful material for a future Max Muller in reconstructing the province's history from some of the facts and anecdotes mentioned in them.

An English critic said that while Jogindranath's works had taken English nursery books as their model, they reproduced their features "in no case by translation ; in all cases by original and local adaptations" . In Geneva, at an international children's library opened in 1926, several of Jogindranath's books were on display.

RHYTHMIC RHYMES

Bengalis born in this century, who have not learnt their alphabet from the prosusely illustrated "Hasikhusi" (Laughter and

Delight) must be very few. The rhythms in the book cast magic spell over children. The book has now run into its 10t4h edition.

To promote mass education, Jogindranath once printed a cheap edition of the book, slashing its price from four annas to two. His direct method of teaching simple sums of addition and subtraction through verses and pictures has not only made easier the task of mothers, but also turned learning into a Joy. The rhymes in the illustrated piece "Haradhoner Dashti Chhele" (Ten sons of Haradhon) still ring a bell in the minds of many 70 year-olds.

The eighth child of his parents and younger brother of Dr. (Sir) Nil Ratan Sircar, Jogindranath was for a while a teacher in the City Collegiate School. One of his pupils told me the other day that Jogindranath often broke the monotony of his class by relating funny stories. The boys listened enraptured as their teacher traversed the remote realms of fairies and goblins.

Glving up teaching, Jogindranath later devoted himself entirely to writing for children. In his pioneering task he met with initial difficulties. Many publishers were reluctant to bring out children's books. Such projects seemed unpromising as a business proposition. Jogindranath ultimately had to establish a firm of his own, the City Book Society to publish story books written by him and other authors. The firm occupies the very room, where it was started 70 years ago.

Jogindranath had earlier assisted Pandit Sivanath Sastri in editing the Bengali Magazine "Mukul". His books of poems "Bikash" and "Deepti," written at the age of 22, had eloquently manifested the author's potential talent. The books are now out of print.

He spent a few months every year at Giridih in Chotonagpur and his residence "Golekuthi" was the rendezvous of scholars, scientists and writers. The Purnima sammelan, held thier on full moon nights, were eagerly awaited by the accomplished sojourners.

In 1923, when his right side was paralysed, he learnt to use his left hand. His "Bane-Jangale", a collection of stories about animals, was published after he fell ill. In this, he was assisted by his wife, who is still living.

Inspired by nationalism, Jogindranath, during the days of Bengal Partition, published "Bande Mataram", a collection of patriotic songs and poems. Immensely popular, the book ran into three editions in 15 days.

Jogindranath died in Calcutta on June 26, 1937.

West Bengal will celebrate his birth centenary on Oct. 29 this year, when his efforts to spread education, particularly through the publication of children's books, poems, playlets and stories, will be gratefully recalled.

The "Statesman".

Jogindranath Sarkar

THE GREAT WRITER OF JUVENILE LITERATURE

One of the stalwarts among the writers of Bengali juvenile literature, the late Jogindranath Sarkar appears as an unforgetable and luminous figure not only to the children of this country but also to their elders. In fact, we may say that Jogindranath was the counterpart in Indian literature of what Hans Christian Anderson was in Europcan. The current Bengali year marks the hundredth birthday of this great writer.

Modern science tells us that child psychology is not at all insignificant in comparison with adult psychology. Children live in a world of their own—with their innocence and simplicity, dreams and reveries: hopes and aspirations, thoughts and desires, naughtiness and pranks. They turn their back on the worldwiseness of the grown-ups ; their mind, consequently, are easily attracted to the world of fancy in which 'human' beings and creatures with, say, three legs or five heads are no uncommon inhabitants.

Truly speaking, it is not too easy for an adult to be a co-pilgrim with the children to their juvenile domain. One must have the child in oneself, if one wants to be at one with a child—one should touch the right string in its heart to get the right tune. Besides, one's approach should be appropriate for obtaining the child's response. It is very hard, if not impossible, for an unsympathetic mind to become a child's kith and kin.

Jogindranath broke new ground and was an expert. The thought at the back of his mind was the entertainment of children. But this was a means to assign himself the task of drawing little folk towards that end. The end was to educate a child through amusement, recreation, verse and rhyme. He led the way and Upendra Kishore Roy Chowdhury, Sukumar Roy, Dwijendranath Basu, Dakshinaranjan Mitra Majumdar and Sunirmal Bose followed suit.

There is no end to a child's attraction towards what is called "nonsense verse" or "nonsense rhyme." It is not difficult to find verses of this type in English and other Western languages. In Bengali there are innumerable such rhymes mostly by those who were inspired by the muse. Few cared to write them. They stay in one's memory. Possibly Jogindranath was the first person to collect some of these rhymes and present them in book form ("Khukumanir Chhara") in 1306 B. S. (1899). He himself also composed a large number of 'nonsense verse', which we find in this "Hasijibji", "Hashirashi-Hashikhusi and other books. He would often speak poetry.

Jogindranath knew that the world of children is basically different from that of the grown-ups—a world of purity, innocence packed with wonders. So to Sarkar, who let the boy in him get the better of him,

the world appeared as though by some curious effect of a stained glass to be dressed in every colour of the rainbow. In all he wrote about thirty books ih prose and in verse, besides twentyone books based on mythology and legends for the tiny tots. His 'Hashikhushi" has been rendered into Hindi and into Assamese.

Born in 1273 B. S. at his maternal grandpa's house at Joynagar in 24 parganas as the eighth child of his parents, Jogindranath had to struggle hard from his boyhood up. He found it difficult to get on with his studies. After passing his entrance examination from Deoghar (now in Bihar) he came to Calcutta and got himself admitted to the City College with Latin as one of his subjects. But destiny came in the way of his taking the F. A. Examination. Some time after this, he joined the City Collegiate School as a teacher. It was at this time that he started writing poems and stories for the little folk and founded the City Book Society for the publication of educative and pleasant books for children.

Jogindranath was a great lover of Nature. He had no rough corner or sharp edges about him. This mental make-up impelled him to to build a house named "Golkuthi" at Giridih. *He spent the major portion of his days here.*

He had a fund of humour and fun; he could distribute it ceaselessly to young and old alike. His mission was, as it were, to offer innocent pleasure to all men at all times. He was a hot favourite with children and could win them over in a trice, wherever he went.

It was for their amusement and enjoyment that he created a world, where fancy has matters all her own way. So far as his juvenile stories are concerned, they are none the less amusing, engrossing, lucid, vivid and educative. "Jay parajay"—a novel for the young folk, is also quite enjoyable. He died in 1344 B. S. (1937) at the age of seventyone. But he will live through the mist of ages, as the leading explorer of juvenile minds. His birth centenary celebration, which is being observed with considerable enthusiasim, is a very good and hopeful sign for the nation. Time has now come for an all-out propagation of his entire works, not only in Bengali but in all other Indian and foreign languages also, along with an appropriate evaluation of his achievements.

Rabindranath Tagore once highly commended Jogindranath's endeavour to short stories to children. Let us conclude with a paraphrase of his wotds :—

"Children are as fond of rice and milk as for stories. Grandmas and aunts had supplied sweet stories to them in their sweet voices. Today those story-tellers have forgotten their stories. But the children have not given up their demand. They still hanker after stories, although stories seem to hav gone out of their home-steads, nay, families.

To counter-act this famine of juvenile stories. Jogindranath has come forward at the head of a small batch of volunteers—contributing out of his own, as well as, collecting from others. Children do not know how to bless; therefore, the task of blessing Jogindranath on their behalf is hereby being shouldered by their friend Rabindranath."

—"Amrita Bazar Patrika"

JOGINDRANATH SARKAR